রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি

বদরুদ্দীন উমর

রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি

বদরুদ্দীন উমর

কাশবন প্রকাশন, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি
বদরুদ্দীন উমর

প্রথম প্রকাশ
পহেলা বৈশাখ ১৪১৯
১৪ এপ্রিল ২০১২

স্বত্ব
সুরাইয়া হানম

প্রকাশক
আমিনুল ইসলাম
কাশবন প্রকাশন
২৫৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ শিল্পী
উত্তম সেন

অক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা

পরিবেশক
বিদ্যাজগৎ, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা
জাগৃতি : আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

মূল্য ঃ ২৯০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8907-35-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আজিজুল হক শাহজাহান
সুহৃদবরেষু

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর ২০১০ সালে লিখিত ও প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন। এখানে যেসব ঘটনা ও সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার দ্বারা এই সময়ের বাঙলাদেশের ইতিহাসের সাথে পাঠক যাতে পরিচিত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এগুলো এখানে এভাবে সংকলিত হলো। বাঙলাদেশ তার জন্মকাল থেকেই অনেক ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। দেশটির এই যাত্রাপথে বাঙলাদেশের নোতুন শাসক শ্রেণী উৎপাদন ও সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করলেও শুধু এর ছিটে-ফোঁটা অন্যদের কাছে পৌছানো ও সাধারণভাবে দেশের বিপুল অধিকাংশ মানুষ শুধু যে অর্জিত সম্পদের সুষম বণ্টন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাই নয়, তাঁদের ওপর অনেক নির্যাতনও শাসক শ্রেণীর দ্বারা হচ্ছে। বাঙলাদেশের মত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এটাই স্বাভাবিক। বিক্ষিপ্ত এবং অসংগঠিতভাবে জনগণ এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করছেন। সাধারণভাবে সমাজে ও শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে ও সূচিত হচ্ছে সেগুলোর ওপরই এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে।

আশা করি এর মধ্যে পাঠকগণ শুধু যে ২০১০ সালের ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হতে পারবেন তাই নয়, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রের সাথেও তাঁদের পরিচয় হবে।

এই প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশের জন্য কাশবন প্রকাশন ও জনাব আমিনুল ইসলামকে ধন্যবাদ। সেই সাথে সংকলনটির প্রুফ বিশেষভাবে দেখে দেওয়ার জন্য জনাব ম. আ. লতিফ খানকে ধন্যবাদ।

১৮.০২.২০১২ বদরুদ্দীন উমর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

রাজনীতি

প্রধান মন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফর প্রসঙ্গে / ১৩
ফ্যাসিবাদের নগ্নরূপ / ১৭
আওয়ামী লীগ তাদের ক্রসফায়ারের ঐতিহ্য রক্ষা করছে / ২১
ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ডিগবাজী / ২৫
বাণিজ্য মেলায় ছাত্র লীগের লুটতরাজ ও সন্ত্রাস / ২৮
বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রয়োজন কি / ৩১
সিলেট সীমান্তে বিএসএফ-এর হামলা / ৩৫
ছাত্র লীগের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস / ৩৯
র‍্যাব মহাপরিচালকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য / ৪২
একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে / ৪৫
পাবনায় ছাত্র লীগ নেতাকর্মীদের চরিত্র যাচাইয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষার কর্মসূচি / ৪৯
সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা ও হামলা বন্ধ করা দরকার / ৫২
দুর্নীতির কবলে উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা / ৫৫
বাঙলাদেশে দুর্নীতিই সার্বভৌম / ৫৮
সরকারের ছত্রছায়ায় ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা / ৬১
নামকরণ পরিবর্তনের মহোৎসব দুর্নীতিরই দৃষ্টান্ত / ৬৪
সরকারী গোয়েন্দারা ছাত্র লীগের নোতুন নেতা খোঁজাখুঁজি করছে / ৬৭
র‍্যাবকে প্রত্যাহার করতে হবে / ৭০
আমার দেশের ওপর সরকারের ফ্যাসিবাদী হামলা / ৭৩
নিমতলীর অগ্নিকাণ্ড এবং তারপর / ৭৭
আটকদের নিয়মিতভাবে রিমান্ডে নেয়া ফ্যাসিবাদেরই বহিঃপ্রকাশ / ৮০
সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর / ৮৩
হরতাল প্রসঙ্গে / ৯২
ঈশ্বরদীতে শ্রমিকদের উপর ফ্যাসিস্টদের হামলা / ৯৫
ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ একই পালকের পক্ষী / ৯৮
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা / ১০২

www.pathagar.com

সভা সমাবেশ মিছিল নির্দিষ্ট ঘোষণা প্রসঙ্গে / ১০৬
প্রধান মন্ত্রীর ৫২৫ নম্বর সতর্কবাণী / ১০৯
রাজনীতির ক্রিমিনালাইজেশন, কী হচ্ছে এই দেশে / ১১২
শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও বাঙলাদেশে ফ্যাসিবাদ / ১১৫
পঞ্চম সংশোধনী বাতিল এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফেরত যাওয়া প্রসঙ্গে / ১১৮
সিরাজগঞ্জে ট্রেন দুর্ঘটনা এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া / ১২৩
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় চিন্তার কারণ নেই / ১২৬

শিক্ষা সংস্কৃতি
নোট বই গাইড বই প্রকাশক ও বিক্রেতাদের মত বিনিময় সভা / ১৩১
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র সন্ত্রাস / ১৩৪
বাংলা একাডেমীর বইমেলা এবং কূপমণ্ডূকতা / ১৩৭
একুশে ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবুর রহমান / ১৪০
বইমেলা আন্তর্জাতিকীকরণ এখন জরুরী হয়েছে / ১৪৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র দুর্নীতি ও সন্ত্রাস / ১৪৮
বাংলা একাডেমীর বইমেলা ও বইয়ের জগৎ / ১৫২
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ফেরত যাওয়ার চক্রান্তমূলক প্রহসন / ১৫৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন প্রসঙ্গে / ১৫৯
বাঙলাদেশে মিথ্যার রাজত্ব / ১৬২
পহেলা বৈশাখের নিরানন্দ আনন্দ উৎসব / ১৬৬
জনগণ এখন শুধু সরকার পরিবর্তন নয়, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় / ১৬৮
শিক্ষাব্যবস্থার অশ্লীল বাণিজ্যিকীকরণ / ১৭১
বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সান্ধ্যকালীন শিফট / ১৭৫
সমাজের ক্রমবর্ধমান অপরাধীকীকরণ এবং ইভটিজিং / ১৭৮
শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গ / ১৮১
সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে / ১৮৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংকটজনক পরিবেশ পরিস্থিতি / ১৮৭
শিক্ষা ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি দিক / ১৯০
শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা ও শিক্ষা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ / ১৯৩
ইভটিজিং ও অপরাধের জগৎ / ১৯৬

www.pathagar.com

রাজনীতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান মন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফর প্রসঙ্গে

বাঙলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অবনতি এখন এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এই অবনতির অর্থ দুই দেশের সরকারের অবনতি, তাদের পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর অবনতি নয়। এই অবনতির অর্থ হলো বাঙলাদেশের জাতীয় ও জনগণের স্বার্থ ভারতীয় বড় পুঁজির পদদলে জলাঞ্জলি দেয়া। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বাঙলাদেশের বর্তমান মহাজোট সরকার এ কাজটিই এখন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। এ কারণে বাঙলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভারতীয় শাসক শ্রেণী ও তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে ভারতের শাসক-শ্রেণী আগের যে কোন সময়ের থেকে এখন বেশ খোলাখুলিভাবে পরিণত হয়েছে বাঙলাদেশের জনগণের শোষণ ও নির্যাতনকে। বাঙলাদেশের মতো একটি শ্রেণীবিভক্ত ও লুম্পেন বুর্জোয়া শাসিত দেশের ওপর ভারতের মতো শক্তিশালী বুর্জোয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রভাব ও হুকুমদারি কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এটা সম্ভব হতো না যদি এ দেশের শাসক-শ্রেণী হতো জাতীয় বুর্জোয়া চরিত্রসম্পন্ন এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তিধর। বাঙলাদেশ যে সে রকম কোনো শ্রেণী দ্বারা শাসিত হচ্ছে না এটা বলাই বাহুল্য।

১৯৭২ সালে নোতুন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে লুণ্ঠনকারী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে একদিকে জনগণের ওপর শাসন-নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালিয়ে এবং অন্যদিকে দেশীয় স্বার্থ একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে জলাঞ্জলি দিয়ে জনগণ ও দেশের সর্বনাশ করছে। এই সর্বনাশের সর্বশেষ চিত্রই এখন আমরা দেখছি। সামাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে বাঙলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতাপ ও আধিপত্যই সব থেকে প্রবল। আধিপত্যবাদী শক্তি হিসেবে বাঙলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারতের স্থান। এ কারণে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের ক্ষতির পাল্লা ভারী এবং এই পাল্লা নিয়মিতভাবে আরও ভারী হচ্ছে। এক্ষেত্রে টিপাইমুখ বাঁধের কথা প্রাসঙ্গিক। এই বাঁধ এমনই সর্বনাশা যে এর দ্বারা শুধু যে বাঙলাদেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা-ই নয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মণিপুর ইত্যাদি অঞ্চলের জনগণ এবং পরিবেশেরও দারুণ ক্ষতি হবে। কিন্তু ভারতীয় বড় পুঁজি যেমন প্রতিবেশী বাঙলাদেশের জনগণের ও এখানকার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোনো পরোয়া করে না, তেমনি তারা পরোয়া করে না নিজেদের দেশের দেশের সাধারণ মানুষ এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর স্বার্থহানির। ফারাক্কা বাঁধ হওয়ার সময় বাঙলাদেশ সরকার তার বিরোধিতা করেছিল, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বাঙলাদেশ-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত লংমার্চ

www.pathagar.com

হয়েছিল। টিপাইমুখ বাঁধ বাঙলাদেশের জন্য ফারাক্কা বাঁধের মতো ক্ষতির কারণ হবে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ সরকারের পক্ষ থেকে হচ্ছে না, যা কিছু হচ্ছে সেটা আওয়ামী লীগ ঘরাণার বাইরে অন্য রাজনৈতিক দল, গ্রুপ বা ব্যক্তিদের দ্বারা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার প্রতিবাদের পরিবর্তে এই বাঁধের সুফল নিয়ে অনেক কথা বলছে। এ বাঁধ হলে যে বাঙলাদেশ খুব উপকৃত হবে এটা তাদের মুখপাত্ররা ফলাও করে বলছেন। বাঙলাদেশ সরকারের এই অবস্থা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কী ধরণের লোকদের দ্বারা, কোন শ্রেণীর দ্বারা, কোন স্বার্থের প্রতিনিধিদের দ্বারা এদেশ এখন শাসিত হচ্ছে।

নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতির একটিও তারা কার্যকর না করে প্রত্যেকটির উল্টো কাজই করছে। ক্রসফায়ার বন্ধ থেকে নিয়ে টিপাইমুখ বাঁধ পর্যন্ত একই ব্যাপার। এদের শাসন এখন দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির পদলেহীদের এবং দেশীয় শোষক-লুণ্ঠনকারীদের শাসনে। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ দিনবদলের আওয়াজ দিয়েছিল। এদিক দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি তারা পূরণ করেছে। তবে এ দিনবদল জনগণের নয়।এটা হলো তাদের নিজেদের দল, পরিবার ও তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীদের। তাদের দিনবদল হয়েছে। তারা এখন সব রকম সুযোগ-সুবিধার ভাগীদার হয়ে দেশের জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে। এই কাঁঠাল ভাঙার কাজ করতেই বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রী আগামী জানুয়ারী মাসে ভারত যাচ্ছেন। তিনি কতগুলো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সেখানে স্বাক্ষর করবেন। এই সব মামুলি চুক্তির বাইরে যে সব সমস্যা আজ দেশের ও জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত সেগুলো নিয়ে কোন আলোচনা অথবা চুক্তি হবে এমন কোন আভাস সরকারের পক্ষ থেকেও নেই। উপরন্তু ভারতে গিয়ে তাদের খয়ের খাঁ হিসেবে নিজের অবস্থানকে আরও মসৃণ করার জন্য আওয়ামী লীগের প্রধান মন্ত্রী ইতিমধ্যে বাঙলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করা উত্তর-পূর্ব ভারতের উলফাসহ অন্য রাজনৈতিক দলের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে গ্রেফতার করে গোপনে তাদের ভারত সীমান্তে নিয়ে গিয়ে তাদের সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এটা যে এক বড় কেলেঙ্কারি এতে সন্দেহ নেই।

এই কেলেঙ্কারি আরও কুৎসিত হয়েছে বাঙলাদেশের প্রশাসন, বিশেষত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একের পর এক মিথ্যা ভাষণে। উলফা নেতা রাজখোয়াসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার ও তাদের ভারতের কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে তিনি একের পর এক অনেক মিথ্যা বলেছেন। অবশেষে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে এর সংবাদ প্রকাশ ও ভারত সরকার বাঙলাদেশ কর্তৃক ধৃত ভারতীয় নাগরিকদের ভারতের হাতে সমর্পন করার সত্যতা স্বীকার করার পর বাঙলাদেশ সরকার বাধ্য হয়ে এটা স্বীকার করছে। এ মিথ্যাচারকে বড় ধরণের সরকারী কেলেঙ্কারি ছাড়া আর কিভাবে আখ্যায়িত করা যায়? টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধ, তিস্তার পানি বন্টন, বাঙলাদেশের সমুদ্র সীমা চিহ্নিতকরণ, নিয়মিতভাবে বাঙলাদেশ সীমান্তে বাঙলাদেশী নাগরিক হত্যা, বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের ঘাটতি কমিয়ে আনা ইত্যাদি

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষারত হবে এমন কোনো কথা নেই। বলা হচ্ছে, বাঙলাদেশ ভারত থেকে একশ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। এর আসলে কোনো প্রয়োজন নেই। দেশীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা করে দিলে তারা অনায়াসেই এর থেকে অনেক বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ দেশেই উৎপাদন করতে পারেন। তাছাড়া সে ক্ষেত্রে ভারত থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে আসার জন্য ঝামেলাও দরকার হয় না। কিন্তু এ পথ বাঙলাদেশ সরকারের পথ নয়। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার থেকে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে ভারতের সঙ্গে বাঙলাদেশের সম্পর্কের কথা প্রচার করাতেই এদের উৎসাহ বেশী।

এই সফরে গিয়ে বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রী যে আসল কাজটি করবেন বলে মনে হচ্ছে তা হলো, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ থাকা অথবা এর দ্বারা বাঙলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এটাই সরকারীভাবে বলার ব্যাপারে সমঝোতা, ভারতের জন্য অনুকূল শর্তে তাদের বাঙলাদেশে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান, বাঙলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ নিয়ে কোনো নড়াচড়া না করা ইত্যাদি বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে গোপন সমঝোতা। আওয়ামী লীগের প্রধান মন্ত্রী ভারত সরকারকে এসব সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে তারা তাকে অনেকভাবে পুরস্কৃত করছে, যার মধ্যে মেডেল ইত্যাদি প্রদান অন্যতম। বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর এই ঢেঁড়ি পেটানো সফরের এটাই হলো মুখ্য দিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে বাঙলাদেশের যে অধীনতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার অন্য একটি দিক হলো, এই দুই রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে এ দেশে এক ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা চালু রাখা।

বর্তমান সরকার দেশের জনগণের বিভিন্ন অংশের ওপর যে ফ্যাসিবাদী নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, ক্রসফায়ারের মতো বেপরোয়া হত্যাকান্ড করছে, মিটিং-মিছিল ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বিধিনিষেধ জারী রেখেছে, লুটতরাজের রাজত্ব যেভাবে কায়েম রেখেছে সেটা শুধু এদের নিজেদের শক্তির ওপরে দাঁড়িয়ে সম্ভব নয়। এর জন্য বাইরের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শক্তির জোগান দরকার। এই জোগান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত সরকার ভালোভাবেই দিচ্ছে। এ জন্য এ দুই দেশে শুধু সরকারী লোকজন নয়, বেসরকারী জনশত্রুদরও অনেক সম্মানে ভূষিত করে তাদের হাত মজবুত করছে। এই জনশত্রুরা নিজের দেশের ও জনগণের নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকারের স্বার্থে কাজ করার জন্যই তারা বাঙলাদেশে তাদের অবস্থান জোরদার করছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক মুহাম্মদ ইউনুস সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত এই বেসরকারী লোকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন। সরকারী কর্তাব্যক্তি ছাড়া বেসরকারী লোকদের এই পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা শুধু সরকারী পর্যায়েই নয়, বেসরকারী পর্যায়েও দেশের বিভিন্ন অংশের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার ও বজায় রাখতে চায়। সমগ্র দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে সমাজের গভীর দেশ পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য তারা এভাবে যা কিছু দরকার সবই করে থাকে। সরকারী এবং এই ধরনের বেসরকারী লোক ও তাদের সংগঠন অভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে

www.pathagar.com

গাঁটছড়ায় বাঁধা থাকার কারণে তারা পরস্পরেরও মিত্র। হাত ধরাধরি করেই তারা জনগণের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকারের দালাল হিসেবে কাজ করে। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, এ কারণেই সরকার সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক রাষ্ট্রের দালাল হিসেবে কাজ করলে তার কোনো প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ থেকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সোচ্চার সমর্থন জ্ঞাপন করে তারা সরকারকে সাহায্য করে। মার্কিন ও ভারতের সাথে বাঙলাদেশ সরকারের অধীনতামূলক সম্পর্ক এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল না রাখলে বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও বিপজ্জনক দিক সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা সম্ভব নয়।

আমার দেশ : ১৭.১২.২০০৯ ১৬.১২.২০০৯

www.pathagar.com

ফ্যাসিবাদের নগ্নরূপ

বাঙলাদেশের জনগণের ঘাড়ে এখন যে ফ্যাসিবাদী শাসন চড়ে বসেছে তার বহিঃপ্রকাশ ও দাপট জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। ফ্যাসিবাদী শাসনের মূল দিক হলো, দস্যু প্রকৃতির পুঁজিবাদী শোষক নির্যাতকদের স্বার্থবিরোধী কণ্ঠ ও কার্যকলাপ নির্মমভাবে দমন করা। এ কাজ কত নিষ্ঠুর ও ব্যাপকভাবে করা সম্ভব এটা নির্ভর করে যারা শাসন ক্ষমতায় থাকে তাদের নিজেদের আত্যন্তিক শক্তি এবং অর্থনৈতেক মেরুদন্ডের ওপর। যারা এদিক দিয়ে দুর্বল তাদের ফ্যাসিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অপেক্ষাকৃত এলোপাতাড়িভাবে। হিটলারের মতো সুসংগঠিত ফ্যাসিবাদ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা না হলেও ফ্যাসিবাদী চরিত্রের কারণে বেপরোয়া হতে তাদের অসুবিধে হয় না এলোপাতাড়ি অথচ বেপরোয়া, এ দুইয়ের সংমিশ্রণে অনুন্নত দেশের শাসক শ্রেণীর ফ্যাসিবাদ এক ধরনের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঙলাদেশের জনগণ এখন ক্ষমতাসীন সরকারের এই চেহারাই দেখছেন। বাঙলাদেশে শাসক শ্রেণী ও তার সরকারের ফ্যাসিবাদের বহিঃপ্রকাশ বহুক্ষেত্রে ও বহুরূপে ঘটছে। এর সব থেকে নিষ্ঠুর ও ক্রিমিনাল দৃষ্টান্ত হলো র‍্যাব, পুলিশ, আনসার ইত্যাদি সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ক্রসফায়ার বা 'এনকাউন্টারে'-এর মাধ্যমেই মানুষ খুন করা। শুধু ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টারের, মাধ্যমেই নয়, জেলে আটক অবস্থায়ও মানুষকে বেপরোয়াভাবে খুন করা হচ্ছে। যেভাবে কোনো বিচারের পরোয়া না করে, বিচারের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে আটক ব্যক্তিদের জেলে অথবা জেলের বাইরে খুন করা হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই এ খুনিদের এত বড় অপরাধের কোনো বিচার হচ্ছে না, শাস্তি হচ্ছে না, এমনকি কারও জন্য জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা পর্যন্ত কোথাও নেই। অকুতোভয়ে র‍্যাব, পুলিশ ইত্যাদি সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা পাখি শিকারের মতো করে দেশের নাগরিকদের খুন করছে।বর্তমান মহাজোট সরকারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আওয়ামী লীগ ২০০৮ এর নির্বাচনের আগে ক্রসফায়ার ইত্যাদি বিচারবহির্ভূত হত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটাদের কাছে ভোট চেয়েছিল। ভোট পেয়ে গদিনসীন হওয়ার পর তারা এখন যা করছে এর মধ্যে তাদের প্রতারক চরিত্র খুব ভালোভাবেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এ প্রতারণার বিষয়ে জনগণের কোন অংশকেই বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর কিছুই নেই। কারণ নিজেদের জীবন দিয়েই তারা আওয়ামী লীগের এ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির স্বরূপ দেখছেন। শুধু ক্রসফায়ারের ব্যাপারেই নয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার এখন যেভাবে নিজেদের খেলা দেখাচ্ছে তার মধ্যে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এ কথা বলা চলে যে, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ তাদের এক বছরের

www.pathagar.com

শাসন যেভাবে পরিচালনা করছে এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারকে প্রতারণার এক প্রামাণ্য দলিল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কয়েকদিন আগে ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় আওয়ামী লীগের মন্ত্রী অবসর প্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল খোন্দকার নিজের দলীয় লোকদের সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন, যে পথে তারা চলছেন সেটা পরিবর্তন না করলে পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে আবার ক্ষমতায় আসা সম্ভব হবে না। এই উক্তি ও সতর্ক বাণীর তাৎপর্য উপেক্ষা করবে কে? নিজেদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরই যখন এই ধারণা, তখন সাধারণ মানুষ এদের সম্পর্কে কী ভাবছেন এটা বোঝারও অসুবিধে আছে? আওয়ামী লীগের দু'একজন মন্ত্রী বা নেতা নিজেদের বর্তমান কার্যকলাপের পরিণতি কথা এভাবে চিন্তা করলেও দলটির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে নিয়ে বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মধ্যে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে বেপরোয়া মনোভাবই রাজত্ব করছে এবং এর বহিঃপ্রকাশই ঘটছে সর্বত্র। বাঙলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট ক্রসফায়ারে হত্যাকান্ডের বিস্তার দেখে কয়েকদিন আগেই এক আদেশ জারী করেছেন তা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এ আদেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে র‍্যাব ও পুলিশের ক্রসফায়ার সমানে চলছে। একটি সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ১১ মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের (ক্রসফায়ার) শিকার হয়েছেন ১১৮ জন। এ সময় র‍্যাব ও পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন আরও দুই শতাধিক। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যখন অকাতরে ক্রসফায়ার চলছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসীরা গুলী করবে আর র‍্যাব-পুলিশ দাঁড়িয়ে গুলী খাবে, তা হতে পারে না।' (যুগান্তর ২০-১২-০৯)। নিশ্চয়ই এটা হতে পারে না, কারণ র‍্যাব বা পুলিশ কোন স্বাধীন বাহিনী নয়, এগুলো সরকারেরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই তারা কাজ করে। এ ক্রসফায়ারের দায়িত্ব সরাসরি সরকারের ও তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। কাজেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উল্টো কাজ করে উল্টো কথা বলা ছাড়া গদিনসীন এই ব্যক্তিদের আর করার কিছু নেই। শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই নয়, আওয়ামী লীগের এক বাচাল ভূতপূর্ব বামপন্থী মহিলা মন্ত্রীসহ অন্য মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরাও একইভাবে এখন ক্রসফায়ারের পক্ষে সোচ্চার, তার পক্ষেই বিশ্রীভাবে ওকালতি করছেন।

গত দু'তিন দিন ধরে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতারা অগ্নিবর্ষণ করছেন, তাঁকে জোর হুমকি দিচ্ছেন। এদের তেজ দেখে মনে হয় এরা বিশুদ্ধ ধাতুতে গড়া, তাছাড়া এদের মতো সৎ লোক আর বুঝি ভূভারতে নেই! এ বিষয়ে কিছু আলোচনার আগে বিচারপতির কোন বক্তব্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ মহলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখা দরকার। ১৯ ডিসেম্বর 'অধিকার' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিচারপতি নজরুল বলেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যা বিচার বিভাগের জন্য বড় ধরনের আঘাত। আমরা বিচারপতিরা জনগণের অধিকার রক্ষার শপথ নিয়েছি। কিন্তু আমাদের

www.pathagar.com

সামনেই যখন বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করা হয়, তখন আমাদের জন্য সেটা আঘাতস্বরূপ। কোন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের হাতে কাউকে হত্যার দায়িত্ব তুলে দেয়া যায় না। এটা জাতির জন্য আত্মহত্যার শামিল। যারা সংসদ সদস্য হবেন, তাদের আইন প্রণয়নের বিষয় সম্যক ধারণা থাকতে হবে। সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো জনগনের মঙ্গলের জন্য আইন তৈরী করা। আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা। আইনের একটি শব্দ, সেমিকোলন– এসব বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন বিতর্ক হতে পারে। কেরানিরা আইনের ড্রাফট তৈরী করে আর সংসদ সদস্যরা সেটা হো হো করে তালি বাজিয়ে পাস করে দেবেন, এটা তাদের দায়িত্ব নয়। অনেক সংসদ সদস্য আইনের ড্রাফটটি অনেক সময় পড়েও দেখেন না, দলীয় লোক আইন উত্থাপন করেছেন, তাই এটা পাস।' (আমার দেশ. ২১.১২.০৯)

ওপরে বিচারপতিগ নজরুল ইসলাম যা বলেছেন তার কোনটি অসত্য? বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড? সংসদ সদস্যদর দ্বারা প্রস্তাবিত আইনের ড্রাফট বা খসড়া পড়ে না দেখা? আইনের খুঁটিনাটি বিচার না করে, বিতর্ক না করে হাত দেখিয়ে বিল পাস করা? সরকারী দল কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে আইনের খসড়া উপস্থিত করার পর প্রায়ই কোন আলোচনা ছাড়াই সেটা পাস করা? এর মধ্যে কোনটি অসত্য? উপরন্তু এটা কি সত্য নয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসেদ উপস্থিত থেকে জনগনের স্বার্থে বুঝে বুঝে আইন প্রণয়নের কথা থাকলেও তারা কি বিপুল সংখ্যায় সংসদে অনুপস্থিত থেকে কোরাম ফেল করান না? এ ক্ষেত্রে কি তারা সামান্যতম দায়িত্বশীরতার পরিচয় দেন? এছাড়া আরও সত্য আছে। বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদের বিপুলসংখ্যক সদস্য কোন সভ্য দেশের জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যে কথাটি বিচারপতি নজরুল ইসলাম বলেননি তাহলো অনেক সংসদ সদস্যই মহামূর্খ। কোন আইনের ড্রাফট পড়ে বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। তাঁরা হলেন অল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যবসায়ী। সংসদে বসেও তাঁরা জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের চিন্তা অপেক্ষা নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থ চিন্তাতেই বিভোর থাকেন। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, এ কারণে বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদের সাংস্কৃতিক মান বিপজ্জনকভাবে নিম্ন।

বিচারপতি নজরুল সংসদ সদস্যদের বিষয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করায় তাদের সম্মানে নাকি আঘাত লেগেছে! এমন কাজ তারা করেন কেন, যাতে সে বিষয় নিয়ে কথা বললে তাঁদের 'সম্মানে' আঘাত লাগে, তাঁদের মানহানি হয়? বিচারপতি নজরুল ইসলাম তো শুধু সংসদ সদস্যদের আচরণের কথাই বলেননি, আলোচনায় তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বিচারবহির্ভূত হত্যা সম্পর্কে। সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের 'গণতন্ত্রী' নেতানেত্রীদের কোন বক্তব্যই তো শোনা যায়নি। নিরীহ মানুষ সরকারী বাহিনী দ্বারা হত্যার বিষয় তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। প্রতিক্রিয়া হয় তাদের সম্পর্কে সত্য ভাষণের বিরুদ্ধে। দেশের সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতির যথার্থ বক্তব্যে সংসদ সদস্য, মন্ত্রীদের মানহানি হয়। কিন্তু তারা বিচারপতির বিরুদ্ধে অশালীন বক্তব্য প্রদান করে জুডিশিয়াল কাউন্সিল করা, সংসদে এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কথা

www.pathagar.com

বলতে তাদের অসুবিধা হয় না। তারা মনে করেন, বিচার বিভাগ মন্ত্রী সভার স্বাধীন, বিচারকরা সংসদ সদস্যদের ও ক্ষমতাসীন দলের নেতানেত্রীদের গোলাম!

এসবই হলো ফ্যাসিবাদের বহিঃপ্রকাশ। ফ্যাসিবাদ শুধু ক্রসফায়ারের মতো হত্যাকাণ্ডই ঘটনায় না, সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ও শাসক চক্রের স্বার্থ বিরোধিতাকে চূর্ণ করার জন্য এমন কাজ নেই, যা তারা করতে পারে না।

কয়েক দিন হলো আমার দেশ পত্রিকায় জ্বালানি উপদেষ্টা ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্রের ঘুষ গ্রহণের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটির রিপোর্টার ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যে উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চলেছেন, সেটাও তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রেরই পরিচায়ক। বিভিন্ন সময় শাসক শ্রেণী ও দলের লোকজন এবং বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের নেতানেত্রীরা যে ধোয়া তুলসী পাতা নন এটা কে না জানে? ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নির্বাচনের সময় বিভ্রান্ত হয়ে ভোটাররা মনে করেন যে, একটিকে বিদায় করে অন্যটিকে আলিঙ্গন করলে তাদের উপকার হবে। কিন্তু নিজেদের ভোট এভাবে দিয়ে তারা এক চুলো থেকে আর এক চুলোতে নিক্ষিপ্ত হন।

প্রধান মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে ঘুষখোরীর অভিযোগ এলেই যে অভিযোগকারীদের উপর সরকারী ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং এরকম কোন গণতান্ত্রিক নিয়ম নেই। এটা ফ্যাসিবাদের নিয়ম। উত্তেজনা প্রকাশের পরিবর্তে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান এবং বাস্তবত তাদের ওপর শারীরিক আক্রমণ না চালিয়ে, তাদের অভিযোগ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য প্রদান করে এবং এ অপরাধ করেননি এ বিষয়ে প্রমাণ দাখিল করেই তারা নিজেদের সন্দেহমুক্ত করতে পারেন, যেমন অভিযোগকারীদেরও দায়িত্ব হচ্ছে তাদের অভিযোগ প্রমাণ করা। যে কোন সভ্য দেশে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার মীমাংসা এভাবেই হয়ে থাকে। অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাঁর নিষ্পত্তি সঠিক তদন্ত এবং আদালতের মাধ্যমেই হতে পারে। মামলার নিষ্পত্তি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খিস্তিখেউড় ও গুণ্ডামীর মাধ্যমে সম্ভব নয়।

আমার দেশ : ২৪.১২.২০০৯ ২২.১২.২০০৯

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ তাদের ক্রসফায়ারের ঐতিহ্য রক্ষা করছে

র‍্যাব ও পুলিশের ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে লেখালেখি বিবৃতি, সভা, মিছিল ইত্যাদি অনেক হলেও এই ক্রসফায়ার বন্ধের কোন আশু সম্ভবনা যে নেই এটা এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঔদ্ধর্তপূর্ণ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, তাঁরাও ক্রসফায়ারের বিরোধী এবং ক্রসফায়ার এখন হচ্ছে না। আসল কথা হলো, পুলিশ আক্রান্ত হলে তারা আত্মরক্ষার জন্য গুলি করছে এবং তাতেই আক্রমণকারীদের মৃত্যু হচ্ছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আক্রমণকারীদের গুলিতে কোন র‍্যাব অথবা পুলিশ সদস্য নিহত হচ্ছে না। নিহত হচ্ছে শুধু আক্রমণকারীরা! কোন কোন সময় এই নিহত আক্রমণকারীদের মৃতদেহ হাতকড়া পরা অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে! হাতকড়া পরা কোন লোক কীভাবে আক্রমণকারী হতে পারে এর কোন ব্যাখ্যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা তাদের র‍্যাব ও পুলিশের বক্তব্যে নেই।

ক্রসফায়ারে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি, এ মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করলেও র‍্যাবের মহাপরিচালক নিজেদের হেড কোয়ার্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, এ বছরে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ক্রসফায়ারে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে (ডেইলি স্টার : ৩০.১২.২০০৯)। সব মৃত্যুই আইন রক্ষা করে হয়েছে এবং অস্ত্রের কোন অপব্যবহার হয়নি, একথা বললেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতো তার পক্ষে একথা বলা সম্ভব হয়নি যে, র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে কারও মৃত্যু ঘটেনি।

কিন্তু শুধু র‍্যাবই ক্রসফায়ার করে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে না। পুলিশ, আনসার ইত্যাদি রাষ্ট্রের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর হাতেও ক্রসফায়ারে প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিরা হলেও সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিমিনাল এবং অন্য ধরনের লোকও নিহত হচ্ছে। ক্রিমিনালরা ক্রসফায়ারে নিহত হচ্ছে একথা বলে কোন মতেই ক্রসফায়ারকে যুক্তিযুক্ত এবং আইনসম্মত বলা চলে না। কারণ যে কোন ধরনের অপরাধীর বিচার ও শাস্তির জন্য দেশে আইন-আদালত আছে। কাজেই কে প্রকৃত অপরাধী এটা বিচারের ভার র‍্যাব, পুলিশের ওপর আইনত ন্যস্ত নেই। র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেছেন, তারা সব ক্রসফায়ারই আইন অনুযায়ী করেছেন। এটা এক হাস্যকর কথা। এর অর্থ দেশের আইন-আদালত নিয়ে তামাশা করা। আইন-আদালতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। এভাবে নিজেদের হত্যাকাণ্ড ব্যাখ্যা করা কোন সভ্য দেশেই সম্ভব নয়। কিন্তু এটা যে সম্ভব শুধু তাই নয়, বাস্তবতা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই তা দেখা যায়। ফ্যাসিস্ট কথাবার্তার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে র‍্যাব ও পুলিশের মতো সশস্ত্র বাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন এতে সন্দেহ নেই।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র তাদের এক বিবৃতিতে বলেছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন এই বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা করেন, তখন তা ন্যক্কারজনক উদাহরণ সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই অন্যায় কাজে ইন্ধন জোগায়। এ বক্তব্যের মধ্যে ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকলেও যেভাবে এটা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ভুল ব্যাখ্যার কারণে ভ্রান্তির সম্ভাবনা যথেষ্ট। বলা হয়েছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো বক্তব্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজে ইন্ধন জোগায়। আসলে ইন্ধন জোগানোর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এভাবে বিষয়টি উপস্থিত করে ক্রসফায়ারের ফল, এমনকি সার্বিক দায়িত্ব র‍্যাব ও পুলিশের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এমনভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যাতে মনে হয় যে রাষ্ট ও সরকারী নীতির বাইরে দাঁড়িয়ে এসব সশস্ত্র বাহিনী এ হত্যাকাণ্ড করছে। সরকার এখানে শুধু ইন্ধনদাতা মাত্র!

আইন-সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক র‍্যাব ও পুলিশের ক্রসফায়ার বিরোধিতার জন্য তাদের প্রশংসা করা যেতে পারে কিন্তু যেভাবে তারা এর চরিত্র ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সরকারকে শুধু 'ইন্ধনদাতা' হিসেবে উপস্থিত করেছেন সে বক্তব্যকে পুরোপুরি নাকচ করা দরকার। কারণ এই ক্রসফায়ারের জন্য সরকারই দায়ী। সরকারী নীতির কাঠামোর মধ্যেই জনগণের বিভিন্ন অংশের ওপর নানা নির্যাতনের মতো ক্রসফায়ারও হচ্ছে। কাজেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যখন র‍্যাব-পুলিশের ক্রসফায়ারকে অস্বীকার করে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন, তখন তার ভূমিকা ইন্ধনদাতার মতো একেবারেই নয়। এ ভূমিকা সরকারী মুখপাত্র হিসেবে সরকারী নীতিকে সমর্থন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, র‍্যাব-পুলিশ ইত্যাদির থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের কোন সংস্থাই স্বাধীন নয়। এগুলো সবই রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং রাষ্ট্রের ম্যানেজার হিসেবে সরকারই নিজেদের নীতির কাঠামোর মধ্যে পরিচালনা করে। কাজেই যেসব কাজ র‍্যাব-পুলিশ ইত্যাদি করে সেগুলো সরকারী নীতি ও নির্দেশ অনুযায়ীই তারা করে থাকে। এই বাস্তবতার আলোকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক র‍্যাব-পুলিশের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থনের বিষয়টি বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রসফায়ারের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের ইন্ধন যোগাচ্ছেন না, তাদের সরকারের নির্দেশে যে ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ড হচ্ছে তার প্রতি ষোলআনা সমর্থনই তিনি প্রদান করছেন।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার তা হলো, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই সরকারের কোন পর্যায়েরই নীতি-নির্ধারক নন। শুধু তিনি কেন, তাঁর মতো কোন মন্ত্রীরই নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আওয়ামী লীগের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। তিনিই সব নীতি-নির্ধারণ করছেন রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে। অন্য সবাই তার হুকুম তামিল করছেন মাত্র। কাজেই প্রধান মন্ত্রীকে আড়াল করে বা রেয়াত দিয়ে শুধু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সমালোচনা করলে র‍্যাব ও পুলিশ কর্তৃক ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে অনেক ফাঁকফোকর থাকে। সঠিকভাবে বক্তব্য প্রদান ও প্রতিবাদ জানাতে হলে এসব ফাঁকফোকর বন্ধ রেখেই সেটা করা দরকার।

১৯৭২ সাল থেকেই বাঙলাদেশের সদ্য গঠিত শাসক শ্রেণীর ফ্যাসিস্ট চরিত্র উন্মোচিত হয়েছিল। দ্রুত এই চরিত্রের বিকাশ ঘটে তা খুব স্পষ্ট হয়েছিল ১৯৭৪-এর ২৮ ডিসেম্বর শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারীর মাধ্যমে। এরপর থেকে আওয়ামী লীগ দেশে যে ফ্যাসিবাদী শাসন একেবারে খোলাখুলিভাবে শুরু করে তাতে তাদের নিজেদের দল ছাড়া সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারী পত্রিকা ছাড়া সব সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বন্ধ করা হয়, সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে বাকশাল নামে একটি পার্টি গঠন করা হয়। সেই চরম ফ্যাসিস্ট পার্টির শাসনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত জারী ছিল।

বর্তমানে যে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে তারা তাদের সেই পূর্ববর্তী ফ্যাসিস্ট ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার ধারাবাহিকতা এরা রক্ষা করছে। শুধু তারাই নয়, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে শাসক শ্রেণী গঠিত হয়েছিল ও শাসন নীতি-নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৭৫-এর পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকারই থেকেছে সেই ফ্যাসিস্ট শাসন ও নীতিরই অনুবর্তী। এদিক দিয়ে বলা চলে যে, বস্তুত আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব যেভাবেই দেখা যায়, পরস্পরের সঙ্গে শ্রেণীগতভাবে তারা নাড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ এখন এই অভিন্ন শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের ম্যানেজার হিসেবেই শাসন নীতি-নির্ধারণ করছে ও দেশ শাসন করছে।

একথা ভোলার উপায় নেই যে, বাঙলাদেশে ক্রসফায়ারের উদ্বোধন হয়েছিল শেখ মুজিবের হাতে। তারা ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারী আটক অবস্থায় সিরাজ শিকদারকে ক্রসফায়ারে হত্যা করেছিলেন। এই ফ্যাসিস্ট হত্যাকাণ্ডের পর শেখ মুজিব জাতীয় সংসদে সদম্ভে বলেছিলেন, 'কোথায় আজ সিরাজ শিকদার'। এসব ঘটনা ঐতিহাসিক। আওয়ামী লীগ ও তাদের বুদ্ধিজীবী চামচারা একথা অস্বীকার করার যতই চেষ্টা করুন তখনকার দিনে তাদের নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকাতেই এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। কাজেই ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে নিয়ে অন্যান্য গদিনশীন ব্যক্তি ও তাদের বুদ্ধিজীবী সমর্থকরা শেখ মুজিবের সৃষ্ট ঐতিহ্যই রক্ষা করছেন।

এর বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের জনগণকে এখন দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কারণ বর্তমান সরকারের ফ্যাসিস্ট নীতি শুধু ক্রসফায়ারের মাধ্যমেই কার্যকর হচ্ছে না, জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য এরা সভা-সমিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ জারী রেখেছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলে সভা সমিতির জন্য, মাইক ব্যবহারের জন্য যেখানে কোন অনুমতির প্রয়োজন হতো না, এখন সেখানে এসবের জন্যই অনুমতির প্রয়োজন হয়। সভা-সমিতি-মিছিলের ওপর প্রায়ই সরকারী পুলিশের হামলা হয়। সাংবাদিকদের ওপর ও সংবাদপত্রের ওপর হামলা হয়। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্রই প্রকৃতপক্ষে নেই যেখানে সরকারের ফ্যাসিস্টসুলভ নিয়ন্ত্রণ ও হামলা নেই।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা দরকার, বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর এমনই অবস্থা যে, এদের নিজেদের দলের মধ্যেও কোন গণতন্ত্র নেই, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার কোন সুযোগ নেই। কাজেই এদের শীর্ষতম নেতৃত্ব দলের মধ্যে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র এবং দলের বাইরে দেশের জনগণের ওপর ফ্যাসিবাদ কায়েম করে এখন দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করছে।

র‍্যাব ও পুলিশের ক্রসফায়ার, হত্যাকাণ্ড এবং সরকারের পক্ষে তাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাফাইকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। এসব বিষয় মাথায় রেখেই সরকারের সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

আমার দেশ : ৩১.১২.২০০৯ ৩০.১২.২০০৯

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ডিগবাজী

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় মহাজোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের প্রথম বৈঠক বসে ৫ জানুয়ারী ২০১০। সরকার গঠনের পর পুরো এক বছর ১৪ দলের মধ্যে ১৩ দলের কোন খবর না থাকার কারণেই বোঝা যায় জোট হিসেবে এই তথাকথিত মহাজোটের কার্যকারিতা কতখানি। এক বছর পর এর বৈঠকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং যেভাবে হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় 'মহাজোট' এর শরীক হিসেবে এদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোন প্রক্রিয়ার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই জোটের দুই একজনকে মন্ত্রী করে এবং অন্য কয়েকজনকে কয়েকটি সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান করে এদের জন্য কিছু খুদ-কুঁড়ো ছড়ানো ছাড়া কোন সরকারী দায়িত্ব বরাদ্দ করা হয়নি। এজন্য এই জোটের সর্বপ্রধান শরীক হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রকাশ্যেই অনেক রোদন করছেন, কিন্তু তার এই রোদন অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তাতে কর্ণপাত করার কেউ নেই। জোটের অন্য শরীকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ রোদন করার মতো সাহসও তাদের নেই। তাদের দৌড় কিছু বিনীত সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সরকারের শরীক এই গৌরবের আনন্দেই তারা মশগুল! বৈঠকটির সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাই ছিল তার মূল এজেন্ডা। এই বক্তৃতার ওপর কিছু প্রশ্নোত্তর গোছের কথাবার্তার মধ্য দিয়েই বৈঠক শেষ হয় এবং তারপর প্রধান মন্ত্রী তার নির্বাচনী শরীকদের এক নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন।

হাসিনা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলেও তার মুখবন্ধে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যেভাবে ছিল সেভাবেই সেটা রাখা হবে। তাছাড়া অষ্টম সংশোধনীতে যেভাবে ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছিল সেটাও বহাল থাকবে। এ প্রসঙ্গে জোটের কোন এক নেতা তাকে বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করা দরকার এবং সেক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' রাখা কতদূর সঙ্গত। এর জবাবে হাসিনা বলেন, বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখা হয়েছে কারণ এটি বাস্তবসম্মত। তিনি তার শরীকদের বাস্তবতা স্বীকার করে নিতে বলেন। কারণ এর মধ্যে জনগণের বিশ্বাসের প্রতিফলন আছে। (Daily Star, 6.1.2010)

হাসিনার এই জবাবের পর তার মহাজোটভুক্ত অনুসারীরা আর কোন উচ্চবাচ্য করা থেকে বিরত থাকেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্রধান মন্ত্রী আর এক ঘোষণায় বলেন, তাঁরা দেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করছেন। যারা সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' রাখার সিদ্ধান্ত করেন এবং সে সঙ্গে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রাখাও স্থির করেন, তাঁরা কিভাবে

www.pathagar.com

দেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করবেন এবং কেন করবেন এটা বোঝা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভব নয়।

যাই হোক, প্রথমে বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে বলা দরকার, পঞ্চম সংশোধনীতে বিসমিল্লাহ সংযোজন জিয়াউর রহমানের কাজ। তিনি এটা করার পর আওয়ামী লীগ মহল এবং তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীরা সমস্বরে চিৎকার করে তার বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরে নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ঢোল বাজান। ১৯৭২ সালের সংবিধান ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে জিয়াউর রহমান বিসমিল্লাহ সংযোজন করায় তাঁরা তাঁকে রাজনীতিতে ধর্ম আমদানী করা এবং মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ করেন। এ অভিযোগ যথার্থ ছিল। আমরাও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ এখন নিজেদের ভোল পাল্টে বিসমিল্লাহর পক্ষপাতী হয়ে বলছে, এটা সংবিধানের শরীরে রাখা বাস্তবতার কারণেই প্রয়োজনীয়। এই বক্তব্যের দ্বারা তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করছে, জিয়াউর রহমান সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করে বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তিনি এটা করার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাঁর সমালোচনা ভুল ছিল। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে আরও স্বীকার করা হয়, বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নকারীরা সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' না রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে বড় ধরনের অবাস্তবতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সাড়ে তিন বছরের আওয়ামী-বাকশালী শাসন আমলে যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে দেয়া, তাদেরকে দেশ গড়ার জন্য আহ্বান জানানো, মাদরাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে যে কাজ শুরু হয়েছিল এখন আওয়ামী লীগের নেত্রী হাসিনার দ্বিতীয় সরকারের আমলে সংধিানে বিসমিল্লাহ রাখা এবং এরশাদের আমলে পাশ করা অষ্টম সংশোধনী অনুযায়ী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রাখার সিদ্ধান্তের মধ্যে তার একটা পরিণতি ঘটলো। লক্ষ্য করার বিষয়, শুধু মহাজোটভুক্ত বামপন্থীরাই নয়, আওয়ামী ঘরাণার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের কোন প্রতিক্রিয়া এর বিরুদ্ধে নেই। তাদের মৌনতা থেকেই বোঝা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মৌলবাদ বিরোধিতার থেকে খুদ-কুড়ো, মাখন রুটির কদর তাদের কাছে অনেক বেশী। শুধু তারাই নয়, এই জোটের বাইরে অবস্থিত এককালীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শরীকদের কারও এ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত নেই। লক্ষ্য করার বিষয়, মহাজোটভুক্তসহ এসব বামপন্থীরা অহরহ ঘোষণা করছেন, এদেশে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ হলো আসল বিপদ। এই বিপদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলাই তাদের প্রধান কর্তব্য। ৭ জানুয়ারী জাসদের সম্মেলনেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু একদিকে এই ঘোষণা এবং অন্যদিকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম আইন বহাল রাখার পক্ষে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহমত পোষণ করা যে জনগণের সঙ্গে এক বড় রকমের প্রতারণা, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রেও খুদ কুড়ো খাওয়া বুদ্ধিজীবীদের মৌন ভূমিকাও লক্ষ্য করার মতো।

যে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে

www.pathagar.com

সরকার গঠন করেছিল, যারা ২০০৬ সালে খেলাফত মজলিসের মতো একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে নির্বাচনী চুক্তি করে ব্লাসফেমি আইন অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আইনগতভাবে তার চরম শাস্তির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সম্মত ছিল, তারা কিভাবে এখন বাঙলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলে– এটা এক অবাক হওয়ার ব্যাপার। এই অবস্থানের মধ্যে অসততা ও প্রতারণা এবং জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকাতাই প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট জনস্বার্থ, ধর্মীয় রাজনীতি বিরোধিতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। এদের কাজ ও বক্তব্যের মধ্যে এতো ব্যবধান এদের প্রতারক চরিত্র এখন জনগণের কাছে আর অজানা নেই। ৫ জানুয়ারী ১৪ দলের বৈঠকে এর পরিচয় নোতুনভাবে পাওয়া গেল।

যুগান্তর : ১০.০১.২০১০ ৯.১.২০১০

www.pathagar.com

বাণিজ্য মেলায় ছাত্র লীগের লুটতরাজ ও সন্ত্রাস

সন্ত্রাসী উচ্চারণ যাদের জিহ্বার নিত্যকর্ম তারা সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করার জন্য যতই পবিত্র বাক্য বিস্তার করুক, তার দ্বারা যে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়, এটা বাঙলাদেশের এক বাস্তবতা। গত এক বছরে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে সন্ত্রাস যেভাবে প্রায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্তার লাভ করছে তার দিকে তাকিয়ে এর সত্যতার প্রমাণ নোতুন করে পাওয়া যায়।

ডিসেম্বর ২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সন্ত্রাস পুরোদমে শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ছাত্র সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যাতে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। তার এভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে পর্যন্ত অবশ্য আমাদের জানা ছিল না, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে তিনি ছাত্র লীগেরও সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে রাখার জন্য তাদের ছাত্র সংগঠনটির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করেছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের সভাপতি যে নিজেদের ছাত্র সংগঠনেরও সর্বোচ্চ নেতার পদ অধিকার করে থাকতে পারেন সেটা এর আগে কোথাও দেখা যায়নি। এ ধরনের কর্ম বা অপকর্মের পরিণতি কি হয় সেটা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী কর্তৃক ছাত্র লীগের উচ্চতম নেতৃত্বের পদ দখল করে রাখা থেকেই দেখা গেল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র ছাত্র লীগের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও তার প্রয়োজনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ছাত্র লীগ থেকে পদত্যাগ করলেও এটা এক মহাসত্য যে, আওয়ামী লীগের গুণাবলী ছাত্র লীগের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার কারণেই তাদের দ্বারা উপরোক্ত সবকিছু ২০০৮-এর ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনেক কথাবার্তা ও তথাকথিত পদক্ষেপ সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আওয়ামী লীগের চিহ্নিত ও শীর্ষ সন্ত্রাসীরা যেভাবে দেশে ফেরত এসে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারি হিসেবে আবার পূর্ব ভূমিকা পালনের জন্য তৈরী হচ্ছে ও তাদের তৈরী করা হচ্ছে, তাতে ছাত্ররা যে তাদের বিরুদ্ধে মূল দলীয় নেতৃত্বের সমালোচনা ও হুমকিকে কোন গুরুত্ব দেবে না এবং তাকে এক ধরনের ভাওতাবাজি ও ভণ্ডামি মনে করেই চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুটতরাজ ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিক ব্যাপারটি দেখা গেল ২৯ জানুয়ারী ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায়। ওইদিন সন্ধ্যার দিকে ছাত্র লীগের কিছু কর্মী মেলায় আসা

www.pathagar.com

অল্পবয়স্ক মেয়েদের হয়রানি করতে থাকা এবং পয়সা না দিয়ে দোকান থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়া অর্থাৎ লুটপাট করতে শুরু করার সময় পুলিশ তাদের মাত্র কয়েকজনকে গ্রেফতার করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ' জনের মতো ছাত্র লীগ কর্মী সেখানে এলোপাতাড়িভাবে একশ'র মতো গাড়ি ভাংচুর এবং ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেকে আহত হয়। পুলিশ সূত্র থেকে জানানো হয়, ছাত্র লীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ও সক্রিয় কর্মীদের নেতৃত্বেই অন্যরা এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়। (ডেইলি স্টার, ৩০ জানুয়ারী ২০১০)।

বাণিজ্য মেলার এ ঘটনা এখন কোন ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়। এটাই এখন প্রতিদিন ঢাকা ও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং সাধারণভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটছে। এদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এখন জনজীবন সর্বক্ষেত্রেই বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হচ্ছে। এদেশে আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবী এবং আওয়ামী মার্কা লোকরা 'জঙ্গী জঙ্গী' করে এমন আওয়াজ এখনও দিয়ে যাচ্ছে যাতে মনে হয় ধর্মীয় সন্ত্রাসীরাই এদেশে মূল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালনা করছে। বিএনপি আমলে তাদের উস্কানি ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার ফলে তাদের যথেষ্ট উপদ্রব ছিল। কিন্তু এখন এ ধরনের জঙ্গীদের তৎপরতার প্রান্তিকীকরণ হয়েছে, তার অস্তিত্ব বিশেষ নেই বললেই চলে। এখন যারা দেশে ধর্মীয় জঙ্গীদের থেকে ব্যাপকতর এবং আরও মারাত্মকভাবে জনজীবন সন্ত্রাস ও লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করেছে তাদের সঙ্গে ধর্মীয় কোন সংগঠনের যোগাযোগ নেই। তারা 'ধর্মনিরপেক্ষ'। কাজেই আওয়ামী লীগের আমলে এখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' সন্ত্রাসীরাই ধর্মীয় জঙ্গীদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করেছে। 'ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের' একাংশের ধারণা, দেশে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে এবং ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিকভাবে হটিয়ে দিলেই দেশে প্রগতিশীলতার চাবিকাঠি খুলে যাবে, শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং উন্নতির পথও উন্মুক্ত হবে। এটা যে এক মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর ধারণা আওয়ামী লীগই সেটা নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করছে। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলরাই যে প্রতিক্রিয়াশীলতার একমাত্র রূপ নয়, উপরন্তু ধর্মীয় কাঠামোর বাইরে থেকে আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত শক্তিগুলোই যে প্রতিক্রিয়াশীলতার মূল ধারক-বাহক, এটাই বিশ্বের দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে। বাঙলাদেশে আওয়ামী লীগ 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ঝাণ্ডা তুলে যেভাবে এক আগ্রাসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তার প্রমাণ মানুষ অনেকভাবেই পাচ্ছে। বাণিজ্য মেলায় ছাত্র লীগের সন্ত্রাস এই প্রতিক্রিয়াশীলতারই এক বিশেষ রূপ।

ছাত্র লীগ, যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠন আজ দেশজুড়ে যে ছাত্র সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। একে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে করার কারণ নেই। এর সাথে ছাত্র লীগের মূল দল আওয়ামী লীগের নাড়ীর সম্পর্ক। ১৯৭২ সাল থেকে আওয়ামী লীগ এদেশের জনগণের ওপর যে সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে, যেভাবে লুটতরাজের মাধ্যমে অর্থসম্পদ অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, সেই প্রক্রিয়াই এখনও পর্যন্ত জারী আছে।

এর থেকে বোঝা যায়, এদেশে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে, বিশেষত সামাজিক

www.pathagar.com

ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রয়োজন হলেও সেই সংগ্রাম কোন মৌলিক সংগ্রাম নয়। মৌলিক সংগ্রাম হলো শোষকদের যে শ্রেণীগত শাসন দেশে জারী আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ সংগ্রাম গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারলে তার অগ্রগতি ও সাফল্য নিশ্চিত করতে পারলে তার পার্শ্ব ফল হিসেবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা এমনিতেই উচ্ছেদ হবে। কারণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। শুধু তাই নয়, এই প্রতিক্রিয়াশীলতা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকেই উদ্ভুত। এক কথায় বলা চলে, সাম্প্রদায়িকতাসহ সব ধরনের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার কোন স্বাধীন ভিত্তি ও সত্তা নেই।

আওয়ামী লীগ নিজেও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সঙ্গে আপস করে ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর অন্য অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এবং ২০০৭ সালের ঘোষিত নির্বাচনের আগে ২০০৬ সালের শেষ দিকে খেলাফত মজলিসের সঙ্গে সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামির প্রমাণ দেয়। শুধু আওয়ামী লীগই নয়, সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের শোষণ-শাসনের প্রয়োজনে সব সময়ই ধর্মের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হলেই যে জনগণ শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনমুক্ত হবে, এ চিন্তা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর। এ কারণে সাধারণভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা না করে অথবা তাকে গৌন জ্ঞান করে যারা সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদকেই প্রগতিশীলতার মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেন তারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটানোর পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতা টিকিয়ে রাখার জন্যই পরোক্ষভাবে এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারে কাজ করেন।

ধর্মীয় জঙ্গীদের মোকাবিলা করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বাঙলাদেশে তাদের নিজেদের শাসন আমলে জঙ্গীবাদ অর্থাৎ সন্ত্রাস দমন করার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন উদ্যোগ নেই। উপরন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র, যুবক এবং হাজার হাজার দক্ষ সন্ত্রাসী এখন দেশের অর্থনীতি ও জনগণের জীবন বিপর্যস্ত করছে।

এ বিষয়টিকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখে, জনগণকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে হবে। মুখে জঙ্গীবাদের বিরোধিতা করে কার্যত দেশে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার যত চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ ছাড়া যেমন এদের রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না, তেমনি পরবর্তীতে অন্য সন্ত্রাসীদের ক্ষমতায় ফেরত আসা প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে না।

যুগান্তর : ৩১.০১.২০১০ ৩০.১.২০১০

www.pathagar.com

বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রয়োজন কি?

বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদ সম্পর্কে অতি গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো অবস্থা দেশে এখন তৈরী হয়েছে। যে অর্থে ও যে কাজের জন্য একটি দেশে জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট থাকে সে অর্থে কোন কাজ এ জাতীয় সংসদের দ্বারা হচ্ছে না এবং পরিস্থিতির মধ্যে আমূল পরিবর্তন না ঘটলে এটা পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিবর্তনের দিনক্ষণ এখন দৃষ্টিসীমার বাইরে।

হিসাব নিলে দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রায় আশি শতাংশ ব্যবসায়ী এবং অন্যদের মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রমসহ সবাই কোন না কোনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, লাইসেন্স পারমিটের সঙ্গে জড়িত। এটাই প্রধান কারণ, যে জন্য পার্লামেন্ট বয়কট করে যখন যে দল বিরোধী পক্ষে থাকে, তখন তাদের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব হয়। আগের দিনের মতো পার্লামেন্ট যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হতো তাহলে তারা নিজেদের পেশাগত কারণেই পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় তাতে উপস্থিত থাকতেন। পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদের সদস্যদের মূল পেশা এখন ব্যবসা হওয়ায় তাদের কোন পেশাগত তাগিদ সংসদে উপস্থিত থাকার জন্য নেই। এ কারণেই শুধু যে বিরোধীদলই সংসদ বর্জন করে বসে থাকে তাই নয়, সরকারী দলের সদস্যরাও সংসদ অধিবেশন চলাকালে সংসদে অনুপস্থিত থাকেন। অর্থাৎ তারাও বাস্তবত সংসদ বর্জন করেই নিজেদের ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকেন। এ কারণে প্রায়ই সংসদ অধিবেশনের সময় কোরাম হয় না, কোরাম কোন রকমে হলেও অধিবেশন শুরু হয় দেরিতে।

এতো গেল জাতীয় সংসদের অবস্থার একটা দিক। এর অন্যদিক হলো এই সংসদের অধিবেশনে কোন সময়ই এমন কোন বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্ক হয় না যার কোন প্রকৃত গুরুত্ব থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এমন অগণিত বিষয় আছে যা জাতীয় সংসদে আলোচিত হওয়া দরকার। কিন্তু দেখা যায় যে, সে রকম কোন বিষয়ই জাতীয় সংসদে কোন সময়ে উপস্থিত করা ও তার ওপর আলোচনা হয় না। এদিক দিয়ে বিচার করলে বোঝার অসুবিধা হবে না যে, জাতীয় সংসদ আমাদের জাতীয় জীবনে কোনভাবেই প্রাসঙ্গিক নয়।

নোতুন সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পর এর কাজ দাঁড়ায় একজন নেতা নির্বাচন ও তার নেতৃত্বে এক নোতুন সরকার গঠন। নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তারাই এভাবে গঠন করেন সরকার। অবস্থা দেখে মনে হয়, এভাবে সরকার গঠন ছাড়া পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় সংসদের আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই।

নিয়ম অনুযায়ী কিছুদিন অন্তর সংসদ আহ্বান করা হয়। এভাবে আহূত সংসদে যে ক'জন উপস্থিত থাকেন তাদের দিয়ে সরকার কতকগুলো আইন পাস করিয়ে নেয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এ নিয়ে কোন আলোচনাও সংসদে হয় না। দেখা যায়, অনেক সময় মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এভাবে কোন আলোচনা ছাড়াই একগুচ্ছ আইন প্রস্তাব ও পাস করিয়ে

www.pathagar.com

নেয়া হয়। অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে দেশ শাসন করলে যে অবস্থা দাঁড়ায় এভাবে আইন প্রণয়ন হওয়ার সঙ্গে তার কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। কাজেই এসব আইন কোন নির্বাচিত সরকার, অনির্বাচিত সরকার বা সামরিক সরকারের দ্বারা প্রণীত হওয়ার মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নির্দেশ করাও চলে না।

দেশ ও জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সংসদে আলোচনা না হলেও সংসদ অধিবেশন চলাকালে যে সেখানে নীরবতা বিরাজ করে এমন নয়। সেখানে দেখা যায়, অনেক জোর কথাবার্তা এবং এই জোর কথাবার্তার জন্য 'ফ্লোর' পাওয়ার প্রতিযোগিতা! বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সরকার পক্ষের লোকেরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন, বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, ভাঁড়ামি ও খিস্তিখেউড় করেন, সে কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। বিরোধী পক্ষের লোকেরা সে যে দলেরই যখন হোক, অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে তাদের এই জিহ্বা চর্চার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। উপরন্তু সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয়ে সংসদে উপস্থিত থাকলে খিস্তিখেউর বেশ প্রাণবন্ত হয়!

এদিক দিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশঃ দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। এবারকার জাতীয় সংসদ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং যেভাবে এই সংসদের সদস্যরা, বিশেষত সরকার দলীয় সদস্যরা আচরণ করছেন সেটা ভাঁড়ামি, খিস্তিখেউড়, অশ্লীলতা ইত্যাদি দিক দিয়ে পূর্ববর্তী যে কোন সংসদের রেকর্ড ছড়িয়ে গেছে। শেখ হাসিনার এক আত্মীয় সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে নিয়ে গণ্যমান্য সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীরা নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতির ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে যেসব কথাবার্তা বলছেন তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়াকে তারা 'অমানুষ', 'কূটনি বুড়ি' ইত্যাদি অশ্লীল আখ্যা দান করে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন। বাঙলাদেশে এখনও পর্যন্ত জাতীয় সংসদে কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় স্পিকার দেখা যায়নি। কাজেই আওয়ামী লীগের স্পিকার সাহেব এসব মন্তব্য মিনিটস থেকে এক্সপাঞ্জ বা বাতিল না করে তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেকর্ড করে রেখেছেন। এসব দেখে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সম্পর্কে কী ধারণা করবে এ নিয়ে তাদের কোন ভাবনা নেই। তাদের ধারণা, এই অশ্লীল গালাগালি রেকর্ড করে রাখলেই বাজিমাৎ করা যায়। কাজেই এসব কাজ করে তারা বাজিমাতের আনন্দে বিস্ফোরিত!

বর্তমান জাতীয় সংসদের করুণ অবস্থা ভালোভাবে বোঝা যাবে অন্য একটি বিষয়ের দিকে তাকালে। এই অধিবেশনে হঠাৎ করে শেখ হাসিনা ও তার এক আত্মীয় (যাকে সভ্য আচরণের জন্য কেউ দোষারোপ করতে পারবে না) জাতীয় সংসদে জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে এমন কথাবার্তা বললেন, যা শুনে যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরই থ হওয়ার কথা। তারা বললেন, জিয়ার কবর বলে যা পরিচিত সেখানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ ছিল না। শুধু একটা বাক্সকেই সেখানে কবর দেয়া হয়েছিল। তাদের এই বক্তব্যের কারণ, কেউই জিয়াউর রহমানের লাশ দেখেনি, তার কোন ছবিও নেই। জিয়াউর রহমানের লাশ সম্পর্কিত এই কথাবার্তার বিষয় এখানে অবতারণার প্রয়োজন হতো না। যদি জাতীয় সংসদের মতো একটি সাংবিধানিক

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে বিষয়টির অবতারণা না হতো। জিয়াউর রহমানের লাশের ছবি তোলা হয়নি এটা ঠিক। এর একটা কারণ হতে পারে যে, চট্টগ্রামে তাকে সমাধিস্থ করার কয়েকদিন পর তার লাশ ঢাকায় এনে দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই সময়ে লাশের যে অবস্থা হয়েছিল সেটা ছবি তুলে রাখার মতো নয়। কোথায় তাকে প্রথম সমাধিস্থ করা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই তার সমাধি চিহ্নিত করে সেখান থেকে লাশ উঠিয়ে ঢাকায় নিয়ে আশা হয়েছিল। কাজেই এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে কথাবার্তা বলা পায়ে পা দিয়ে গ্রাম্য মেয়েলি কায়দায় ঝগড়া ছাড়া আর কি? দ্বিতীয়ত, এ প্রসঙ্গে যেভাবে হাসিনা ও তার আত্মীয় খালি বাক্স কবর দেয়ার কথা বলেছেন, তাতে মনে হয় বাক্সটি কবর দেয়ার সময় তাদেরকে খালি অবস্থায় দেখানো হয়েছিল এবং সেই চাক্ষুস অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তারা লাশ সমাধিস্থ করার পরিবর্তে শূন্য বাক্স মাটিচাপা দেয়ার কথা বলছেন! মজার ব্যাপার এই যে, খালি বাক্স কবর দেয়ার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাসিনার আত্মীয় আবার এ কথাও বলছেন যে, ওই বাক্সতে যে লাশ ছিল তার ডিএনএ করা দরকার!

কেন এসব দরকার? দেশের জনগণের যে এর কোন দরকার নেই এটা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এ দরকার হলো, আওয়ামী লীগের নিজের। কাজেই জাতীয় সংসদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে অক্ষম এই ভোট পাওয়া লোকরা প্রকৃত জন প্রতিনিধি না হওয়ার কারণে নানা ধরনের আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই এসব বিষয়ের অবতারণা নোতুনভাবে করছে। তা না হলে তাদের পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পাঁচ বছর তারা তো এ নিয়ে কোন কথা বলেনি। এ হলো তাদের এক 'নবআবিষ্কার'! এই আবিষ্কারই বা কীভাবে হলো? এর বৃত্তান্ত ও প্রমাণ জনগণ নিশ্চয়ই দাবি করতে পারেন, কারণ জনগণের পয়সায় সংসদে দাঁড়িয়ে এসব অশ্লীল আবোল-তাবোল কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এর ক্ষতি বর্তাচ্ছে জনগণের উপর!

শেখ হাসিনার উপরোক্ত আত্মীয়ের আচরণের মধ্যে আদব-কায়দার এমনই অভাব যে, বিরোধী দল অনেক দিন পর সংসদে আসার পরমূহূর্তেই তিনি আবার জিয়ার লাশের কথা তুলে সংসদে এমন অবস্থা তৈরী করেছেন যাতে বিরোধী দল ওয়াক আউট করতে বাধ্য হয়। একদিকে বিরোধী দলকে সংসদে আসতে বলা এবং অন্যদিকে তারা আসামাত্র তাদের সংসদ অধিবেশন ত্যাগ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কোন স্বাভাবিক রাজনৈতিক আচরণ নয়। এদের এই আচরণ যে, স্পিকারের চরম দলীয় আচরণের কারণেই সম্ভব হচ্ছে এটাও বলা প্রয়োজন।

কাজেই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও প্রায় শিক্ষিত ভোটপ্রাপ্ত লোকদের দ্বারা গঠিত এই জাতীয় সংসদের কোন প্রয়োজন বাঙলাদেশের জনগণের নেই। নির্বাচনের ঠিক পর একবার জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে সরকার গঠনের পর এর কোন প্রয়োজন আর নেই। সংসদ চালিয়ে সদস্যদের পকেট ভর্তি ছাড়া এর দ্বারা অন্য কোন কাজ হয় না। কাজেই সরকার গঠিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদের কোন অধিবেশন না ডেকে অন্য অনেক সিদ্ধান্ত যেভাবে মন্ত্রী সভা কর্তৃক গৃহীত হয়, সেভাবে মন্ত্রী সভা কর্তৃক অর্ডিন্যান্স

www.pathagar.com

জারীর মাধ্যমেই দেশ শাসন করা যায়। দেশ জাতীয় সংসদের দ্বারা প্রণীত আইনের মাধ্যমে এখন যেভাবে শাসিত হচ্ছে তার থেকে এ ধরনের অর্ডিন্যান্স দ্বারা শাসিত হলে অবস্থার কোন পার্থক্য হবে না।

এবার আসা যেতে পারে অন্য প্রসঙ্গে। শেখ হাসিনা খুবই পিতৃভক্ত। এতে দোষ তো কিছুই নেই। উপরন্তু এটা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু কোন বিষয়েই মাত্রাহীনতা ঠিক নয়। বলা হয়, জলের অপর নাম জীবন। কিন্তু সেই জল যদি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করা যায় তাহলে aqua poisoning হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। একথা বলা হচ্ছে বিশেষ একটি কারণে। দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে রাস্তাঘাট, নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নামকরণ করা হয়ে থাকে। সেভাবে বাঙলাদেশে শেখ মুজিবের নামে অনেক কিছুর নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা এক্ষেত্রে যা করছেন তার মধ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যতা ও শালীনতার অভাব খুব স্পষ্ট। এবার ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি নামকরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনেক কিছু করলেও কয়েকটি রীতিমতো রুচি বিরুদ্ধ, যার মধ্যে স্বল্প বুদ্ধি ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি ঢাকায় ভাসানীর নামে নভো থিয়েটার বা প্লানেটোরিয়ামের নাম পাল্টে রেখেছেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নভো থিয়েটার'। এটা রুচিবিরুদ্ধ কাজ। তিনি বাঙলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্মেলন কেন্দ্র। এর মধ্যে রাজনৈতিক বোধবুদ্ধির কোন পরিচয় নেই। কারণ এই বিশাল ও ব্যয়বহুল ইমারতটি চীন সরকার নিজের পয়সায় তৈরী করে দুই দেশের বন্ধুত্বের স্বাক্ষর হিসেবে বাঙলাদেশকে উপহার দিয়েছিল। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে নিজের পিতার নামে নামকরণ করা শুধু কুরুচির পরিচায়কই নয়, এর মধ্যে রাজনৈতিক অবিমুষ্যকারিতার পরিচয়ও আছে। এতে চীনা সরকার স্বাভাবিকভাবেই বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এর ফলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয় যে কাজটি হাসিনা করেছেন তার ফলে তার সম্পর্কে মানুষের ধারণা মন্দ হতে বাধ্য। এটা হলো জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তন করে শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর করা। একজন পীর ও সাধু বক্তির নামে এর নোতুন নামকরণ করলেও জনগণের বোঝার অসুবিধা হয় না যে, এর মূল উদ্দেশ্য প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জিয়াউর রহমানের নাম বাদ দেয়া। একমাত্র আওয়ামী লীগের দলীয় চামচা এবং তাদের ঘরাণার কিছু বুদ্ধিজীবী ছাড়া এই অপকর্মের কোন সমর্থক দেশে পাওয়া যাবে না। এর জন্য বিএনপি'র লোক হওয়ার প্রয়োজন কারও নেই।

শেখ হাসিনা এ কাজ করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত পীরের নাম এর সঙ্গে জড়িত না করে সোজাসুজি জিয়া আন্তর্জাতিগক বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তন করে নিজের পিতা শেখ মুজিবের নাম অনুসারে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর' রাখলেই ভালো করতেন। এটা না করা তার এক মস্ত ভুল। এই ভুল সংশোধনের জন্য তাকে সম্ভবত আরও বড় একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চিন্তা করতে হবে।

আমার দেশ : ১৮.০২.২০১০ ১৬.০২.২০১০

www.pathagar.com

সিলেট সীমান্তে বিএসএফ-এর হামলা

বেশ কিছুদিন থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে তাদেরকে হতাহত করছে। ১ জানুয়ারি ২০০০ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ সাল পর্যন্ত দশ বছরে বিএসএফ-এর গুলিতে ৮৭৩ জন নিরীহ বাংলাদেশী নিহত, ৮৬৯ জন আহত হয়েছিল। এছাড়া অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়েছিল যথাক্রমে ৯০৯ ও ১৪ জনকে। ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারে বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর বিএসএফ-এর ওই হামলা অব্যাহতভাবেই চলে আসছে। হাজার হাজার মাইল সীমান্ত জুড়ে এই গুলিবর্ষণের ঘটনা ছোট-বড় আকারে এভাবে চলে এলেও কয়েক সপ্তাহ ধরে সিলেট ও ভারতের মেঘালয় সীমান্তে বিএসএফ-এর ওই সন্ত্রাসী তৎপরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে সরকারি ও বিডিআর-এর কর্তৃপক্ষকেও উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেছে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইভাবে বিএসএফ-এর গোলাগুলি বর্ষণ ও বাংলাদেশের নাগরিক হত্যার বিষয়টিসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য কয়েকদিন আগে বিডিআর-এর মহাপরিচালক দিল্লিতে বিএসএফ-এর মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১১ মার্চ ওই বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, এ ধরণের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিডিআর-এর মহাপরিচালক দিল্লিতে থাকার সময়েও সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিবর্ষণ হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, দিল্লিতে চুক্তি স্বাক্ষর করে বিডিআর-এর মহাপরিচালক ঢাকা আসার পরও সিলেটের জৈন্তাপুর-তামাবিল সীমান্তে বিএসএফ আগের মতোই বেশ বড় আকারে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়। এবার তারা কিছুসংখ্যক ভারতীয় নাগরিককেও বাংলাদেশ ভারতের মধ্যবর্তী এলাকায় ঢুকিয়ে দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি ও মাছ ধরার কাজে নামিয়ে দিয়েছে।

ওই ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্র-রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৪ মার্চ সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে তিন ঘণ্টাব্যাপী গুলিবিনিময় হয়। এর কারণ ভারতীয় বিএসএফ জৈন্তাপুর সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে এসে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে ১৫ জন আহত হয়। ওই এলাকার গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে ভেতর দিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।

প্রথম দফা সংঘর্ষ হয় বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে ভেতরে ঢুকে বাঙ্কার তৈরি করার পরদিন। এরপর দুই পক্ষের পতাকা বৈঠকের পর বিএসএফ বাংলাদেশ এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পরে ১৪ মার্চ নতুন করে আবার ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে ৪০ জন ভারতীয় মুক্তারপুর-জৈন্তীয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করে। এর একঘণ্টা পর প্রবেশ করে আরও ১০০ জন। এভাবে ভেতরে প্রবেশ

www.pathagar.com

করে তারা ডিবির হাওর এলাকার মন্দিরটিলায় বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি শুরু করে। এটা দেখে বাংলাদেশী গ্রামবাসীরা তাদেরকে সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলার পর দু'পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়। শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এই অবস্থায় বেলা দুটোর দিকে বিএসএফ গ্রামবাসী ও বিডিআর-এর লোকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এরপর বিডিআরও পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করলে দুই পক্ষে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ১ হাজার রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়। এরপর ভারতীয়রা জায়গা ছেড়ে নিজেদের এলাকায় চলে যায়। সিলেটে ২১ নম্বর রাইফেল ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল জহিরুল আলম বলেন, ভারতীয়দের এই আক্রমণ ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

ডেইলি স্টার-এর সঙ্গে কথা বলার সময় বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মহম্মদ মঈনুল ইসলাম ঘটনাটিকে 'খুব দুঃখজনক' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, বিডিআর ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর বিএসএফ তাদের গুলি বন্ধ করে। তিনি মন্তব্য করেন, দিল্লিতে তাদের বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা নিচের দিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় না পৌঁছানোর কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে! ১১ মার্চ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, এ কথা সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত হলো, অথচ নিচের দিকে কোনো খবরই পৌঁছাল না, বা তাদেরকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা হলো না, এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। চুক্তির পর সংবাদপত্র ইত্যাদির আগে যারা এ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের কাছেই তো খবর প্রথম পৌঁছানোর কথা। যাই হোক, দিল্লিতে চুক্তি স্বাক্ষরের পর আবার একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় বিডিআর মহাপরিচালকের একথা বলা ছাড়া বোধ হয় আর করার কিছু ছিল না। তবে এ নিয়ে তারা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের ব্যবস্থা করায় বিএসএফ-এর গোলাগুলি বর্ষণ আপাতত বন্ধ আছে এবং এলাকায় শান্তি ফিরে এসেছে।

কিন্তু শান্তি ফিরে এলেও ওই এলাকার লোকদের মনে আতঙ্ক পুরোদস্তুর আছে এবং তারা এখনও গ্রামছাড়া। গ্রামে ফেরার জন্য তাদের মধ্যে শান্তি বিষয়ে যে আস্থার প্রয়োজন সেটা এখনও পর্যন্ত ফিরে আসেনি।

১৫ মার্চ তামাবিল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট-এ বিডিআর ও বিএসএফ-এর পতাকা বৈঠকে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করা হয় যে, বাংলাদেশের এলাকায় তাদের সদ্য তৈরি করা 'বর্ডার পোস্ট' ও 'সাব পোস্ট'গুলো তারা সরিয়ে নেবে। এগুলো বাংলাদেশের এলাকায় কয়েকদিন আগে সীমান্ত থেকে ১২০ গজ ভেতরে তৈরি করা হয়েছিল। এ বৈঠকে বিডিআর-এর পক্ষ থেকে বিএসএফকে বলা হয় যে, ২০০৯ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা যেন নিজেদের সীমানার মধ্যে থাকে। বিডিআর-এর জহিরুল ইসলাম ডেইলি স্টারকে বলেন যে, গত বছরের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বিএসএফ বার বার সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা চালিয়েছে।

১৫ মার্চ যে পতাকা বৈঠক হয়েছে এটা তাদের মধ্যকার দ্বিতীয় বৈঠক। প্রথম বৈঠক হয়েছিল এর ২৪ ঘণ্টা আগে শনিবার বিকেলে পাদুয়া-প্রতাপপুর সীমান্তে। সেখানে বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে ভেতরে এসে ২৫টি বাঙ্কার তৈরি করেছিল।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এভাবে বিএসএফ-এর নিয়মিত আগ্রাসন, ভেতরে প্রবেশ

www.pathagar.com

ও নিরীহ বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর গুলিবর্ষণ করে তাদেরকে হতাহত করা কোনো স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যাপার নয়। যে কোনো দু' দেশের সীমান্তে ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে পারে। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যেভাবে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়মিত বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর হামলা করে ও বাংলাদেশের এলাকার ওপর চড়াও হয়, এটা কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভারত বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী রাষ্ট্র। তাদের শক্তি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যাতে ভারত পরিণত হয়েছে একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সব চরিত্র গুণই এখন ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা কতভাবে চালায় তার বিশদ বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়; তবে এটা অবশ্যই বলা চলে যে, প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে তারা বন্ধুত্বের ও মৈত্রীর সম্পর্কের কথা বলে যে আচরণ করে তার মধ্যে এর পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ যে প্রায়ই একতরফাভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সীমান্ত এলাকায় নিয়মিতভাবে এমনি করে জনগণের ওপর গুলি চালিয়ে মানুষকে হতাহত করে এর মধ্যে নিঃসন্দেহে তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রেরই প্রতিফলন ঘটে।

দেখা যায় যে, বিএসএফ যেভাবে বাংলাদেশের সীমান্তবাসী জনগণের ওপর গুলি চালায় তার কোনো বোধগম্য কারণ থাকে না। এ কারণে এসব ঘটনার পর বিডিআর-এর সঙ্গে পতাকা বৈঠকের পর তারা নিজেদের জায়গায় ফেরত যায় এবং এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সম্প্রতি সংঘটিত যে সীমান্ত সংঘর্ষের উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে তারপরও পরপর দুটি পতাকা বৈঠক হয়েছে এবং তারা আবার একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ সময়ে যে সংঘর্ষ সিলেটের জৈন্তীয়া-তামাবিল সীমান্তে হয়েছে সেটা ঘটেছে দিল্লিতে দুই পক্ষের সীমান্ত বাহিনীর প্রধানদের যৌথ বৈঠকের পর। এটা ছিল এমন বৈঠক যা সম্প্রতি নানা ধরনের সীমান্ত সংঘর্ষের মীমাংসার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বিএসএফ আর একতরফাভাবে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় গুলিবর্ষণ করে এলাকার নিরীহ নাগরিকদেরকে হতাহত করবে না। সাময়িকভাবে হলেও তাদেরকে বাধ্য করবে না নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভেতর দিকে পালিয়ে আসতে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদের কথা ও কাজের মধ্যে যে গরমিল এতদিন ধরে দেখা গেছে তার কোনো পরিবর্তন সহজে হবে এটা ভাবার কারণ নেই। দুই পক্ষের দিল্লি বৈঠকের পর আবার একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত এবং আস্থাশীল হওয়া মুশকিল ব্যাপার।

একটি সংবাদপত্র রিপোর্টে দেখা যায় যে, সিলেট সীমান্তবর্তী পশ্চিম খাসিয়া পার্বত্য জেলার ডোমিয়াসিয়াতে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া ভারতের আণবিক শক্তি বিভাগের কথা অনুযায়ী মেঘালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় গ্র্যানাইটসহ অন্য ধরণের

www.pathagar.com

কঠিন শিলার মজুত আছে। ইতোমধ্যে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ইউরেনিয়াম করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (ABSU) পশ্চিম খাসিয়া পার্বত্য এলাকায় ইউরেনিয়াম খননের একটি প্রোজেক্ট হাতে নেয়। এর বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন পরিবেশবাদী মহলের প্রতিবাদের ফলে মেঘালয়ে ইউরেনিয়াম খননের বিষয়ে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী নভেম্বর মাসেই একটি কমিটি গঠন করেন।

২০১০ সালের মার্চে অর্থাৎ এ মাসেই কমিটি তার প্রথম বৈঠকে ইউরেনিয়াম খনন এলাকার ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে কিনা সেটা দেখার জন্য বৈজ্ঞানিক মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সিলেট সীমান্তে এখন কিছুদিন ধরে ভারতীয় বিএসএফ নিয়মিতভাবে যে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের এলাকার মধ্যে ঢুকে বাড়ি-ঘর তৈরির চেষ্টা পর্যন্ত করছে, নিজেদের বেসামরিক লোকজন পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তাতে এ সন্দেহ অমূলক নয় যে, এই এলাকাতেও তারা ইউরেনিয়াম সন্ধান পেয়েছে অথবা তাদের ইউরেনিয়াম খনির পার্শ্ববর্তী এলাকা নিরাপদ রাখার জন্য সেখানে তারা নিজেদের দখল কায়েমের চেষ্টা করছে। সেটা হলে, এই অঞ্চলে বিএসএফ-এর আগ্রাসন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেও, অদূরভবিষ্যতে তাদের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা নাকচ করার নয়।

আমার দেশ : ১৮.০৩.১২ ১৭.৩.২০১০

www.pathagar.com

ছাত্র লীগের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস

ছাত্র লীগের মধ্যে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এর কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত কোন ছাত্র সংগঠনের মধ্যেই নেই। ছাত্র লীগের নিজের ইতিহাসেও নেই। বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র দলও গুণগতভাবে ইতিপূর্বে একই কাজ করে থাকলেও এবং তাদের নেতারা ও প্রথম সারির কর্মীরা অনেক রকম দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি করে নিজেদের পকেট ভর্তি ও ধনসম্পদ অর্জন করলেও বর্তমানে ছাত্র লীগ যে আকারে এবং যত বেপরোয়াভাবে এসব করছে, এটি তার থেকেও অনেক বেশী। জামায়াতে ইসলামীর ইসলামী ছাত্রশিবির আশির দশকে প্রথমত ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে খুন-খারাবি, রগকাটা, মারধর ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, নারীঘটিত কারবার ইত্যাদি তখন তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল না। এসব দিক দিয়ে বর্তমানে আওয়ামী লীগ ছাত্র সংগঠন আগের যে কোন ছাত্র সংগঠন ও সে সঙ্গে নিজেদের সংগঠনেরও সব রকম রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়ে দেশজুড়েই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী করেছে।

পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ছাত্র লীগের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকেও তারা পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এ সংগঠনটির সেই পূর্ব ঐতিহ্য এখন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র লীগ সংগঠনটি এখন চরম দুর্নীতির চক্রে এমনভাবে আটকা পড়েছে, যাতে তারা একটি ছাত্র সংগঠন হিসেবে নিজেদের ভবিষ্যৎ, এমনকি অস্তিত্বকেও বিপন্ন করেছে।

এটি হঠাৎ করে হয়নি। শুধু তাই নয়, এ ক্ষেত্র তাদের মূল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যকলাপের থেকে তাদের কার্যকলাপকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে ছাত্র লীগের বর্তমান পরিণতি বিচার করা ঠিক হবে না। এটি এক সত্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যকলাপকে যেমন যথাক্রমে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি'র কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না, তেমনি ছাত্র লীগের কার্যকলাপকেও তাদের মূল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করলে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আরও বলা দরকার, কোন দলের সঙ্গে সম্পর্কিত শুধু ছাত্র সংগঠনই নয়, প্রত্যেক ধরনের গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সব ধরনের সংগঠনের চরিত্রের মধ্যেই তাদের মূল রাজনৈতিক দলের চরিত্রই প্রতিফলিত হয়, তার দ্বারাই তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মূল রাজনৈতিক দল ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য যে কোন সংগঠনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এদের চরিত্র অন্যের চরিত্রকে যেভাবে প্রভাবিত ও

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত করে, সেটি হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত ও ঘোষণার মাধ্যমে খারিজ করা যায় না। ছাত্র লীগও এদিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়।

ছাত্র লীগ সংগঠনটির কার্যকলাপের যে রিপোর্ট প্রতিদিন প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তার থেকে বোঝার কোন অসুবিধা নেই যে, এর গণতান্ত্রিক চরিত্র বলতে আগে যা কিছু ছিল তার তিলমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। উপরন্তু এ সংগঠনটির চরিত্রের অপরাধিকীকরণ এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ সংগঠনটির অবস্থা এখন এতো খোলাখুলিভাবে সমাজবিরোধী চরিত্র পরিগ্রহ করেছে যেভাবে তারা চুরি-দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে, তাতে তাদের মূল বা পিতৃ সংগঠন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পর্যন্ত রীতিমতো আতঙ্কিত। এ আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে তারা ছাত্র লীগের কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়কে অস্বীকার করার অনেক চেষ্টা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা যে ছিন্ন হওয়ার নয় এটি এক বাস্তব সত্য। ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগেরই একটি অঙ্গসংগঠন এবং এই সম্পর্ক এখনও অটুট আছে। যদিও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এখন বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, ছাত্র লীগ আর তাদের অঙ্গসংগঠন নয়। ছাত্র লীগ যদি আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন না হয় তাহলে তারা কী? তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি? তাছাড়া এখন তারা দেশজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তার শক্তির জোগান তারা কোথা থেকে পাচ্ছে? আওয়ামী লীগ এখন সরকারী ক্ষমতায় আছে। এর ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়েই কি তারা তাদের নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ চালিয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে না? সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যদি না থাকত, সরকারের মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা যদি তারা না পেত, তাহলে এ কাজ কি একটি 'স্বাধীন' সংগঠন হিসেবে তাদের পক্ষে সম্ভব হতো?

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমি-জায়গা দখল, ডাকাতি ইতাদি হলো সন্ত্রাসেরই একেকটি রূপ। এসব রূপই এখন ছাত্র লীগের কার্যকলাপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীরা তাদের সংগঠনের ছাত্রী সদস্যদেরকে যৌন ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করার বিষয়টি সংবাদপত্র রিপোর্টে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বড় অপরাধ ও ঘৃণ্য কাজ আর কী হতে পারে? ১৯৯৬-০১ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র লীগ কর্মীদের এবং তার আগে বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কর্মীদের নারীঘটিত কিছু কার্যকলাপের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ করে ছাত্র লীগ নেতাদের এ কার্যকলাপ এখন এতো বাড়াবাড়িভাবে শুরু হয়েছিল, যাতে তার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তার বাইরে অনেক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ হয়েছিল। কিন্তু সেসব ছিল জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক বা ধর্ষণের ঘটনা। নিজেদের সংগঠনের ছাত্রীদের জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায়ের কাজে লিপ্ত করার ব্যাপার তখন ছিল না। সে রকম কোন রিপোর্ট সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়নি। এদিক দিয়ে পরিস্থিতির অবনতি কতখানি হয়েছে তারই পরিচয় পাওয়া গেল ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজের ঘটনাবলীর সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে।

www.pathagar.com

শুধু এদিক দিয়েই নয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতির আজ যে ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে, তার হিসাব সামনে রাখলে আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া অন্য প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। এই অবনতি যে ছাত্র লীগের দ্বারা ঘটেছে এবং ছাত্র লীগ যে এদিক দিয়ে সমাজে শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ পরিবেশের মধ্যে এক অশান্তি ও অসুস্থতার দ্বীপ, এমন মনে করা বড় রকম এক আহাম্মকি। উপরন্তু এটিই সত্য যে, গোটা সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে এখন যে অবস্থা বিরাজ করছে, তার প্রতিফলনই একভাবে ঘটছে ছাত্র লীগের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মধ্যে।

বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদের দিকে যদি তাকানো যায়, তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ ও তথাকথিত বিতর্ক এবং আলোচনার চরিত্রের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে আওয়ামী লীগসহ বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলো আজ অধঃপতনের কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আওয়ামী লীগ সংসদের অভ্যন্তরে নিজেদের এ পরিণতির যে পরিচয় রাখছে, ছাত্র লীগের কার্যকলাপ কি তার থেকে বিচ্ছিন্ন? উভয়ের মধ্যে চারিত্রিক সম্পর্ক কি চোখে পড়ার নয়? শুধু জাতীয় সংসদের ভেতরেই 'বিতর্ক' অথবা 'আলোচনার' মধ্যেই নয়, বাইরে সব ক্ষেত্রেই তারা যা করছে তার হিসাব নিলেও এই একই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য উপায় নেই। অনেক বড় বড় ব্যাপার, উচ্চমার্গের নেতা-নেত্রীদের তো কথাই নেই, নিম্নস্তরের আওয়ামী লীগ সদস্য ও স্থানীয় লোকদের মধ্যেও যে বেপরোয়া দুর্নীতি এখন দেখা যাচ্ছে তারও যথেষ্ট সম্পর্ক ও প্রাসঙ্গিকতা ছাত্র লীগের কার্যকলাপের সঙ্গে আছে। একটি সংবাদপত্র রিপোর্টে আজ (ডেইলি স্টার, ২২.৩.২০১০) দেখা যাচ্ছে যে, খুলনায় খোলাবাজারে চাল বিক্রির (ওএমএস) পারমিট প্রকৃত ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের এমন সব লোককে দেয়া হয়েছে, যাদের সঙ্গে ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে চোরাবাজারী ও লুটপাটের সুবিধা করে দেয়ার জন্যই এটি করা হয়েছে খুলনার আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসের দ্বারা। এ ধরনের ঘটনার তালিকা দেয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ হাজার হাজার ক্ষেত্রে এ ধরনের দুর্নীতি এখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং এসব ঘটছে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের দ্বারাই।

এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন সারাদেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা এখন সৃষ্টি করছে, তাকে বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে ধরে নিয়ে তার মোকাবিলার চেষ্টা এক ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ঠিক এ কারণেই আওয়ামী লীগের পক্ষে অনেক লম্বা-চওড়া কথা বলা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে ছাত্র লীগের অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। নিজেদের মূল রাজনৈতিক দলের চরিত্র ও কার্যকলাপ দুর্নীতিতে পূর্ণ রেখে এবং তার পরিবর্তনের কোন চিন্তা বা চেষ্টা না করে শুধু ছাত্র সংগঠনই নয়, তাদের অন্য অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্যেও যে অপরাধমূলক কার্যকলাপ জারী আছে তা বন্ধ, এমনকি কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা যে তাদের পক্ষে সম্ভব, এর থেকে অবাস্তব চিন্তা আর কী হতে পারে?

সমকাল : ২৩.০৩.২০১০ ২২.৩.২০১০

www.pathagar.com

র‍্যাব মহাপরিচালকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য

র‍্যাবের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, 'ক্রস ফায়ারে যেসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিটিই আইনসিদ্ধ, কোনটিই আইন বহির্ভূত নয়। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে আইনানুগ তদন্ত হয়েছে। সবকিছু আইনের কাঠামোতেই সম্পন্ন হয়েছে।' (আমার দেশ, ৩০.৩.২০১০)। তিনি আরও বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ছয় বছরে ক্রসফায়ারে মারা গেছে ৬২২ জন। এর মধ্যে ১৪ জন মারা গেছে চলতি বছরের প্রথম দু'মাসে।'

র‍্যাব মহাপরিচালকের এই দাবি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাদের কথামতো বিএনপি আমলে প্রতিষ্ঠিত র‍্যাব বিএনপি এবং সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ফখরুদ্দীন সরকারের আমলেও ক্রসফায়ারে যেসব হত্যা করেছে সেগুলো সবই ছিল আইনানুগ, কোনটিই আইন বহির্ভূত নয় এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই যথাযথ তদন্ত হয়েছে।

এখানে বর্তমান সরকারের আমলে ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ডের কথা না বলে এবং পূর্ববর্তী দুই সরকারের আমলের কথা বলা হচ্ছে এ কারণে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, বিএনপি ও ফখরুদ্দীন সরকারের আমলে যেসব ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ড হয়েছে তারা সেগুলোর বিচার করবে এবং তাদের শাসন আমলে তারা নিজেরা ক্রসফায়ার একেবারে বন্ধ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যের মূল কথা ছিল আগে ক্রসফায়ারে আইন বহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ড হয়েছে এবং সে ধরনের হত্যাকাণ্ড তারা বন্ধ করবে।

বর্তমান র‍্যাব মহাপরিচালক যে বক্তব্য প্রদান করেছেন সেটা হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচনকালীন বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যদি শুধু বর্তমান সরকারের আমলের কথা বলতেন তাহলে সেটা হতো এমন যাতে আওয়ামী লীগ সরকারের আপত্তি করার মতো কিছু থাকত না। কিন্তু র‍্যাব-এর পক্ষ থেকে তাদের মহাপরিচালক যে বক্তব্য এখন প্রদান করেছেন তার জবাবদিহিতা শুধু জনগণকেই নয় বর্তমান প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগকেও চাইতে হবে। সরকার যদি র‍্যাব মহারিচালককে এই জবাবদিহিতার জন্য নির্দেশ না দেয় তাহলে বুঝতে হবে এদেশে এখন সরকারী সংস্থাসমূহ তো বটেই এমনকি খোদ ক্ষমতাসীন সরকারের মধ্যেও নিম্নতম শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। কাজেই এক্ষেত্রে জনগণ সরকারের কাছেও দাবি জানাতে পারেন যাতে সরকার র‍্যাব মহাপরিচালককে তার বক্তব্যের জবাবদিহিতা করতে বাধ্য করে। আসলে এ ধরনের আচরণের জবাবদিহিতার জন্য জনগণের দাবির কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাঙলাদেশের অবস্থা

www.pathagar.com

এখন শোচনীয়। এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও সংস্থাগত দায়িত্ববোধ বলে কিছুই নেই। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে র‍্যাব মহাপরিচালকের উপরোক্ত দায়িত্বহীন বক্তব্যের জবাবদিহিতা এখন পর্যন্ত সরকার থেকে না চাওয়ার কারণেই জনগণ কর্তৃক এই দাবির যথার্থতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এবার আসা যেতে পারে র‍্যাবের ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ডের অপরাধমূলক চরিত্রের বিষয়ে। মহাপরিচালক বলেছেন, প্রত্যেকটি ক্রসফায়ার ঘটনাই আইনসিদ্ধ এবং প্রতিটি ঘটনারই আইনানুগ তদন্ত হয়েছে। এসব কথাবার্তার সত্যতা এই দেশে কে বিশ্বাস করবে? মানুষ কি জানে না কী ভাবে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে? এই ক্রসফায়ারের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একই রকম গল্প তৈরী করে তারা কয়েকশ'বার এমনভাবে তার পুনরাবৃত্তি করেছে যাতে এটা সারাদেশের জনগণের মুখস্ত হয়ে গেছে। একজনকে গ্রেফতার করার পর তাকে তার এলাকায় অস্ত্র উদ্ধার ও লোকজন পাকাড়াও করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের হাতে আটক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই সশস্ত্র সংঘর্ষে আটক ব্যক্তির দলভুক্ত অন্য কোন লোক এবং র‍্যাবের কোন লোক নিহত হন না। নিহত হন শুধু র‍্যাবের হাতে আটক ব্যক্তিই।

এই গল্প শুনিয়েই র‍্যাব তাদের ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এসেছে। আসলে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রকৃত ক্রসফায়ারের কোন সম্পর্ক নেই। এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে যা ঘটে তাহলো, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে তার এলাকায় তাকে গুলি করে হত্যা করা। এই যখন প্রকৃত ঘটনা তখন ক্রসফায়ারের প্রতিটি ঘটনা আইনানুগ হয় কী ভাবে? কী ভাবেই বা এটা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড না হয়ে আইনানুগ শাস্তি হতে পারে? র‍্যাবের ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এসব কথা নোতুন নয়। কিন্তু র‍্যাব নামক একটি মারাত্মকভাবে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থার মহাপরিচালক যখন চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন যে, এসব ক্রসফায়ারের প্রতিটি ঘটনা আইনানুগ, ৬২২টি মৃত্যুর ঘটনাই আইনানুগ, তখন একে মহাবিপজ্জনক ও আতঙ্কজনক ব্যাপার ছাড়া আর কী বলা যায়? কারণ, এক্ষেত্রে র‍্যাব মহাপরিচালক বক্তব্য যেভাবে প্রদান করেছেন সেটা তার পক্ষে সম্ভব হতো না যদি না সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবস্থা বিশৃঙ্খল না হতো। অর্থাৎ বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যের গর্ভেই র‍্যাব মহাপরিচালকের এই ঔদ্ধত্যের জন্ম। বাঙলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, শুধু র‍্যাব নয়, সাধারণ প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সম্প্রদায়, আদালত থেকে নিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাঙন এখন স্পষ্ট। এই ভাঙন শুধু উপরোক্ত ক্ষেত্রেই নয়, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সর্বত্রই বিদ্যমান। সরকারী ও বিরোধী দলগুলোর নেতৃত্বের নানা বক্তব্যের মধ্যেও এই শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের অভাব খুব প্রকট। শেখ হাসিনা এখন বারবার বলছেন, ফখরুদ্দীন সরকার আটক রাখা অবস্থায় তাকে Slow poisoning করত অর্থাৎ তার খাদ্যে নিয়মিত বিষ প্রদান করত। অথচ সেই ফখরুদ্দীন সরকার বিএনপিকে হটিয়ে সামরিক শক্তির জোরে ক্ষমতাসীন হওয়ার

www.pathagar.com

সময় হাসিনা বলেছিলেন যে, সেই সরকার হলো তাদের আন্দোলনেরই ফসল। তাদের আন্দোলনের ফসল স্বরূপ সরকার কী ভাবে আবার তাকে নিয়মিত ভাবে বিষ প্রয়োগ করত সেটা দেখা দরকার। শেখ হাসিনা আটক অবস্থা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কি নিজের শরীরের ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েছিলেন? যদি করে থাকেন তবে সে রিপোর্ট তার প্রকাশ করা উচিত। যদি সেটা না করে থাকেন তাহলে তার জবাবদিহিতা তাকে করতে হবে। কারণ, সেটা না করে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ওইসব কথাবার্তা সস্তা রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি ছাড়া অন্যকিছু মনে করার কারণ জনগণের নেই। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া হাসিনার এই কাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে তার বক্তৃতায় বলেছেন, তাকে ফখরুদ্দীনরা ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে বিদেশে পাঠাতে চেয়েছিল। তার ভাগ্য ভালো যে, শেষ পর্যন্ত সে ইনজেকশন তারা তাকে দেয়নি! কিন্তু তিনি কী ভাবে জানলেন যে, তাকে ফখরুদ্দীন ইনজেকশন দিতে চেয়েছিল বিদেশে পাঠানোর জন্য এবং শেষ পর্যন্ত কেনই বা তারা এ ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল?

এসব কথা র‍্যাব মহাপরিচালকের ক্রসফায়ার সম্পর্কিত বক্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, এর উল্লেখ করা হয়েছে সারা দেশে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে, শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে থাকা অংশের রাজনৈতিক দল, তাদের নেতৃবৃন্দ, অঙ্গসংগঠনসহ সর্বত্র আজ যে বিশৃঙ্খলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, বক্তব্যের স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে র‍্যাব মহাপরিচালকের উপরোক্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য ঘনিষ্ঠভাবে, অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

আমার দেশ : ০১.০৪.২০১০ ৩১.৩.২০১০

www.pathagar.com

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে যারা অপরাধ করেছিল, তাদের বিচার হওয়া দরকার। বিচার করে তাদের শাস্তি দেয়াও দরকার। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার যেভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি নিয়ে বাজার গরম করছে তাতে এ ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া দরকার– এটা কোন নোতুন দাবি নয়। তার কারণ, এর বিচার ১৯৭১ সালের পর তৎকালীন সরকারের দ্বারাই হওয়া উচিত ছিল। সেটা হয়নি। শুধু তাই নয়, যে ১৯৫ জন পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ছিল তাদের সেই সময় বিচার না করে পাকিস্তানে ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ সরকার নিয়েছিল। মজার ব্যাপার যে, এভাবে তাদের পাকিস্তানে ফেরত দেয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্ত শেখ মুজিব এবং তাঁর মন্ত্রী কামাল হোসেন জোর গলায় বলে চলেছিলেন, ওই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতেই হবে।

যুদ্ধাপরাধে আটক জামায়াতে ইসলামীর অনেক নেতা-কর্মীসহ অন্যদের এক সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। এই ক্ষমার চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। নিজামী, মুজাহিদ, সাঈদী প্রমুখ যাদের বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধাপরাধের মামলা দায়ের করা হচ্ছে, তারাও এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়ে মুক্তি লাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মুক্তি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের প্রতি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের আহাবানও জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

এর পরও কথা আছে। ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসের প্রথম দিকে শেখ মুজিব ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে এক সাক্ষাতকার দেন। সেটা ছাপা হয় ভারতের ইংরেজি দৈনিক Statesman পত্রিকায়। তাতে তিনি বলেন, তিনি ও ভুট্টো পুরনো বন্ধু এবং ভুট্টোকে তার সাহায্য করা দরকার। এ সময় লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে তার প্রতি পাকিস্তান সরকার, বিশেষ করে ভুট্টোর আতিথেয়তার কথা বলতে গিয়ে শেখ মুজিব আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, জনগণের উচিত পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়া। সেই সময় Statesman-এ প্রকাশিত কুলদীপ নায়ারের এই বহুল আলোচিত সাক্ষাৎকার প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশ সরকার কোন প্রতিবাদ জানায়নি। এর আগে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে শেখ মুজিব জুলফিকার আলী

www.pathagar.com

ভুট্টোকে 'আমার পুরনো বন্ধু' বলে আলিঙ্গন করেন এবং তার গালে চুমু খান। এগুলো কোন বানানো কথা নয়। তখনকার সংবাদপত্রেই এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ভুট্টোই ছিলেন সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক যুদ্ধাপরাধী। লাহোর সম্মেলনের পর ১৯৭৪ সালেই তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিব ভুট্টোকে অতি সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাঙলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেন। এসবই হলো অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্য আড়াল গোপন অথবা অস্বীকার করা অপরাধ তুল্য কাজ।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এসব প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এর উল্লেখ করা প্রয়োজন হলো। শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমা ছিল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যারা নির্দিষ্ট অপরাধ করেছিল, তাদের জন্য নয়। কাজেই এখন যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত ও বিবেচনা করা হচ্ছে, তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণেই তাঁদের শাস্তি প্রদান আইনত সম্ভব নয়। এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, শারীরিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করা দরকার। এটা না করে শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে হৈচৈ করা অথবা যুদ্ধাপরাধীরা এই বিচার ভণ্ডুল করতে চাইছে– এই প্রচার চালানো দ্বারা কোন প্রকৃত বিচার হবে না। শীর্ষ পর্যায়ের সরকারী ব্যক্তিরা পর্যন্ত কূটনীতির কোন পরোয়া না করে বলছেন, যুদ্ধাপরাধীরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য সৌদি আরবের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করছে। সৌদি আরব এই বিচারের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে– এমন আশংকা তারা প্রকাশ করছেন। এই প্রচারণার বিরুদ্ধে ৫ এপ্রিল ঢাকায় সৌদি আরবের দূতাবাস থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবশ্যই হওয়া দরকার। ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে এ জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পক্ষে বিপুল জনসমর্থন দেখা গিয়েছিল। কারণ, জনগণ সঠিকভাবেই বিশ্বাস করেছিল, সেই আন্দোলনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা মতলববাজি ছিল না। তবে শেষ দিকে, মার্চের মাঝামাঝি সময়ে তারা এর সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে। কিন্তু তারপর? ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর এককভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব না হওয়ায় তারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। তখন জামায়াত নেতা নিজামীর সঙ্গেই শেখ হাসিনার কথাবার্তা হয়, যে নিজামীকে এখন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে সমঝোতার ভিত্তিতে জামায়াতকে জাতীয় সংসদে মহিলা আসনও দেয়া হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে কিছুই করা হয়নি। করার উপায়ও ছিল না। কারণ, যাদের সাহায্যে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছিল, তাদের বিচার তারা করবে কিভাবে?

আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদকালে বলতে হবে প্রায় হঠাৎ করেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে বেশ তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে যারা যুদ্ধাপরাধ

www.pathagar.com

করেছিল, তাদের বিচারের দাবি জনগণের দাবি। কিন্তু জনগণের এই দাবি দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থাকার পর কিছুদিন আগে 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম' এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু সেই আন্দোলনও তারা শুরু করেছিল বিস্ময়কর বিলম্বে এবং আওয়ামী লীগ মহলে তার বিশেষ কোন পাত্তা ছিল না। এ অবস্থায় এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে সরকারের আগ্রহ অতিরিক্ত তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বিচার ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধাপরাধীদের চক্রান্ত ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। বিচার ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধাপরাধীদের চক্রান্ত ইত্যাদি নিয়ে সংবাদপত্রের পাতা গরম করে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। বাস্তবত দেখা যাচ্ছে, এ বিষয় নিয়ে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের তৎপরতা আর আগের মতো নেই। সরকারের হাতে দায়িত্ব সমর্পণ করে তারা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে।

১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে সরকারীভাবে এখন যা করা হচ্ছে তার মধ্যেই বিচার ভণ্ডুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার যুদ্ধাপরাধীর তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নাকি কাঁড়ি কাঁড়ি তথ্যপ্রমাণ হস্তগত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির ন্যুরেমবার্গে যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধীনে হয়েছিল তাতে হাজার হাজার লোকের বিচারের চেষ্টা হয়নি। আসলে সেরকম কিছু প্রকৃতপক্ষে সম্ভবও নয়। কাজেই সেই ট্রাইব্যুনাল নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে সুনির্দিষ্ট অপরাধের ভিত্তিতে তাদের শাস্তি দিয়েছিল। এখন হাজার হাজার লোকের বিচারের নামে যে বিশৃঙ্খলা বিচার ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে তাতে শেষ পর্যন্ত এই বিচার ভণ্ডুল হওয়ারই আশঙ্কা। জনগণ এসব চায় না। তারা চায় প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার– সেইসব যুদ্ধাপরাধী যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অপরাধের প্রমাণ আছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ৩৮ বছর পর শুরু করার এই চেষ্টার ফলে অনেক যুদ্ধাপরাধীই এখন আর জীবিত নেই। এ অবস্থায় হাজার হাজার যুদ্ধাপরাধী পাকড়াও করার চেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার ভূমিকা অগ্রাহ্য করার নয়। তা ছাড়া বয়সেও একটা ব্যাপার আছে। দেখা যায়, এমন লোককে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে যাদের অপরাধ করার বয়স সেই সময় ছিল না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে এসব বিষয় হিসাবের বাইরে রাখা ঠিক নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া দরকার। এই বিচার আরও বিলম্বিত হলে অপরাধীরা ফাঁকি দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করতে পারে। কাজেই বিচার সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হলে যাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে এমন সুনির্দিষ্ট ও সঠিক তথ্য হাজির করা দরকার, যার ভিত্তিতে আইনগতভাবে তাদের শাস্তি প্রদান সম্ভব হয়।

এই আলোচনা শেষ করার আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য একটি বিষয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে সরকার ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বড় আকারে চাকরির কোটা নির্ধারণের কথা বলছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক মুক্তিযোদ্ধার নোতুনভাবে চাকরি পাওয়া কথা। কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে? মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ৩৮ বছর আগে। সেই সময় যারা যুদ্ধ করেছিল,

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা অল্পবয়স্ক ছিল তাদের বয়সও এখন অবসর গ্রহণের পর্যায়ে। তাহলে এভাবে কোন্ ধরনের 'কোটাভুক্ত' মুক্তিযোদ্ধারা চাকরি পাবেন? এ পরিস্থিতিতে অনেকের আশংকা, মুক্তিযোদ্ধা আখ্যা দিয়ে এমন সব লোককে চাকরি দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, যারা এমন সরকারী দলের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত এবং ১৯৭১ সালে তারা শিশু ছিল, এমনকি হয়তো কারো কারো জন্মই হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা পুনরুৎপাদিত হওয়ার মতো জিনিস (Renewable Substance) নয়। কাজেই বড় আকারে কোটা নির্ধারণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের এখন চাকরি দেয়ার অর্থ স্বজনপ্রীতি ও সদলপ্রীতি ছাড়া আর কী হতে পারে?

বর্তমান সরকার মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির সংকটে জর্জরিত। এ অবস্থায় তাদের জনপ্রিয়তা দ্রুত ও দারুণভাবে কমে আসছে। কাজেই অবস্থা দেখে এটাই মনে হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সরকারের আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো এই বিচারের ধুয়া তুলে জনগণের দৃষ্টি তাদের আশু সমস্যাগুলো থেকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখা। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাকরির কোটা নির্ধারণের উদ্দেশ্যও একই রকম। কিন্তু এগুলো দ্বারা শেষ পর্যন্ত সরকার ও সরকারী দলগুলোর বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কোন সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। কারণ উপরোক্ত সমস্যাগুলো জনগণকে বিশেষ করে গরিব ও শ্রমজীবী জনগণকে চব্বিশ ঘণ্টা কামড় দিচ্ছে। কাজেই জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে অবশ্যই এগিয়ে আসবে।

কালেরকণ্ঠ : ০৭.০৪.২০১০ ৬.৪.২০১০

www.pathagar.com

পাবনায় ছাত্র লীগ নেতাকর্মীদের চরিত্র যাঁচাইয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষার কর্মসূচি

ফুলের মতো চরিত্রসম্পন্ন ছাত্র ছাড়া অন্য কেউ যাতে ছাত্র লীগের নেতৃত্বে না আসতে পারে তার জন্য ছাত্র লীগের জেলা ও নিম্ন পর্যায়ের কমিটি নির্বাচনের আগে পাবনাবাসী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তার জেলা সদর পাবনা শহরের নির্বাচন পদপ্রার্থী ছাত্র লীগের কর্মীদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পত্রিকার রিপোর্টে দেখা গেল প্রতি মন্ত্রীর এই শুদ্ধি কর্মসূচিকে অভিনন্দন জানিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা উল্লাস প্রকাশ করেছেন (Daily Star, 21.4.10)। বর্তমানে ছাত্র লীগের দুর্বৃত্ত নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নির্যাতনে ও খুন-খারাবিতে অতিষ্ঠ লোকজন ভবিষ্যতে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন, এই চিন্তা থেকে যদি আওয়ামী মন্ত্রীর এ কর্মসূচিকে অভিনন্দন জানিয়ে তারা কেউ কেউ উল্লাস প্রকাশ করেন তাতে তাদের দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু ভালো একটা কিছু হবে এ চিন্তা এবং কোন কাজের দ্বারা সত্যি সত্যি ভালো কিছু হওয়া এক জিনিস নয়। কাজেই আওয়ামী মন্ত্রীর এই শুদ্ধি অভিযান নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কারণ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার।

নির্বাচন পদ প্রার্থীদের মধ্যে কোন মাদকাসক্ত যাতে না থাকে এ কারণেই নাকি মন্ত্রী এই শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছেন। মনে হয় তার ধারণা, একমাত্র মাদকাসক্তরাই অপরাধ করে। এ ধারণার যে কোন ভিত্তি নেই, এটা বলাই বাহুল্য। অপরাধী হলেই যে মাদকাসক্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তার পরও দেখা যাবে যে যারা আসল অপরাধী তাদের মধ্যে কিন্তু নয়। তা ছাড়া অপরাধ যে শুধু ছাত্ররাই করে তা নয়। ছাত্রদের যারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ হাসিল করে তাদের মধ্যেও অপরাধীর অভাব নেই। শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে অপরাধীরাই রাজনীতির এই ব্যবহার করে থাকে। এর জন্য তাদের মাদকাসক্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী মহোদয় এবং অন্য নেতারাও যে এটা জানেন না এমন নয়। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। কাজেই জেনেশুনে খুব উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ছাত্র লীগকে পুতপবিত্র হিসেবে উপস্থিত করার জন্যই যে এই তথাকথিত শুদ্ধি অভিযান শুরু করা হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগকে দোষ দেয়া যায় না কারণ তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্র লীগের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এখন এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস নয় তার বাইরেও এতো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে দেশজুড়ে এক আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করেছে, যাতে তাদের ভাবমর্যাদা পরিবর্তনের

www.pathagar.com

প্রয়োজন আওয়ামী লীগের জন্য জরুরী হয়েছে। কিন্তু এ প্রয়োজন জরুরী হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র লীগের ওপর আওয়ামী লীগের নেতা নেত্রীদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। না থাকারই কথা। কারণ ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরা তাদের মূল রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীর চরিত্রও ভালভাবে জানে, তাদের দুর্নীতিবাজ ও অপরাধী চরিত্র এখন শুধু তারাই নন, দেশের জনগণও ভালভাবেই জানেন। কাজেই যারা নিজেরা দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসীদের গডফাদার অথবা খোদ সন্ত্রাসী, তাদের আদেশ, নির্দেশ হিতোপদেশ শুনে যে তারা নিজেদের পকেট ভর্তির জন্য চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, গাড়িবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, খুন খারাবি ইত্যাদি বাদ দেবে এটা বর্তমান পর্যায়ে সম্ভবই নয়। এমনকি এ চিন্তাও এক অবান্তর ব্যাপার। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ধাপ্পাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীরা যে কত সিদ্ধহস্ত, এটা জনগণ জানেন। তা সত্ত্বেও নিজেদের ভাবমর্যাদা উন্নত করার জন্য তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রতারণামূলক কাজের বাইরে রাখার জন্য তাদের রক্ত পরীক্ষার যে মহড়া মন্ত্রী মহোদয়ের পৌরহিত্যে পাবনায় হচ্ছে এটা তারই এক দৃষ্টান্ত।

একদিকে এ দৃষ্টান্তের সংবাদ যখন আজকের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তখন একই দিনে (২১.৪.২০১০) ছাপা হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লীগ নেতা কর্মীদের দ্বারা শিক্ষকদের বাসে আগুন দিয়ে তাকে ভস্মীভূত করার সংবাদ। চট্টগ্রামে এই ছাত্র লীগ কর্মীরা যে মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে এ কাজ করেছে এটা ভাবা এক মূঢ়তা এবং এ কথা বলার চেষ্টা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। যারা এ ধরনের অপরাধমূলক কাজ করছে তারা মাদক আসক্ত হয়ে নয়, বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই অপরাধের জন্য গরম হয়ে এ কাজ করছে। এই সত্য উপলব্ধি যাদের মধ্যে নেই তারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। এ দেশের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গেও তাদের পরিচয় নেই।

আওয়ামী লীগের নেতা নেত্রীরা এখন তাদের ছাত্র নেতাদের উদ্দেশে প্রায়ই বলেন, তারা কোন খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকুক এটা তারা দেখতে চান না। এই শুভ প্রত্যাশার ঘোষণা দ্বারা যে কোন কাজ হয় না, এটা এখন বাঙলাদেশে কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। তারা জানেন যে এসব কথাবার্তা আওয়ামী নেতা নেত্রীদের মামুলি ও পরিচিত ভাওতাপূর্ণ কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা আরও জানেন যে, সরকারী ক্ষমতার বলে বলিয়ান হয়েই ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীরা পুলিশের ছত্রছায়াতে থেকেই এসব দুর্বৃত্তমূলক কাজ করছে।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী পাবনায় ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের মাদকাসক্তি পরীক্ষার জন্য তাদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু কি ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীরাই দুর্নীতি ও সন্ত্রাস করছে? আওয়ামী লীগের শীর্ষতম পর্যায়ের নেতা নেত্রী থেকে নিয়ে নিম্নতর স্তরের নেতা নেত্রীরা কি ধোয়া তুলসী পাতা? সেটা যে নয় এই সত্য কার না জানা? তাহলে পাবনার ছাত্র লীগ কর্মীদের রক্ত পরীক্ষার পর কি পাবনা জেলার আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের রক্ত পরীক্ষা হবে, না তাদের পুতপবিত্র ধরে নিয়েই রেয়াত দেয়া হবে এই পরীক্ষা থেকে? শুধু পাবনা কেন, তাদের

www.pathagar.com

দলের শীর্ষতম নেতৃত্বকেও কি এর বাইরে রাখা হবে? অপরাধের সঙ্গে মাদকাসক্তির যোগ স্থাপন করে যারা অপরাধীদের দলের বাইরে রাখার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, তাদের সে কর্মসূচি কি সারাদেশে ছাত্র লীগের বিভিন্ন শাখায় চালু করার দরকার নেই? আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, মহিলা লীগ, তরুণ লীগ ইত্যাদির নেতৃত্বও যাতে মাদকাসক্তদের হাতে না যায় তার জন্য কি এসব সংগঠনের মধ্যেও রক্ত পরীক্ষা চালু হবে?

এসব প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। এসব প্রশ্নের মাধ্যমেই এ ধরনের কোন কর্মসূচির আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চরিত্র নির্ধারণ সম্ভব। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন মাদকাসক্ত নয়। তারা হলো ক্ষমতা মদমত্ত। মাদকাসক্ত প্রমাণ করা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যেভাবে সম্ভব ক্ষমতার মদমত্ততা প্রমাণ সেভাবে কোন শারীরিক পরীক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। তার অন্য উপায় আছে এবং জনগণ সে উপায়ে এ পরীক্ষা নিজেদের মতো করে করছেন। তারা জানেন যে, ক্ষমতার মদমত্ততার সঙ্গে মাদকাসক্তির কোন সম্পর্ক নেই। এর সঙ্গে সম্পর্ক চরিত্রের, অভ্যাসের, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস প্রবণতার। কাজেই আওয়ামী লীগ বা শাসক শ্রেণীর অন্য কোন দলের নেতা নেত্রীদের ক্ষমতার মদমত্ততা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস দমন রক্ত পরীক্ষার মতো সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় কোন কর্মসূচির মাধ্যমে সম্ভব নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন আজকের বাঙলাদেশে কোন সংস্কার বা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। এটা একমাত্র সম্ভব বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে। এ কারণে মাদকাসক্তির জন্য রক্ত পরীক্ষা নয়, সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করাই জনগণের সামনে এ মুহূর্তের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

আমার দেশ : ২২.০৪.২০১০ ২১.৪.২০১০

www.pathagar.com

সভা-সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও হামলা বন্ধ করা দরকার

বাঙলাদেশে বাক স্বাধীনতা, লেখালেখির স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এখন যেভাবে নানা কায়দায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা এই অঞ্চলে স্বাধীন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে দেখা যেত না। অন্তত এই মাত্রায় একেবারেই দেখা যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার এমনই সুফল জনগণের ভাগ্যে জুটেছে, যাতে এক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা ভালভাবেই খর্ব হওয়ার শর্ত চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে। এটা যে শুধু এখনই হচ্ছে তা-ই নয়, এর মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলেও এ অবস্থা প্রথম থেকেই দেখা গেছে। বাকশাল প্রতিষ্ঠার পর সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যেভাবে জনগণের নিম্নতম গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে ঠিক সে রকম না হলেও জনগণের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ একটানাভাবেই অব্যাহত আছে। ২০০৭-০৮ সালে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ফখরুদ্দীন সরকার দেশে যেভাবে প্রায় দু'বছর জরুরী অবস্থা জারী রেখেছিল, এটা পুলিশ রাষ্ট্রেই সম্ভব। সেই পুলিশ রাষ্ট্র এখন আর আনুষ্ঠানিকভাবে নেই কিন্তু তার পরম্পরা ঠিকই আছে। কাজেই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ চলছে।

এই হস্তক্ষেপের নানা ধরন। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, তাতে মাইক ব্যবহার, মিছিল ইত্যাদির জন্য পুলিশ অথবা অন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতির বিষয়। ঢাকায় এবং দেশের যে কোন জায়গায় সভার জন্য এবং সভায় মাইক ব্যবহারের জন্য অনুমতির দরকার হয়। মাইক ব্যবহারের জন্য সরাসরি পুলিশের অনুমতি লাগে। অনুমতি না নিলে পুলিশ সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা পণ্ড করে। মিছিলের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। কোন সাংবিধানিক নিয়মের বলে এ কাজ করা হয়, সেটা জানা নেই। কিন্তু যারা এসব কাজ করে তারা নিজেদের সংবিধানের পরোয়াও বিশেষ করে না। তাছাড়া সাধারণভাবেই দেখা যায় যে, সভা-সমিতি, মাইক ব্যবহার, মিছিল ইত্যাদির জন্য অনুমতি কাকে অথবা কাদের দেয়া হবে, এটা নির্ভর করে পুলিশের ওপর। পুলিশ ইচ্ছা করলে অনুমতি দেয়া হয়, ইচ্ছা না হলে অনুমতি দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা দরকার, পুলিশ কোন স্বাধীন বাহিনী নয়। এ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ীই পরিচালিত হয়। কাজেই যে সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে সে সরকার তার বিরোধী পক্ষের ওপর পুলিশের নানা তৎপরতার মাধ্যমেই হামলা করে। এই হামলার একটা রূপ হলো সভা-সমিতি, মাইক ব্যবহার, মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী।

www.pathagar.com

এখানে কথা হলো, সভা-সমিতি করা, তাতে মাইক ব্যবহার করা, মিছিল করা ইত্যাদির জন্য পুলিশের অনুমতি প্রয়োজন কেন হবে? বাঙলাদেশের স্বাধীনতার আগে যেখানে এ ধরনের অনুমতির প্রয়োজন হতো না, সেখানে স্বাধীনতার পর কেন জনগণকে সভা-সমিতি ইত্যাদির জন্য পুলিশের অনুমতি নিতে হবে? তাহলে স্বাধীনতার অর্থ জনগণের জন্য কী দাঁড়াল?

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখার জন্য এসব নিষেধাজ্ঞা ও নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা অবশ্যই দরকার, এই আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করা দরকার জনগণের স্বাধীনতার ওপর এ হামলা বন্ধ করতে।

এক্ষেত্রে সরকার এখন নোতুন এক কৌশল অবলম্বন করেছে। এ কৌশল অনুযায়ী যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করে তাদের দ্বারা নিবন্ধিত হয়নি তাদের সভা-সমিতি করতে না দেয়া। এ কৌশল সম্পূর্ণভাবে গণবিরোধী, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারবিরোধী তো বটেই, এমনকি এটা বাঙলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানেরও বিরোধী। সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদি করার অধিকার জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। বিদ্যমান সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত অধিকার। নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন লাভ যদি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলেও যে কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতি ইত্যাদির জন্য কোন দলের নিবন্ধিত হওয়ার কোনই যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজন নেই। কাজেই নিবন্ধন নেই, একথা বলে কোন রাজনৈতিক দল বা গণসংগঠনকে সভা-সমিতি-মিছিল করা থেকে বিরত রাখার অধিকার সরকার ও তাদের পুলিশ এবং সেনাবাহিনীসহ অন্য কোন বাহিনীরই নেই। এ এখতিয়ার কোন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরও নেই। কিন্তু এই আইনগত এখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও দেশের নানা জায়গায় রাজনৈতিক দলের ওপর এসব হামলা প্রশাসন, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে জেলা প্রশাসক ইউপিডিএফের সভা-সমিতি এই যুক্তিতে নিষিদ্ধ করেছেন যে, নির্বাচন কমিশনের দ্বারা তারা নিবন্ধিত নয়।

এভাবে নিবন্ধিত না হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের সভা-সমিতি করে আসছে। কারণ এর কোন আইনগত ভিত্তিই নেই। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটিতে ইউপিডিএফ ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী সাজেকে ও ২৩ তারিখ খাগড়াছড়িতে পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ এবং তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত নিবন্ধন না থাকা সত্ত্বেও সভা-সমিতি-মিছিল করে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর যেসব চক্রান্তমূলক হামলা সম্প্রতি হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ইউপিডিএফ খাগড়াছড়িতে সভা করতে চাইলে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক ফরমান জারী করেছেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশন যে সমাবেশ করতে চেয়েছিল সেটাও জেলা প্রশাসক একই যুক্তি দেখিয়ে বন্ধ করেছেন। জেলা প্রশাসকের এই কাজ যে সম্পূর্ণভাবে তার এখতিয়ার বহির্ভূত ও বেআইনি এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেআইনি হলেও প্রশাসন এবং সব রকম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখন আইনের বাইরে দাঁড়িয়েই নানা তৎপরতায় লিপ্ত আছে। এসব তৎপরতা যে সরকারের

www.pathagar.com

ইঙ্গিত এবং অনুমতি ছাড়া হচ্ছে, এটা মনে করা অবাস্তব চিন্তা ছাড়া আর কী?

এতো গেল সরাসরি সরকারী প্রশাসন ও পুলিশসহ বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর মাধ্যমে জনগণের সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদি বন্ধ করা ও বন্ধ না করলে তার ওপর হামলার দৃষ্টান্ত। এছাড়া অন্য যেভাবে এখন এ কাজ হচ্ছে সেটা ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এটা ঘটছে ছাত্র লীগ, যুবলীগ ইত্যাদি সরকারী ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর দ্বারা। তারা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, তার বাইরে সর্বত্র বিরোধীদলীয় জনসভা, মিছিল ও যে কোন ধরনের প্রচার কাজের ওপর হামলা করছে। এক কথায় বলা চলে, এসব বেসরকারী ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী জনগণের বিভিন্ন অংশের ওপর, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হামলা করছে। এসব হামলা করা হচ্ছে সরকারের নাকের ডগাতেই।

এভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হামলার ফলে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তা-ই নয়, চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটছে। বাঙলাদেশের সমগ্র শাসন কাঠামোরই এখন ভাঙনের অবস্থা। প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাবসহ সশস্ত্র বাহিনী (বিডিআরের ঘটনাবলি এর একটি দৃষ্টান্ত), রাজনৈতিক দল, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত গণসংগঠন– সবকিছুর মধ্যেই এখন ভাঙন ও বিশৃঙ্খলা খোলাখুলিই দেখা যাচ্ছে। বিচার বিভাগের অবস্থাও এদিক দিয়ে শোচনীয়। উচ্চতম আদালতে পর্যন্ত যেসব ঘটনা এখন ঘটছে তা আগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

এ পরিস্থিতিতে জনগণের পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর মত প্রকাশের, সভা-সমিতির প্রয়োজন খুব বেশী। একদিকে বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙন এবং অন্যদিকে জনগণের সভা-সমিতি-মিছিল ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলা পরিস্থিতিকে দ্রুত বড় রকম সংকটের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পরিস্থিতির এদিক বিবেচনা করেও অবিলম্বে সভা-সমিতি ইত্যাদির ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা জারীর ব্যবস্থা, জনগণের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা আছে তার সবকিছু যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে দেশ যে ভয়াবহ সংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তার সম্পূর্ণ দায় সাধারণভাবে শাসক শ্রেণী ও বিশেষভাবে বিদ্যমান সরকারকেই বহন করতে হবে। এর খেসারতও দিতে হবে তাদেরকে।

সমকাল : ১৩.০৪.২০১০ ১২.৪.২০১০

www.pathagar.com

দুর্নীতির কবলে উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা

প্রত্যেক এলাকায় উপজেলা চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদ সদস্যরা একই ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে একই ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হলেও তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা। উপজেলা চেয়ারম্যান যে উপজেলা প্রশাসনের প্রধান, এটা তার নামের আখ্যা থেকেই বোঝা যায়। বর্তমান শাসক শ্রেণীর শাসন কাঠামোর মধ্যে প্রশাসন কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনে স্থানীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিএনও সরাসরি সরকারের প্রশাসনের লোক হিসেবে যাতে উপজেলা পর্যায়ে কাজ করতে পারেন, তার জন্যও কিছু দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা আছে। উপজেলা চেয়ারম্যান ও টিএনও নিজ নিজ দায়িত্বের জায়গা থেকে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে উপজেলার যাবতীয় সমস্যা মোকাবিলা ও প্রশাসন পরিচালনা করার কথা। এজন্য স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা, উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যাভাব ইত্যাদি বিপর্যয়ের সময় উপজেলার জন্য নিয়মিত ও বিশেষ অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা আছে।

দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সরকার এ ব্যবস্থাকে অকেজো করার উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা প্রথম থেকেই করে এলেও এখন তারা এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর আগে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ঘোষণা করে, জাতীয় সংসদ সদস্যদের তাদের নিজেদের নির্বাচনী এরাকায় প্রশাসন, উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু দায়িত্ব দেয়া হবে। এজন্য উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হবে। স্বাভাবিকভাবেই উপজেলা চেয়ারম্যানরা সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আসছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য উভয়েই অধিকাংশ এলাকায় সরকারী দল আওয়ামী লীগের লোক। তা হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং এর ফলে উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। উপজেলা চেয়ারম্যানরা মিলিতভাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রীর কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং উপজেলায় তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা খর্ব না করার দাবি জানান।

সরকারের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের পক্ষপাতিত্ব সংসদ সদস্যদের প্রতি। সেটাই হওয়ার কথা, কারণ তাদেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা খর্ব করে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাদের দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

কয়েকদিন আগে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আওয়ামী সরকারের প্রধান মন্ত্রীর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন এলাকার উপজেলা

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। সংসদ সদস্যরা উপজেলা প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা লাভের পর কী ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে প্রধান মন্ত্রীকে অবহিত করেন। এর জবাবে প্রধান মন্ত্রী তাদের উপজেলা প্রশাসনে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কোন আশ্বাস দান থেকে বিরত থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি উপজেলা চেয়ারম্যানদের সমালোচনা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা গুন্ডাপাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা বন্ধ করুন। প্রধান মন্ত্রীর এ পরামর্শ উপজেলা চেয়ারম্যানদের খুশি করেনি এবং তারা বিক্ষুব্ধ হয়েই নিজ নিজ এলাকায় ফেরত গেছেন। এটা ঠিক যে, আওয়ামী লীগের এ উপজেলা চেয়ারম্যানরা অনেকেই গুণ্ডাপাণ্ডা পুষে থাকেন ও তাদের ব্যবহার করেন, যেমন সেটা করেন অন্য দলের উপজেলা চেয়ারম্যানদের অনেকে।

প্রধান মন্ত্রী উপজেলা চেয়ারম্যানদের গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে চলাফেরা বন্ধ করার পরামর্শ দিয়ে এটা স্বীকার করলেন যে, তাদের উপজেলা পর্যায়ের নেতা নেত্রীরা মাফিয়াগিরি করেন। গুণ্ডাপাণ্ডা পুষে তারা জনগণের খেদমতের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করেন। সবাই জানেন, উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সবাই দুর্নীতিবাজ ও জনগণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার একটা বড় অংশ তারা আত্মসাৎ করেন।

এটা শুধু উপজেলা চেয়ারম্যানদেরই বিশেষত্ব নয়, এ কাজ তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্র লীগ, যুবলীগসহ অন্য সম্পর্কিত লোকজনরা বেপরোয়াভাবে করছে। তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা খোদ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধান মন্ত্রীর পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। সম্ভব না হওয়ার একটা বড় কারণ ছাত্র লীগসহ তাদের যেসব সংগঠনের লোকজন দুর্নীতি ও সন্ত্রাস করছে, তাদেরকে মূল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রয়োজন আছে। তারা ছাড়া আওয়ামী লীগ সংগঠন খাড়া রাখা এবং নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাদের উপর নির্ভর না করে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন ও তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। একথা উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গ্রামাঞ্চলে নির্বাচন জয় ও মাঠ পর্যায়ে সংগঠন রক্ষা করার জন্য এদের সাহায্যও প্রয়োজন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এ ব্যাপারে সরকার ছাত্র লীগ, যুব লীগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে নমনীয়তা দেখিয়ে আসছে, সেটা উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে না। উপরন্তু উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান বেশ কঠোর। উপজেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের উপজেলা চেয়ারম্যানের থেকে অধিক ক্ষমতা দেয়ার পক্ষপাতী তারা। এ থেকে বোঝা যায়, ক্ষমতায় থাকার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে উপজেলা চেয়ারম্যান থেকে সংসদ সদস্যদেরই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে এবং এজন্য উপজেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা খর্ব করতে তারা বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যে সরকার এখন এক নোতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তারা উপজেলা চেয়ারম্যানের পরিবর্তে টিএনওদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের হাতে উপজেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করে নির্দেশ জারী করেছেন। এ কাজ যে প্রধান মন্ত্রী এবং তার দল আওয়ামী লীগের প্রতি উপজেলা

www.pathagar.com

চেয়ারম্যানদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে না, এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এর ফলে সংসদ সদস্যদের সুবিধা হবে। তারা টিএনওদের মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসনে কর্তৃত্ব করতে পারবেন। এই কর্তৃত্বের সব থেকে বড় দিক হলো উপজেলার সাধারণ প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারী কর্মচারী টিএনওদের সহায়তায় বড় আকারে আত্মসাৎ করা। এক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে তারা উপজেলা প্রশাসনে কর্তৃত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য সহজেই হাসিল করতে পারবেন। উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে দুর্নীতি ও লুটপাটের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধার এই ফন্দি তারা বের করেছেন।

এর থেকে বোঝা যায়, কিভাবে আওয়ামী লীগ ও তাদের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার এখন ব্যাপকভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সব রকম সরকারী ও প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনের 'মহৎ' উদ্দেশ্যে কাজ করছেন। এর থেকেই বোঝা যায়, কেন তাদের অঙ্গসংগঠন, ছাত্র লীগ, যুব লীগ ইত্যাদি এতো বেপরোয়াভাবে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস করছে। এর থেকে বোঝা যায়, প্রধান মন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছাত্র লীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করলেও সরকারেরই ছত্রছায়ায় তারা ব্যাপক ও বেপরোয়াভাবে সন্ত্রাস করছে।

সরকারী প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার যেসব কর্মকাণ্ড করছে তা থেকে বোঝা যায় কিভাবে আজ শুধু আওয়ামী লীগের মধ্যেই নয়, শাসক শ্রেণীর সর্বস্তরে ভাঙন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই ভাঙন সৃষ্টির মূল কারণ যে শ্রেণীগতভাবে এ দেশের লুম্পেন বুর্জোয়া শাসকদের অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতির মধ্যেই প্রোথিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যুগান্তর : ২৫.০৪.২০১০ ২৩.৪.২০১০

www.pathagar.com

বাঙলাদেশে দুর্নীতিই সার্বভৌম

দুর্নীতি দমন কমিশনকে দমন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই দমন কর্ম করছে ২০০৮ সালের সাধাণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ। এর মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হলো যে, বাঙলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসাসহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি সার্বভৌম। দুর্নীতির সার্বভৌমত্ব তার পদচিহ্ন সর্বত্র রাখছে। এ মুহূর্তে তার দ্বারা পদদলিত হতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

২৬ এপ্রিল মন্ত্রী সভার বৈঠকের পর প্রধান মন্ত্রীর প্রেস সচিব সাংবাদিকদের বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর সংশোধনী নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রী সভা। এতে কিছু বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়েছে। এর মধ্যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ আনলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পাঁচ বছরের জেল ও আর্থিক জরিমানার বিধান রয়েছে। (যুগান্তর, ২৭.৪.২০১০)। উপরোক্ত সংশোধনীর অন্যদিক বাদ দিয়ে এখানে যা বলা হয়েছে তা যে কোন তদন্ত ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক, এ নিয়ে কোন সৎ ও যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বিমত থাকার কথা নয়। শুধু তাই নয়, এটা বাস্তবত তদন্ত ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করে রাখারই এক স্বচ্ছ কৌশল। দুদকের মামলার বিষয়ে যা বলা হয়েছে সেটা যদি সাধারণ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার ব্যবস্থা হয় তাহলে নিম্ন থেকে উচ্চতম আদালত পর্যন্ত যে কোন মামলা দায়ের করে পরাজিত হওয়ার পর পরাজিত ব্যক্তির জেল-জরিমানা হওয়ার কথা। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এর থেকে অদ্ভূত ও হাস্যকর ব্যাপার আর কী হতে পারে? শুধু তাই নয়, এ এক মহা বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ এর অর্থ হবে কার্যত দেশের বিচার ব্যবস্থার উচ্ছেদ।

আদালতে শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়, যে কোন বিষয়ে একজন নাগরিক অন্য একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করতে পারেন। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি আইন অনুযায়ী হয়। কিন্তু মামলায় হেরে গেলে একজনের শাস্তির বিধান আইনের কোন্ খাতায় লেখা আছে? কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মিথ্যা বলে তার জন্য আইনে (Penal Code) ব্যবস্থা আছে। কাজেই এ নিয়ে দুদকের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে মামলায় মিথ্যা অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষভাবে শাস্তি বিধানের যে কথা বলা হয়েছে বাস্তবত তা হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুদকে মামলা দায়েরকারীর বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। কারণ দুদক নিজে কোন বিচার করে না। তদন্তে ও প্রসিকিউটরের কাজ করে। দুর্নীতি বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে মামলায় জয়-পরাজয় অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। কাজেই পরাজিত পক্ষকে শাস্তি দেয়ার কোন প্রশ্ন নেই।

www.pathagar.com

শাস্তির প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অভিযোগকারী একেবারে ইচ্ছাকৃতভাবে মানহানি ও হয়রানির উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা অভিযোগ একজনের বিরুদ্ধে এনে মামলা দায়ের করেছে। আগেই বলা হয়েছে এর জন্য Penal Code-এ সুনির্দিষ্ট বিধান আছে, যার অধীনে শাস্তি হতে পারে। তবে এই শাস্তি ঢালাওভাবে পাঁচ বছর জেল বা সেই সঙ্গে জরিমানা নয়। কী শাস্তি হবে সেটা মিথ্যার অভিযোগ ওজন করে আদালতেরই নির্ধারণ করার কথা। তার জন্য মন্ত্রী পরিষদের হুকুম জারীর কোন প্রয়োজন নেই।

এসব অতি সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার। কিন্তু যে কারণে মন্ত্রী পরিষদ এই সংশোধনী প্রস্তাব করেছে ও কার্যকর করতে যাচ্ছে তার একটিই উদ্দেশ্য– যারা দুর্নীতিবাজ তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের নাগরিকদের অভিযোগ উত্থাপন করা থেকে বিরত রাখা। দুর্নীতির অভিযোগ অনেক কারণেই মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। এমনকি এটা হতে পারে খোদ আদালতের দুর্নীতি ও ভ্রান্ত বিচারের কারণেও। এটা হতে পারে সরকারী কর্তাব্যক্তিদের হুমকির কারণে। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতির অভিযোগ এনে একজনের পক্ষে সেটা প্রমাণ করার অসুবিধা অনেক। তাছাড়া যেভাবে শীর্ষতম থেকে নিম্ন পর্যায়ের সরকারী লোকদের মামলার পর মামলা আদালত বিচার না করে সরকারী চাপ ও নির্দেশের মুখে খারিজ করে চলেছে, তার থেকে ভালভাবেই বোঝা যায় যে সরকারী লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা একটা মহা দুরূহ, এমনকি অসম্ভব ব্যাপার।

দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে দুদক যে প্রকৃতপক্ষে ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকাই পালন করবে এর আর এক ব্যবস্থা হচ্ছে দুদকে মামলা করার জন্য সরকারী অনুমতির প্রয়োজনীয়তা। দুদকে দায়েরকৃত মামলার অধিকাংশ বা একটা বড় অংশ হলো সরকারী ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় দুদক কর্তৃক যে কোন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে যদি সরকারের অনুমতি নিতে হয় তাহলে সরকারী লোকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা হবে কীভাবে? এটা কি ভাবা যায় যে, সরকার তার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে দুদককে মামলা করার অনুমতি দেবে? বিশেষ করে শক্তিধর সরকারী নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে বর্তমান পরিস্থিতিতে দুদকের মামলা দায়ের করা কি সম্ভব, যেখানে সরকারী লোকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার বিচার না হয়ে আদালত কর্তৃক সেসব খারিজ হয়ে যাচ্ছে?

বাঙলাদেশে সমাজের একটা বড় অংশ এখন অপরাধীকরণকৃত (Criminalised) হয়েছে। এই অপরাধীকরণকৃত অংশের মধ্যে শাসক শ্রেণীর উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত লোকজনেরই প্রাধান্য। তাদের এই প্রাধান্যের প্রভাব চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচের দিকে নেমে এসে নিম্নতর বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত লোকদের চরিত্র দুর্নীতির রসে সিক্ত করছে। এই দুর্নীতির কারণে সমাজে কীভাবে আজ চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস ও খুনখারাবি ছড়িয়ে পড়ে এক বিভীষিকার রাজত্ব এখানে কায়েম হয়েছে তার চিত্র প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যায়। একটি দেশে যখন এই অবস্থা বিরাজ করে তখন তার নিয়ন্ত্রণে বিচার ব্যবস্থার একটা ভূমিকা থাকার কথা। কিন্তু বাঙলাদেশের বিচার ব্যবস্থাও আজ হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছে উপরে বর্ণিত সাধারণ অবস্থার অধীন। বিগত ২৪ এপ্রিল একটি সেমিনারে সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী যেভাবে বিচার বিভাগকে কাঁচের ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তার থেকে বিচার ব্যবস্থার ভঙ্গুর চরিত্র সহজেই বোঝা যায়।

বিচার ব্যবস্থায় এখন যেভাবে সরকার হস্তক্ষেপ করছে এদিকে থেকেই সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী তার উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন। এদেশে নির্বাহী এবং আইন বিভাগের প্রতি জনগণ অনেক আগেই আস্থা হারিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগকেই তারা দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও সব রকম অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের এক ভরসাস্থল মনে করে এসেছেন, যদিও এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও তাদের অজানা নয়। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে বিচার বিভাগ কাঁচের ঘরে পরিণত হয়েছে এবং সরকারী হস্তক্ষেপের কারণে এটা হয়েছে তার থেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতি একটা দেশের জন্য আর কী হতে পারে?

আসলে পরিস্থিতি এ ক্ষেত্রে কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তারই এক দৃষ্টান্ত হলো, ২৬ এপ্রিল মন্ত্রী সভার বৈঠকে দুদক সম্পর্কিত সংশোধনী। দুদকে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করে কেউ মামলা করে পরাজিত হলে তার পাঁচ বছর জেল ও সেই সঙ্গে জরিমানা হবে এবং সরকারী লোকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়েরের জন্য সরকারের অনুমতি লাগবে এ দুই বিধান যে ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলারই ব্যবস্থা, এতে আর সন্দেহ কী? বাঙলাদেশে এখন দুর্নীতিই যে সার্বভৌম এর থেকে তার বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

আমার দেশ : ২৯.০৪.২০১০ ২৮.৪.২০১০

www.pathagar.com

সরকারের ছত্রছায়ায় ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীরা

২০০৮-এর ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের পর থেকে ছাত্র লীগের সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত তা পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের এ সন্ত্রাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছাত্র লীগের এ সন্ত্রাসের মূলে আছে দুর্নীতি। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস হাত ধরাধরি করে বাঙলাদেশে ১৯৭২-৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী আমল থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত চলছে। সন্ত্রাস কোন স্বাধীন ব্যাপার নয়। এর পেছনে সব সময়ই অন্য কারণ থাকে যা হলো মূল ব্যাপার। রাজনীতিতে এক ধরনের সন্ত্রাস আছে কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পদ্ধতি বা কৌশলগতভাবে সন্ত্রাস কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যই সিদ্ধ করতে পারে না। তাই এক পর্যায়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পরাজয় ঘটে এবং সমাজ ও রাজনীতিতে তার কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ও ভূমিকা পরে আর থাকে না। কিন্তু সন্ত্রাস অন্য অনেক কারণেই ঘটে। অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সন্ত্রাস হয় তার চরিত্রই সব থেকে মারাত্মক এবং তাকে নিয়ন্ত্রনে আনা সব থেকে দুঃসাধ্য। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। এই অর্থনৈতিক স্বার্থের মধ্যে দুর্নীতিই সব থেকে নিকৃষ্ট। বাঙলাদেশে এখন দুর্নীতির সার্বভৌমত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর দ্বারাই সব শাসন কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

ছাত্র লীগ কর্মীরা এখন ঢাকাসহ দেশের প্রত্যেক শহরে, এমনকি ছোটখাট শহরে পর্যন্ত যেভাবে সন্ত্রাস করছে– সেটা হঠাৎ করে ঘটতে থাকা ব্যাপার নয়। এর তালিম তারা দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে এসেছে তাদের মূল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছ থেকে। ১৯৭২ সাল থেকেই তৎকালীন শাসক দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও আত্মীয়-স্বজনরা যেভাবে লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে শুরু করে, এটা এক পরিচিত ব্যাপার। এর ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে 'স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি' নামে নিজেদের ঢেঁড়ি পেটানোওয়ালা আওয়ামী লীগ পরিণত হয় এক দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে। তাদের এই দুর্বৃত্ত চরিত্রর প্রথম থেকেই খুব স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও এখন তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে যে আকার ধারণ করেছে, তার প্রতিফলনই ঘটছে তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে।

ছাত্র লীগের সন্ত্রাস আওয়ামী লীগ সরকারের প্রাথমিক জনপ্রিয়তাকে যেভাবে দ্রুত খর্ব করতে শুরু করে, তাতে আতঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগ তাদের এই অঙ্গসংগঠনের

www.pathagar.com

সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের এক ঘোষণা দেয়। এর দ্বারা তারা বোঝাতে চায় যে, ছাত্র লীগের সন্ত্রাসের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। তারা পূতপবিত্র, ধোয়া তুলসীপাতা। কিন্তু জনগণের রাজনৈতিক চেতনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটুকু তারা বোঝেন যে, আওয়ামী লীগ কর্তৃক ছাত্র লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি লোক দেখানো এবং নিজেদের গা বাঁচানোর এক চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে নিজেদের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র লীগকে খারিজ করে আওয়ামী লীগ যে ঘোষণাই দিক, জনগণ জানে যে এ ঘোষণা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের মধ্যে সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে আগের মতোই আছে। এটা ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরাও ভালভাবেই জানে এবং এই জ্ঞানের কারণেই তারা সরকারের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অব্যাহতভাবে তাদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে।

দুর্নীতি ছাত্র লীগের অস্তিত্বের মধ্যে এমনভবে ছড়িয়ে গেছে যাতে দুর্নীতির বখরা নিয়ে তাদের সংগঠনের মধ্যেই রেষারেষি, প্রতিযোগিতা, কামড়াকামড়ি ও সশস্ত্র সন্ত্রাস এখন পরিণত হয়েছে তাদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডে। এ কারণে এমন দিন নেই যখন সংবাদপত্রের পাতায় ছাত্র লীগের সাধারণ সন্ত্রাসের ঘটনাই শুধু নয়, তাদের নিজেদের মধ্যে দুর্নীতিসৃষ্ট দ্বন্দ্ব-কলহের পরিণামে তাদের পারস্পরিক খুনাখুনির খবর না থাকে। ছাত্র লীগ কর্মীরা ছাত্র লীগের কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুঁপিয়ে খুন-জখম করছে, এর সচিত্র রিপোর্ট সংবাদপত্রের পাতায় এখন নিয়মিত ব্যাপার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আশির দশকে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বেপরোয়া কাজকর্ম করত, তার থেকে অনেক বেশী বেপরোয়া এখন ছাত্র লীগ! যদিও ছাত্রশিবির এখনও পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ঐতিহ্যিক সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাস থেকে ছাত্র লীগের সন্ত্রাস অধিকতর মারাত্মক ও বিপজ্জনক এ কারণে যে, এই সন্ত্রাস সরাসরি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দুর্নীতি বলতে শুধু আর্থিক দুর্নীতিই বোঝায় না, এর পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত। এর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ৪ মে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত এক ঘটনায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র লীগ নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই এক পুলিশ চেকপোস্টের পাশ দিয়ে মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় পুলিশ তার গতিরোধ করে কাগজপত্র দেখতে চায়। এসময় সেই ছাত্র লীগ নেতা নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশের এএসআইকে বলে, 'তুই জানস না ছাত্র লীগ নেতাদের গাড়ি চালাতে কাগজপত্র লাগে না।' পুলিশ তা সত্ত্বেও তাকে না ছাড়ায় সে ফোন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খবর দিলে শতাধিক ছাত্র লীগ কর্মী ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পুলিশ অফিসারটিকে মারধর করতে করতে ক্যাম্পাসের গেটের কাছে নিয়ে যায়। (কালের কণ্ঠ, ৫.৫.২০১০)

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ছাত্র লীগ নেতাকর্মীরা এখন কতখানি বেপরোয়া। ছাত্র লীগের উপরোক্ত নেতা যখন বলে যে ছাত্র লীগ নেতাদের গাড়ি চালানোর জন্য কাগজপত্রের কোন প্রয়োজন হয় না, তখন সে কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করে, কিসের

www.pathagar.com

ছত্রছায়ায় একথা বলতে পারে? এই শক্তি যে খোদ আওয়ামী লীগ সরকার এবং ছত্রছায়া যে আওয়ামী লীগের এ নিয়ে কোন বুদ্ধিমানের কি সংশয় থাকতে পারে? কাজেই আওয়ামী লীগ যখন বেকায়দায় পড়ে ঘোষণা দেয় যে, ছাত্র লীগের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক নেই, তখন এ ঘোষণা এক বিরাট প্রতারণা এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক নিজেদের গা বাঁচানোর চেষ্টা ছাড়া আর কি?

আসল কথা হলো, ছাত্র লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আর কোন সম্পর্ক নেই– এটা আওয়ামী লীগের শীর্ষ থেকে নিয়ে মাঝামাঝি ও চুনোপুটি নেতারা যতই বলুন, ছাত্র লীগকে নিজেদের সাংগঠনিক কারণে তাদের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের কথা ছাত্র লীগ নেতারাও জানে। তারা এটাও জানে যে, যতই তারা দুর্নীতি ও সন্ত্রাস করুক, তাদের ওপর কোন ঢালাও সরকারী আক্রমণ তো সম্ভব নয়ই, এমনকি কোন বিশেষ ঘটনার জন্য তাদের কোন নেতার ওপর আইনের প্রয়োগ সম্ভব নয়। তারা আইনের আওতার বাইরে। এই চেতনা থেকেই তাদের পক্ষে পুলিশকে বলা সম্ভব যে, 'তুই জানস না ছাত্র লীগ নেতাদের গাড়ি চালাতে কাগজপত্র লাগে না।'

ছাত্র লীগের এই সন্ত্রাসের মুখে আওয়ামী লীগ সমর্থক লোকজন ও তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের কথা হলো– এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ যেসব ভালো কাজ করে এসেছে তার ওপর ছাত্র লীগের এই সন্ত্রাস নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এর দ্বারা তারা বলতে চান যে, ছাত্র লীগের দুর্নীতিপূর্ণ এই সন্ত্রাসী অপকর্মের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক নেই। এর থেকে বড় মিথ্যা আর কি হতে পারে? বাহ্যত, আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ সম্পর্কে যাই বলুক, আওয়ামী লীগ দল ও তাদের সরকারই ছাত্র লীগের সন্ত্রাসের পেছনে শক্তির জোগান দিচ্ছে। এই শক্তির বলে বলীয়ান হয়েই ছাত্র লীগের গুণ্ডাপাণ্ডা সন্ত্রাসীরা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নয়, সারাদেশ জুড়ে এখন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের নিজের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী চরিত্রের প্রতিফলনই ঘটছে ছাত্র লীগের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে। সেটা যদি না হতো তাহলে সরকারের পক্ষে ছাত্র লীগের সন্ত্রাস দমন করা অসাধ্য তো নয়ই, এমনকি কোন কঠিন ব্যাপারই হতো না।

আমার দেশ ০৬.০৫.২০১০ ৫.৫.২০১০

www.pathagar.com

নামকরণ পরিবর্তনের মহোৎসব দুর্নীতিরই দৃষ্টান্ত

বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণ নিজের পিতার নাম অনুযায়ী করার এক উদগ্র তাগিদ বাঙলাদেশের বর্তমান প্রধান মন্ত্রীকে প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে রেখেছে। তিনি শুধু নোতুন নোতুন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম নিজের পিতার নামে রেখেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। অনেক বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে নিজের পিতার নাম সেখানে বসিয়ে দিচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি নিজের মাতা এবং ভাইদের নামেও এ ধরনের নামকরণ করছেন। এ কাজের মধ্যে রুচির দোষ যাই থাকুক অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে এটা এক ধরনের দুর্নীতিও বটে। কারণ শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম এভাবে রাখার মধ্যে পারিবারিক গৌরব কীর্তন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নেই। এই উদ্দেশ্য যে কোন গৌরবজক ব্যাপার নয়, এটা বলাই বাহুল্য। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, তিনি শুধু নিজের পিতার নামে এভাবে নামকরণ করেই থেমে থাকছেন না, তার প্রতিহিংসাপরায়ণতা এমন যে তিনি যাদেরকে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন তাদের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করে সেখানে তার পিতার নামে মোটেই রাখা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে অন্য কারোর নামে তার নোতুন নামকরণ করছেন। যেভাবে নাম পরিবর্তনের কাজ করা হচ্ছে, তার থেকে মনে হতে পারে যে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে এ কাজ করার জন্য ম্যান্ডেট দিয়েছে। বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা ক্ষমতায় থেকে এই একই কাজ করলেও নাম পরিবর্তনের এই কুৎসতি ব্যাপার এখন সব মাত্রা অতিক্রম করে কুরুচি ও অসভ্যতার এমন পরিচয় রাখছে যা একটি দেশ ও জাতির জন্য কলঙ্কজনক।

ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম প্রথম থেকেই ছিল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে এখন রাখা হয়েছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। একজন বড় মাপের পীর সাহেবের নামে এই নামকরণের কারণ এই ধারণা যে, পরে কেউ এই নাম পরিবর্তন করতে গেলে দেশের ধর্মপ্রাণ লোকদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগবে– এই ভয়ে কেউ আর সে চেষ্টা করবে না। এখানে প্রতিহিংসার হীন প্রবৃত্তি ছাড়াও ধর্মকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যেও প্রশংসার কিছু নেই। এখানে বলা দরকার যে, মাওলানা ভাসানীর নামও এভাবে মুছে ফেলা হচ্ছে। ঢাকার নভোথিয়েটারের নাম ভাসানী নভোথিয়েটারের পরিবর্তে রাখা হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর পিতার নামে।

www.pathagar.com

বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করতে গিয়ে যে বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট অর্থ ব্যয় হয়েছে এটা বাঙলাদেশের মতো একটি দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ ছাড়া আর কী? শুধু নিজের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য দেশের মেহনতি জনগণের ঘাড়ে এই ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়ার কী এখতিয়ার আওয়ামী লীগের প্রধান মন্ত্রীর আছে? তিনি নিজের পিতার নামে আরও বিশাল এক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার জন্য বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটির নাম পরিবর্তনের কী প্রয়োজন ছিল? প্রতিহিংসাপরায়ণতা ছাড়া এর আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে? আমরা জিয়াউর রহমানের পক্ষপাতী নই, তার নামে কোন কিছু যায় আসে না। কিন্তু বিদ্যমান নাম পরিবর্তন করে দেশকে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করার আমরা ঘোর বিরোধী।

বাঙলাদেশে এখন দুর্নীতির প্রবল রাজত্ব। এই দুর্নীতি যে কত বিচিত্র পথগামী তার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেই নামকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হলো। দূর্নীতি বলতে সাধারণত অর্থনৈতিক দুর্নীতি অর্থাৎ চুরি, ঘুষ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদির কথা মনে হয়। কিন্তু দুর্নীতি আসলে হলো এক ধরনের অভ্যাসগত সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি মানুষের চেতনা থেকে নিয়ে কাজকর্মের পুরো জগতকেই আচ্ছন্ন করে রাখে। কাজেই এর প্রতিফলন ঘটে সর্বত্র। মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি এই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বাঙলাদেশে শাসক শ্রেণীর একের পর এক সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হলেও দুর্নীতির চর্চা তাদের মধ্যে প্রবল। এই দুর্নীতির সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এ বিষয়টি পূর্ব-নির্ধারিত। কারণ প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি তৈরী করার সময় তারা জানে যে, এসব প্রতিশ্রুতি তারা পূরণের জন্য দেয় না। এগুলো দেয়া হয় ভোটারদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যেই।

বাঙলাদেশের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে ভোটারদের সামনে সাজানো-গোছানো এমনসব রঙিন প্রতিশ্রুতি হাজির করেছিল যার তুল্য আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি অন্য কেউ, এমনকি তারা নিজেরাও এর আগে দেয়নি। একদিকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ও মঈনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকারের সাত বছরের শোষণ-নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে এবং অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ সালের কীর্তিকলাপের কথা মনে না রেখে তাদের রঙিন প্রতিশ্রুতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ভোটাররা আওয়ামী লীগকে বিগত নির্বাচনে বড় আকারে জিতিয়ে দিয়েছে। অন্যভাবে দেখলে বলা চলে যে, তাদের অন্যকিছু করারও থাকেনি। কারণ বিএনপিকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ছাড়া তাদের সামনে কোন বিকল্প ছিল না। বস্তুতপক্ষে বাঙলাদেশের ভোটাররা যে নির্বাচনী কাঠামোর মধ্যে এখন বন্দি এবং যে শর্তে ওই নির্বাচন হয় তাতে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে একটিকে বাদ দিলে অন্যটি ছাড়া কোন বিকল্প তাদের সামনে থাকে না। কাজেই প্রকৃতপক্ষে বিকল্পের অভাবেই ভোটাররা বিগত নির্বাচনে বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। নির্বাচনে জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে বসে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদের ঐতিহ্য রক্ষা করছে।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষকে কথাবার্তার প্রয়োজনীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে সরকারদলীয় স্পিকার তার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারী ও বিরোধী দল দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার পরিবর্তে দলীয় মতলববাজি এবং খিস্তিখেউর নিয়ে সংসদে বাক্যবিস্তার করে চলার ফলে কোন গণতান্ত্রিক দায়িত্বই তাদের দ্বারা পালিত হয় না। এসবই হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুর্নীতির এক ধরন। এই দুর্নীতি তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে ক্ষমতায় বসে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে, এমন কথা বলা যাবে না। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ছিটেফোঁটা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। তারপরও তারা এমন সব কাজ করে যাচ্ছে যার সঙ্গে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোন সম্পর্ক নেই। দেশের জনগণের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক তার পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নামকরণ এবং প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এসব থেকে অন্যদের নাম মুছে ফেলার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন সেটা তাদের নানা ধরনের দুর্নীতিরই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আমার দেশ : ১৩.০৫.২০১০ ১২.০৫.২০১০

www.pathagar.com

সরকারী গোয়েন্দারা ছাত্র লীগের নোতুন নেতা খুঁজাখুঁজি করছে!

ছাত্র লীগের দুর্বৃত্তরা ২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকে বেপরোয়াভাবে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, গুণ্ডামী, সন্ত্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে এখন শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই নয়, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগ দল ও সরকারের নাকের ডগায় এসব ঘটে চললেও তারা এদের এই দুর্বৃত্তগিরি বন্ধ করার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের সঙ্গে নিজের সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন বলে জানানো হলেও তার দ্বারা কোন কাজ হয়নি। কারণ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছাত্র লীগের সম্পর্ক কারও কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার নয়। এ দুইয়ের মধ্যে এমন এক নাড়ীর যোগ আছে যা ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

জনগণ এই যোগ সম্পর্কের কথা জানেন। কাজেই ছাত্র লীগের দৌরাত্ম্যের ফলে সরকারী দল ও সরকারের বিরুদ্ধেও তারা বিক্ষুব্ধ হতে থাকেন।

এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে, ছাত্র লীগকে তারা আর নিজেদের অঙ্গসংগঠন মনে করে না। তার সঙ্গে তারা সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এটা যে লোক দেখানো ঘোষণামাত্র, এটা জনগণ থেকে নিয়ে পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত সবারই জানা। আওয়ামী লীগ ও সরকারের নেতা-নেত্রীদের বাইরের বক্তৃতা-বিবৃতি সত্ত্বেও তারা যে ছাত্র লীগের পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের জোরেই যে ছাত্র লীগের গুণ্ডাপাণ্ডা সন্ত্রাসীরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এটা জনগণ তো জানেনই কিন্তু তার থেকে বেশী জানে পুলিশ। কারণ পুলিশের ওপর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হুকুমদারি করে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকৃত পদক্ষেপ নিতে তাদের বিরত রাখছে। এমনকি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগ কর্তৃক পুলিশ কর্মকর্তাকে বেদম মারধর করার ঘটনা থেকে দেখা যায়, পুলিশ কোন সময় তাদের বাধা দিতে এলে তারা খোদ পুলিশের ওপরই চড়াও হয়ে তাদের মারধর করছে এবং এজন্য তাদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ ও তাদের সরকারের সঙ্গে ছাত্র লীগের এই যোগ সম্পর্ক যদি না থাকত তাহলে একটি 'স্বাধীন' সংগঠন হিসেবে ছাত্র লীগের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুটপাট ও সন্ত্রাস যেভাবে চলছে, এটা যে সম্ভব হতো না তা বলাই বাহুল্য। কাজেই ছাত্র লীগ আর তাদের অঙ্গসংগঠন নয়, আওয়ামী লীগের এ ঘোষণা জনগণের সঙ্গে তাদের হাজার রকম প্রতারণার মতোই একটি প্রতারণা মাত্র।

এটা যে প্রতারণা এ বিষয়টি তাদের অন্য এক ঘোষণা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে ১০ মে দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা দরকার। এতে বলা হয়েছে, 'সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের বেপরোয়া

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ড সামাল দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এর কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেয়া হচ্ছে। ছাত্র লীগের বর্তমান মেয়াদোত্তীর্ণ কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে আগামী মাসেই গঠন করা হচ্ছে নোতুন কমিটি। অবাধ্য ছাত্র লীগকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ঘরে-বাইরে চরম সমালোচনার মুখে পড়েছে সরকার। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ক্ষমতাসীন দলের হাই কমান্ডের নির্দেশে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র মতে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ গঠনতান্ত্রিকভাবে স্বাধীন ছাত্র লীগের বিষয়ে সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তবে একই আদর্শের অনুসারী হওয়ায় ছাত্র লীগের দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের তিন সাংগঠনিক সম্পাদককে। তাদের মাধ্যমেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমিটি ভেঙে দেয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, ছাত্র লীগ তাদের কোন অঙ্গসংগঠন নয়– আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা? আসলে ছাত্র লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক এমনই যে, এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আওয়ামী লীগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে কাউন্সিল অধিবেশন ডেকে নোতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ কি সম্ভব। শুধু দুই সংগঠনের মধ্যে 'আদর্শগত ঐক্যের' কারণে? একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে কাউন্সিল অধিবেশন ডেকে নোতুন কমিটি গঠন তো সংগঠনটির নিজেরই কাজ। এ কাজের এখতিয়ার তো অন্য কোন সংগঠনের থাকতে পারে না, যদি সে সংগঠন তার মাতৃ বা পিতৃ সংগঠন না হয়, যদি তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত না হয়? নির্বাচন কমিশনের নামকাওয়াস্তে নিয়ম-কানুন অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে তাদের অঙ্গসংগঠন বিচ্ছিন্ন করার যে চেষ্টাই হোক, বাস্তবত এসব সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কাজেই উপরের উদ্ধৃত রিপোর্টে যে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ'-এর কথা বলা হয়েছে, তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে আগামী জুন মাসে সংগঠনটির নোতুন কাউন্সিল অধিবেশন ডাকার ঘোষণা দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগের নোতুন কমিটি গঠনের জন্য লোক খুঁজছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও তাদের ছাত্র সংগঠনটির অবস্থা যে সাংগঠনিক ও নৈতিকভাবে কত করুণ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় একই দিনে প্রকাশিত কালের কণ্ঠের অন্য একটি রিপোর্ট থেকে। এতে বলা হয়, 'সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগকে পথে আনতে নোতুন নেতৃত্ব খোঁজা হচ্ছে। সম্ভাব্য নয়া নেতাদের সম্পর্কে তথ্য-তালাশ করতে মাঠে নামানো হয়েছে গোয়েন্দাদের। নোতুন নেতৃত্বে যাতে কোনভাবেই বিতর্কের জন্ম না দেয়, সে বিষয়টি মাথায় রেখে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থাকে। ছাত্র লীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির নেতাদের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে তাদের 'আমলনামাও' তৈরী করছেন গোয়েন্দারা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।'

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ নেতারা ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দিয়ে নোতুনভাবে সংগঠনকে দাঁড় করানোর উদ্যোগ নিলেও ছাত্র লীগ নেতাদের সম্পর্কে তাদের নিজেদের কোন রিপোর্ট নেই। তারা কোথায় কি কাজ করছে তার কোন খবর তাদের নিজেদের কাছে নেই। এ কারণে তাদের বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা সরকারের একাধিক গোয়েন্দা বিভাগকে নিযুক্ত করেছেন। একটি দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থা কি শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়ালে এটা সম্ভব তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আসলে আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীরা তাদের সব থেকে ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংগঠন ছাত্র লীগের নেতাদের বিষয়ে বিশেষ খবরাখবর রাখেন না এ কারণে যে তারা নিজেরা কেউ আর সাংগঠনিক কাজ করেন না। ছাত্র লীগ নেতারা যে কাজ করেন সে কাজই তারা অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে ওপরতলায় বসে করে থাকেন, তাতেই সময় দেন। গুণগত দিক দিয়ে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ডের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যেটুকু আছে সেটা তাদের কাজের ধরনের, দুর্নীতি ও লুটপাটের পদ্ধতির। কাজেই প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজের অনুপস্থিতিতে ছাত্র লীগ নেতাদের বিষয়ে তাদের নিজেদের কাছে কোন রিপোর্ট নেই। শুধু তাই নয়, তাদের এমনই অবস্থা যে, এ রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক লোকজনও নেই। এ কারণে এ ব্যাপারে এখন তাদের একমাত্র নির্ভর সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা!

এ গোয়েন্দারা এখন বিভিন্ন ছাত্রাবাসে, ছাত্র নেতাদের বাড়িতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে ছাত্র লীগ নেতাদের চুরি, দুর্নীতি, আচরণ, মাদকাশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে। এ তদন্ত করতে গিয়ে যে সরকারী গোয়েন্দাদের অবস্থা 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়' এর মতো হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ 'মেধাবী, যোগ্য ও ত্যাগী' ছাত্রের কী সন্ধান পাবে, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। তাছাড়া এখানে 'ত্যাগী' ছাত্র বলতে কী বোঝায় তা বোঝা মুশকিল। ছাত্রদের আবার ত্যাগের প্রশ্ন কিভাবে ওঠে? তাদের ত্যাগের সুযোগইবা ছাত্রাবস্থায় কোথায়? তবে এর দ্বারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছাত্র ভর্তি ইত্যাদিতে যদি অংশগ্রহণ না করা বোঝায়, সেটা এক ভিন্ন ব্যাপার। তবে এসবে অংশগ্রহণ না করাকে ত্যাগ হিসেবে ধরা যে সমাজে ও দলে সম্ভব সে সমাজ ও দলের অবস্থা ভয়াবহই বলতে হবে।

আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত করা পারে। কিন্তু তার দ্বারা পরিস্থিতির মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ ছাত্র লীগ যেখান থেকে নিজেদের দুর্বৃত্তগিরির শক্তি সংগ্রহ করে, সেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বন্ধ হওয়ার নয়। এটা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ জনগণ এবং পুলিশ প্রশাসনও প্রতিদিন, অহরহ পাচ্ছেন। কাজেই ছাত্র লীগকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস রোগমুক্ত করার উদ্যোগ যারা নিচ্ছেন তাদের বাইবেলের ভাষায় বলা যায়– "Physician heal thyself"– অর্থাৎ চিকিৎসক, তুমি আগে নিজের রোগ সারাও। কিন্তু হায়, নিজের রোগ সারানোর ক্ষমতা বা উপায় তো আওয়ামী লীগের নেই। তারা বস্তুতপক্ষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত।

যুগান্তর : ১৬.০৫.২০১০ ১১.৫.২০১০

www.pathagar.com

র‍্যাবকে প্রত্যাহার করতে হবে

আধা-সামারিক বাহিনী র‍্যাবের বেপরোয়া খুনখারাবি ও নির্যাতন এখন এক বিপজ্জনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় বাঙলাদেশে জনগণের ওপর যে ফ্যাসিস্ট শাসন এখন বলবৎ আছে, এরা হলো তারই সব থেকে প্রামাণ্য প্রতীক। র‍্যাবের সদস্যদের কীর্তিকলাপ শুধু ক্রসফায়ার নামে পরিচিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই সীমিত নেই, এমন সব রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যাতে তারা পুরোপুরি ক্রিমিনালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করছে, তাদের পকেট মারছে এবং যথেচ্ছাভাবে লুটপাটও করছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি তারা সাতক্ষীরায় আওয়ামী লীগের একজন পরিচিত স্থানীয় নেতার বাসায় পরিকল্পিতভাবে অস্ত্র রেখে দিয়ে পরে তার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে অবৈধ অস্ত্র রাখার জন্য যেভাবে ধরার চেষ্টা করে নিজেরাই ধরা পড়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় এদের বেপরোয়া অবস্থান কোন মাত্রায় এসে দাঁড়িয়েছে।

২০০৪ সালে আমেরিকানদের প্ররোচনা, পরামর্শ বা নির্দেশ অনুযায়ী তৎকালীন বিএনপি জোট সরকার র‍্যাব নামে এই ফ্যাসিস্ট সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। ভারতের র‍্যাপিড এ্যাকশন ফোর্সের (RAF) আদলেই এ বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এ জন্য তখনকার সংবাদপত্র রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল, শুধু বিএনপি'র আমলেই নয়, ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত সরকারের আমলেও মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে র‍্যাবকে শক্তিশালী ও কার্যকর রাখার জন্য অনেক তাগিদ দেয়া হতো। এর ফলে সারাদেশে র‍্যাব কর্তৃক হত্যাকাণ্ড ও নানা ধরনের নির্যাতন ব্যাপক আকারে চলতে থাকে এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে তারা বামপন্থী বহু নেতাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্রসফায়ারে হত্যা করে। কিন্তু শুধু ক্রিমিনাল ও বামপন্থী লোকজনই নয়, এরা হত্যার লাইসেন্স হাতে পেয়ে সাধারণভাবে ক্রসফায়ারে অনেক মানুষ হত্যা করে যারা ছিল একেবারেই নিরীহ। এর বিরুদ্ধে কিছু বামপন্থী সংগঠন ও মানবাধিকার সংস্থা প্রতিবাদ জানিয়ে এলেও তার কোন পরোয়া না করে সরকারের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে র‍্যাব সমানে তাদের ফ্যাসিস্ট নির্যাতন সব সম্ভাব্য ধরনে জারী রাখে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারে র‍্যাবের কর্মকাণ্ড, বিশেষত ক্রসফায়ার, হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিল, যে জনগণ ছিল র‍্যাবের নির্যাতনের প্রধান শিকার। নির্বাচনে বিপুল ভোট পেয়ে সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগ তাদের সরকারকে এক ধরনের জাতীয় সরকার হিসেবে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠন করে এক

www.pathagar.com

জোট সরকার। এ দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টি ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য দল ছিল না। যে কয়েকটি বামপন্থী দল এই সরকারে যোগ দিয়ে নিজেদের দক্ষিণপন্থী চরিত্র উন্মোচন করেছিল, সংসদীয় শক্তি হিসেবে তারা ছিল গুরুত্বহীন। এ বামপন্থীরা এখন ছিটেফোঁটা খুদ-কুঁড়ো খেয়ে হতাশ অবস্থায় মাখন-রুটির জন্য মাঝে মাঝে হাহাকার করছে। কিন্তু আওয়ামী সরকারী মহলে তাদের এই হাহাকার অরণ্যে রোদনের নামান্তর মাত্র। মুখে এ বামপন্থীরা অনেক কিছু বললেও র‍্যাবের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে বা এসব ফ্যাসিস্ট তৎপরতা বন্ধ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে দেখা যায়নি। যারা নিজেরা হালুয়া-রুটির জন্য আওয়ামী লীগের করুণাপ্রার্থী, তারা সরকারের এই নির্যাতন নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এটা ভাবার কোনই কারণ নেই।

এ পরিস্থিতিতে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ র‍্যাবের হত্যাকাণ্ড ও ব্যাপক নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ তো নেয়ইনি, উপরন্তু তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র‍্যাবের ক্রসফায়ার সমর্থন করে তা বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। তাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ নিশ্চিত হয়েই এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, র‍্যাব আত্মরক্ষার জন্যই প্রথম ফায়ার করে থাকে! আত্মরক্ষার অধিকার তাদের আছে! সে অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যায় না! কাজেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময় র‍্যাবের ক্রসফায়ারকে হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করে তারা যা বন্ধের কথা বলেছিলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করে গদিনসিন হওয়ার পর সে হত্যাকাণ্ড তাদের দ্বারা আখ্যায়িত হলো আত্মরক্ষামূলক বলে।

র‍্যাব এখন যেভাবে তার ক্রসফায়ার, হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে তাতে এই সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে জনমত গড়ে উঠেছে। এদের দ্বারা বলপূর্বক টাকা আদায়, ডাকাতি, রাহাজানি ও ক্রিমিনালদের পক্ষে ভাড়া খাটার যেসব রিপোর্ট সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়, তার থেকেই বোঝা যায় এরা কতখানি বেপরোয়া হয়ে আজ ক্রমশ এক শৃঙ্খলাবিহীন বিপজ্জনক সরকারী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি সাতক্ষীরার উপরোক্ত ঘটনা থেকেও এর প্রমাণ ভালভাবেই পাওয়া যায়।

লক্ষ্য করার বিষয়, ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠিত হওয়ার পর থেকে বিএনপি, ফখরুদ্দীনের আধা সামরিক সরকার ও তারপর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে র‍্যাবের আকার ও শক্তি ক্রমশ ও ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, এটা শুধু কোন বিশেষ দলের ব্যাপার নয়। এটা হলো সাধারণভাবে সমগ্র শাসক শ্রেণীরই বল প্রয়োগের এক হাতিয়ার, যা আমেরিকানদের সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট হয়েই সক্রিয় আছে।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে এতো অভিযোগ এবং তাদের বিশৃঙ্খলার ওপর এতো রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তারা যেসব হত্যাকাণ্ড ক্রসফায়ারের নামে করেছে, তার একটিরও কোন বিচার হয়নি। শুধু ক্রসফায়ারে নয়, তাদের হাতে আটক অবস্থায়ও

www.pathagar.com

অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। এসব মৃত্যুও হত্যাকাণ্ড ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এর বিচারের কোন প্রশ্ন নেই। এরা সম্পূর্ণভাবে আইনের আওতার বাইরে থেকে এক বেপরোয়া রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে বিদ্যমান সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এদের শক্তি হ্রাসের পরিবর্তে সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, এদেব পুলিশের থেকে উচ্চমানের অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে। এমনকি এখন এদের জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও হচ্ছে বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও আজ প্রয়োজন হয়েছে র‍্যাবের মতো একটি রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা শুধু কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই নয়, এই সংস্থাটি সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করা। এ কাজ না করলে স্পষ্টতই বোঝা যাবে র‍্যাব যে কাজ করছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থনই যে আওয়ামী লীগ জোট সরকারের আছে তাই নয়, তাদের ফ্যাসিস্ট শাসন বজায় রাখার জন্য র‍্যাবের মতো সশস্ত্র সংস্থা তাদের বড়ই প্রয়োজন।

বাঙলাদেশে একের পর এক সরকার ক্ষমতায় আসে এবং নোতুন নোতুন বাহিনীর জন্ম দেয়। বর্তমান সরকারও এখন শিল্প পুলিশ নামে এক নোতুন বাহিনী গড়ে তুলে তাকে শিল্প এলাকায় মোতায়েন করার কথা ঘোষণা করেছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার শিল্প পুলিশের কথা বলে আসছে। এটা এদের শ্রমিক বিরোধী ও মালিক তোষণকারী নীতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রমিকদের তাদের পাওনা মজুরি এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা না করে বিশেষ শিল্প পুলিশের দ্বারা দমনের ব্যবস্থাই হচ্ছে। এসব থেকে বোঝার অসুবিধা নেই কতখানি শ্রমিকবিরোধী স্বার্থ, জনবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব এরা করছে এবং জনশত্রুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা জনগণের ওপর কোন মাত্রায় নির্যাতন করতে প্রস্তুত।

এই যখন অবস্থা তখন বাঙলাদেশের আইনমন্ত্রী ২৮ মে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের বলেন, এখন ক্রসফায়ারের কোন ঘটনা আর ঘটছে না। ক্রসফায়ার বন্ধ আছে। এ কথা তিনি যখন বলছেন তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত সোমবার কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রামে পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে দু'জনের নিহত হওয়ার খবর দিয়েছে। (কালের কণ্ঠ, ২৯.৫.২০১০)। এর থেকেই বোঝা যায়, শুধু র‍্যাবই বেপরোয়া নয়, সরকারের মন্ত্রীদের মতো দায়িত্বশীল লোকরাও কতখানি বেপরোয়া এবং জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কথা বলতে তারা কতখানি অভ্যস্ত।

কিন্তু শাসক শ্রেণীর ম্যানেজার হিসেবে আওয়ামী লীগ জোট সরকার শ্রমিক-কৃষকসহ সব জনগণের ওপর দমন-পীড়নের নীতিতে যতই অটল থাকুন, জনগণকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। এ কারণে শিল্প পুলিশ থেকে নিয়ে র‍্যাবের মতো ফ্যাসিস্ট সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দেয়ার জন্য ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা এই পর্যায়ে হল জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যুগান্তর : ৩০.০৫.২০১০ ২৯.৫.২০১০

www.pathagar.com

আমার দেশের ওপর সরকারের ফ্যাসিবাদী হামলা

প্রতিহিংসাপরায়ণতা কোন উচ্চ নৈতিকতার পরিচায়ক নয়। বরং তার উল্টো। বর্তমান সরকার এ উল্টো কাজটিই গদিনসিন হওয়ার পর থেকে করে আসছে এবং এখন এর ভয়াবহ রূপ প্রতিদিনই নব নব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া এই প্রতিহিংসাপরায়নতারই সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। এর আগে চ্যানেল ওয়ান ও যমুনা টেলিভিশনের সম্প্রচারও একই রাজনৈতিক কারণে বন্ধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতাও যুক্ত আছে। আমার দেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসার আগে এ বিষয়ের উল্লেখ দরকার। বাঙলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস সামাদ 'আমার দেশ বন্ধ করা প্রসঙ্গে কিছু কথা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন দৈনিক কালের কণ্ঠে (৫.৬.২০১০)। এতে তিনি বলেন, 'আমার দেশ পত্রিকা ও চ্যানেল ওয়ান সরকারের কাছ থেকে যথাযথ ও বৈধ অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করছিল অর্থাৎ এগুলো চালু ছিল এবং যমুনা টেলিভিশন একটি অনাপত্তিপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার চালাচ্ছিল। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ আছে। অথচ এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মূলধন বিনিয়োগ করে যে ব্যবসা চালু হয়েছে, সরকার সে রকম বৈধ ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে।' এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক টিভি চ্যানেলই আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করার আগে এই অনুমতিপত্রের ভিত্তিতেই পরীক্ষামূলক সম্প্রচার চালিয়ে থাকে। এদিক দিয়ে যমুনা টিভি কোন ব্যতিক্রম ছিল না। কাজেই বৈধভাবে ব্যবসা করলেও এই প্রচার মাধ্যমগুলোর ওপর আক্রমণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসামূলক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। একথা কার না জানা যে, বাঙলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নেতা নেত্রীরা রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরেও নিছক ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অনেক ধরনের আক্রমণ প্রতিপক্ষের ওপর করে থাকেন।

আমার দেশ বন্ধ প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলা দরকার, এক্ষেত্রে প্রতিহিংসাপরায়ণতা সব কিছুকে অতিক্রম করে কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আতাউস সামাদ আমার দেশের উপদেষ্টা ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তার লেখায় এ বিষয়ে যা পাওয়া যায় তার কিছু উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করবে। বৈধ প্রকাশক ছাড়াই আমার দেশ প্রকাশ করা হয়েছে, এটাই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ। এ বিষয়ে আতাউস সামাদ বলেন, 'সরকার যেভাবে আমার দেশ পত্রিকাকে প্রকাশকবিহীন করে ফেলল, সেটা যে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাও পরিষ্কার। কারণ আমার দেশ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী কোম্পানি আমার দেশ পাবলিকেশন্স লিমেটেডের পরিচালনা পর্ষদ মাহমুদুর রহমানকে ওই

www.pathagar.com

পত্রিকার প্রকাশক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই আইন অনুসরণ করে তিনি ঢাকার ডেপুটি কমিশনারকে তা জানিয়ে সে মতে প্রকাশকের নাম পরিবর্তনের অনুরোধ করে চিঠি দেন ২০০৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। অতপর তিনি ৫ নভেম্বর ২০০৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের কাছ থেকে একটি চিঠির অনুলিপি পান, যা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানো হয়েছিল। এ চিঠিটি ঢাকা জেলা প্রশাসক বরাবর পাঠিয়ে দেন ওই অধিদফতরের উপ-পরিচালক (নিবন্ধন) মাসুদা খাতুন।... এই পত্রে সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর, ঢাকার জেলা প্রশাসনকে জানাচ্ছে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমার দেশ পত্রিকাটির প্রকাশক আলহাজ মোঃ হাসমত আলীর পরিবর্তে জনাব মাহমুদুর রহমানের নাম প্রতিস্থাপন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।' কিন্তু ঢাকার জেলা প্রশাসক তা সত্ত্বেও সেই নভেম্বর মাস থেকেই মাহমুদুর রহমানের আবেদনে সাড়া দিলেন না। সরকারের (অর্থাৎ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের-উমর) মতামত জানার পরও তিনি সাত মাস নির্লিপ্ততা ও নিঃশব্দতা অবলম্বন করলেন! যখন উঠে বসলেন, তখন যেন হুংকার দিলেন, 'না, মাহমুদুর রহমান প্রকাশক পদে গ্রহণযোগ্য নন, কাজেই তার আবেদন খারিজ করা হল।' একই সঙ্গে তিনি আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশক পদ থেকে হাসমত আলীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে এ মুহূর্তে পত্রিকাটির কোন প্রকাশক নেই ঘোষণা করে তার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

আতাউস সামাদের উপরোক্ত লেখা থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়ার কারণ এখানে তিনি আমার দেশ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিক হিসেবে যা বলেছেন, তা থেকেই এটা প্রমাণ হয় যে, আমার দেশকে প্রকাশকশূন্য করার দায়িত্ব মাহমুদুর রহমানের নয়। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ঢাকার জেলা প্রশাসকের। এজন্য আইন অনুযায়ী তারই শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তার কোন শাস্তি হবে না, কারণ তিনি এ অপকর্মের মূল হোতা নন। সরকারের শীর্ষতম পর্যায় থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এটা কার্যকর করা হয়েছে।

আমার দেশ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও বহুল প্রচারিত দৈনিক। কাজেই এই সংবাদপত্রটির ওপর এভাবে হামলা যে কোন দিক থেকেই যুক্তিসঙ্গত ও আইনসম্মত নয়, এটা যে কোন নিরপেক্ষ ও সৎ ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু প্রতিহিংসা যেখানে এই কাজের মূল প্রণোদনা সেখানে যুক্তি, আইন ইত্যাদির স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে আমার দেশ এর প্রকাশক সম্পর্কিত যা কিছু ঘটনা ঘটেছে তার থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী কোম্পানি অথবা তার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিন্দুমাত্র ভিত্তি নেই। পত্রিকাটিকে প্রকাশকশূন্য দেখানোর ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী চক্রান্তের দ্বারাই ঘটানো হয়েছে। হাসমত আলীর পারিবারিক সূত্র থেকে বলা হয়েছে, যেদিন পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করা হয় সেদিন সকালের দিকে হাসমত আলীকে তার বাড়ি থেকে গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই তাদের অফিসে নিয়ে যায় এবং তিনি দুটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর না দেয়া পর্যন্ত তাকে তারা ৫ ঘণ্টা সেখানে আটক রাখে।

www.pathagar.com

সাদা কাগজে এভাবে স্বাক্ষর নেয়ার অর্থ কী হতে পারে? এটা অনুমান করা কি ঠিক নয় যে, গোয়েন্দা সংস্থাটি আমার দেশ পত্রিকা ও তার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদককে চক্রান্তমূলকভাবে ফাঁসানোর জন্য সাদা কাগজে তাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিজেদের যা প্রয়োজন সেটাই লিখে দিয়েছে?

প্রথমে আমার দেশ-এর প্রেস সিলগালা দিয়ে বন্ধ করা হয়। তারপর পত্রিকাটি বন্ধের কোন লিখিত নির্দেশ ছাড়াই পুলিশ গিয়ে তা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। তারপর তারা মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারের কথা বললেন। কিন্তু গ্রেফতারের জন্য কোন ওয়ারেন্ট তাদের কাছে ছিল না। সরকার থেকে বলা হয়েছে, পুলিশকে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে বাধা দেয়া অর্থাৎ মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারে বাধা দেয়ার কারণেই তাকে গ্রেফতার করা হয়! এর থেকে অদ্ভুত ও উদ্ভট সরকারী যুক্তি আর কি হতে পারে? আমার দেশ বন্ধ করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ নয়, সরকারই সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করে নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে।

আগেই বলা হয়েছে, নথিপত্র মোতাবেক আমার দেশকে প্রকাশকশূন্য করার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী হচ্ছেন ঢাকার ডিসি। কিন্তু তার কোন শাস্তি হবে না। কারণ তিনি প্রশাসনে আওয়ামী ঘরাণার লোক। সরকারের ইঙ্গিতেই তিনি নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত আমার দেশ-এর প্রকাশক পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত না নিয়ে চক্রান্তমূলকভাবে পত্রিকাটিকে হঠাৎ করে প্রকাশকশূন্য করেছেন। এর সঙ্গে এনএসআই কর্তৃক হাসমত আলীকে দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়ার ব্যাপারটিও সম্পর্কিত। শেখ হাসিনা ধুয়োর মতো করে প্রায় প্রতিদিনই বলে থাকেন, কোন অপরাধী যে কোন, দলেরই হোক তার মাফ নেই, তার শাস্তি হবে। তিনি যে কথাটি অনুচ্চারিত রাখেন তা হলো অপরাধী যে কোন দলের হোক তার শাস্তি হবে। শুধু আওয়ামী লীগ ঘরাণার অপরাধী ছাড়া। তাদের ঘরাণার ক্রিমিনালরা দিবারাত্রি চুরি, ডাকাতি, ঘুষখোরী, খুনখারাবি, রাহাজানি, প্রতারণা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদি সব রকম অপরাধ করে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন শাস্তি হয় না। অপরাধ করে ধনদৌলতের মালিক হয়ে ও শক্তি সঞ্চয় করে তারা আরও বড় বড় অপরাধ করে গেলেও তাদের শাস্তি হয় না।

সংবাদপত্র রিপোর্টে দেখা গেল, মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ তাকে রিমান্ডে নেয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেছে। আদালত এ ব্যাপারে শুনানির জন্য তারিখ ফেলেছেন। কিন্তু কেন? এজন্য শুনানির প্রয়োজন কেন হবে? এ আবেদন সরাসরি নাকচ করা হবে না কেন? এখন কথায় কথায় যে কোন লোককে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ফখরুদ্দীনের বেনামি সামরিক সরকারের সময় চালু হয়েছিল। তারা তখন রাজনৈতিক নেতাদের রিমান্ডে নিয়ে তাদের ওপর যথেচ্ছভাবে শারীরিক ও মানসিক পীড়ন চালিয়েছিল। সেই প্রক্রিয়া এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও পুরোদস্তর বহাল আছে। আদালত নিয়মিতভাবে পুলিশের আবেদন অনুযায়ী শত শত ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃতদের রিমান্ডে নেয়ার আবেদন মঞ্জুর করছেন।

www.pathagar.com

মাহমুদুর রহমান একটি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক। যদি ধরেও নেয়া যায়, প্রকাশকবিহীন অবস্থায় তিনি পত্রিকা বের করেছেন, তাহলেও এ কারণে তাকে রিমান্ডে নেয়ার প্রস্তাব কিভাবে পুলিশ করতে পারে? কিভাবেই বা আদালত তাদের এই আবেদন বিবেচনার অধীন রাখতে পারেন? হতে পারে তারা পুলিশের আবেদন অনুযায়ী মাহমুদুর রহমানকে রিমান্ডে পাঠিয়ে দেবেন। এর দ্বারা মহামান্য আদালতের মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা গণতন্ত্রের জয়জয়কার কোনটাই হবে না। এর দ্বারা সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্রই উন্মোচিত হবে।

সরকার এখন যেভাবে চলছে তাতে মনে হয় এরা দ্রুত ১৯৭৪-৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী ফ্যাসিবাদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন বলছে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই সংবিধানের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে প্রকৃতপক্ষে উচ্ছেদ করেছিলেন কে? সেই সংবিধান পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর আগে যে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমেই উচ্ছেদ হয়েছিল, এটা একমাত্র আওয়ামী লীগের লোকজন ও তাদের তল্পিবাহক ছাড়া অস্বীকার করবে কে? ১৯৭৫ সালের সেই কুখ্যাত ও ফ্যাসিস্ট চতুর্থ সংশোধনীই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার অঘোষিতভাবে কার্যকর করছে। তাদের আমলে এখন ফ্যাসিবাদের এক মহোৎসব চারদিকে শুরু হয়েছে। এই ফ্যাসিবাদ তাদের অতি দ্রুতগতিতে কোথায় নিয়ে যাবে এ বিষয়ে ভাবনার কোন সময় ও ক্ষমতা তাদের এখন নেই। তারা ক্ষমতা মদমত্ত অবস্থায় এখন এমন পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, যা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তাদের উৎখাতকে অনিবার্য করবে।

যুগান্তর : ০৬.০৬.২০১০ ৫.৬.২০১০

www.pathagar.com

নিমতলীর অগ্নিকাণ্ড এবং তারপর

পুরান ঢাকার নিমতলীতে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ, আহত হয়েছেন অসংখ্য। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা অনেক। এতো বড় আকারে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে যা শুধু ঢাকাতেই নয়, সারাদেশে কোথাও ইতিপূর্বে ঘটেনি, যদিও ঢাকাকে আখ্যায়িত করা চলে বিশ্বের সব থেকে অধিকসংখ্যক অগ্নিকাণ্ডের শহর হিসেবে। ঢাকার এই আখ্যা অর্জন বাঙলাদেশে গার্মেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ব্যাপার। কারণ ১৯৯০-এর দশক থেকে ঢাকায় যেসব অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তার বিপুল অধিকাংশই ঘটেছে গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে। বাকি সব অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ঢাকার গরিবদের আবাসস্থল বস্তিগুলোতে। এসব অগ্নিকাণ্ডে শত শত শ্রমিক ও গরিবের মৃত্যু হয়েছে।

এ ধরনের প্রত্যেক অগ্নিকাণ্ডই একেক ধরনের ক্রিমিনাল কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। সব রকম সূত্রের রিপোর্ট থেকেই দেখা যায়, নিমতলীতে যে বাড়িতে আগুন শুরু হয় সেই বহুতল ভবনটির নিচের তলায় একটি কেমিক্যাল কারখানার কাঁচামাল ছিল। ওইদিন এই নিচের তলাতেই চলছিল রান্নাবান্না। এ ভবনে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে তা দ্রুতগতিতে, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়িতে। এত দ্রুত এটা ঘটে যাতে এই বাড়িগুলোর অধিকাংশ বাসিন্দাই বাইরে বের হতে না পেরে ঘরের মধ্যেই নিহত হন।

নিমতলীতে যা ঘটেছে সেটা একটা জাতির জীবনে মস্ত ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির মাধ্যমে যা প্রমাণিত হয়েছে তাহলো, এ দেশে বহু বিচিত্র অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কোন কলকব্জা এই রাষ্ট্রের হাতে নেই। এই অপরাধের একটি হলো, আবাসিক এলাকাগুলোতে, আবাসিক ভবনের মধ্যেই, নানা ধরনের মারাত্মক ও বিপজ্জনক শিল্প গড়ে তোলা। সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, এই শিল্প কারখানাগুলোতে নানা প্রকার দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ রাখা হয়। এগুলো এমনিতেই যে কোন আবাসিক ভবনে স্বাস্থ্যের পক্ষে হুমকি হলেও এর ফলে কী বিপর্যয় জীবনে ঘটতে পারে সেটা নিমতলীর অগ্নিকাণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

নিমতলীর স্থানীয় লোকজন তো বটেই, গোটা ঢাকা শহর ও দেশের লোকও অগ্নিকাণ্ডের এই প্রলয়ঙ্কর ঘটনায় স্তম্ভিত ও শোকার্ত হয়েছেন। এই সঙ্গে তাদের মধ্যে আবাসিক এলাকার পরিবেশ সম্পর্কিত প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পুরান ঢাকার ১০টি থানা এলাকায় আবাসিক ঘরবাড়িগুলোর অবস্থান নিমতলী এলাকারই মতোই। সেগুলোর কোন প্রকৃত আবাসিক চরিত্র নেই। এ ভবনগুলোতে হাজার হাজার ছোট ছোট শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং এই কারখানাগুলো কোন লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র

www.pathagar.com

ছাড়াই তাদের কারবার করছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ও পুলিশ যে এসবের খবর রাখে না তা নয়, তারা এর খোঁজখবর ভালোই রাখে। রাখার প্রয়োজন তাদের জন্য হয় এ কারণে যে, এগুলো হচ্ছে তাদের আয়ের এক বড় উৎস। আবাসিক ভবনগুলোতে লাইসেন্স ছাড়া যে কারখানাগুলো চালু আছে সেগুলো হলো– ড্রাইসেল বা ব্যাটারি কারখানা, নকল ওষুধ তৈরীর কারখানা, নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ তৈরীর কারখানা, প্লাস্টিক সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা, নকল বৈদ্যুতিক তার, আচার, চকোলেট, বিস্কুট তৈরীর কারখানা, ঝালাই কারখানা, রেক্টিফায়েড স্পিরিট ব্যবহার করে এমন সুগন্ধি ও আতর তৈরীর কারখানা, আতশবাজি ও পটকা তৈরীর কারখানা, রাবার ফ্যাক্টরি, রং ও সলিউশন তৈরীর কারখানা, ব্লিচিং পাউডার, নকল কসমেটিক ইত্যাদি নানা ধরনের কারখানা। এগুলো সবই আবাসিক ভবন এ বটেই, এমনকি আবাসিক এলাকার জন্যও বিপজ্জনক– এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোটা পুরান ঢাকার হাজার হাজার আবাসিক ভবনে এখন এ কারখানাগুলো চালু আছে। এগুলোর যে কোনটি থেকেই নিমতলীর মতো অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে এ নিয়েও কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ হচ্ছে রাজধানী শহর ঢাকার বাস্তব অবস্থা।

আসলে ঢাকার আবাসিক এলাকা বলে কিছু আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। এমনকি ঢাকার বড়লোকদের আবাসিক এলাকা বলে যেগুলো পরিচিত ছিল, সেই ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি এলাকাও আবাসিক এলাকার চরিত্র হারিয়ে এখন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে নানা ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিসের এলাকায় পরিণত হয়েছে। এভাবে ঢাকা শহর বাস্তবত বসবাসের জন্য অযোগ্য হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বেআইনীভাবে শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তা-ই নয়, পরিবেশদূষণ ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা রাখছে।

এ তো গেল পরিস্থিতির একদিক। এর অন্যদিক হলো, দ্রুত সম্প্রসারণশীল ঢাকা শহরে ভূমিদস্যু ও নির্মাণ ব্যবসায়ীদের ক্রিমিনাল তৎপরতা। এরা যে শুধু দস্যুতার মাধ্যমে অবাধে ও ব্যাপকভাবে জমি ও জলা দখল করছে তাই নয়, এমনভাবে তারা এগুলোর ওপর ইমারত তৈরী করছে যা রীতিমতো বিপজ্জনক। নানা বিশেষজ্ঞ সূত্র থেকেই দেখা যায়, এ ইমারতগুলোর মধ্যে হাজার হাজার হলো ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো সহজেই ধসে পড়তে পারে, যেভাবে কয়েক দিন আগে বেগুনবাড়িতে বাড়ি ধসে পড়েছে, সাভারে তিন-চার বছর আগে নয়তলা একটি গার্মেন্ট কারখানার বিল্ডিং ধসে পড়েছিল। এছাড়া আরও কয়েকটি ভবনের একই অবস্থা হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু যা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার তাহলো, ঢাকা সিটি করপোরেশন, রাজউক, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদফতর ইত্যাদি সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সেই সঙ্গে পুলিশ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে ঢাকাবাসীর জীবনের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা বেপরোয়াভাবে ঘুষখোরী ও দুর্নীতি করে চলার কারণে অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস ইত্যাদি এখন ঢাকার জনগণের জীবনকে বিপন্ন করে রেখেছে। এ বিপদ দিন দিন বাড়ার পথে।

www.pathagar.com

এ সমস্যার মোকাবিলা করা যে কত বড় দায়িত্ব এবং এটা যে কত বড় মাপের কাজ– এ বিষয়ে সরকারের কোন চেতনা ও চিন্তা-ভাবনা আছে এমন লক্ষণ কোথাও নেই। নিমতলীতে এক বিয়েবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে তা ছড়িয়ে গিয়ে এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাতে বিয়ে বাড়ির বউ এবং দু'একজন আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সবাই নিহত হয়েছেন। এটা এক মস্ত মানবিক বিপর্যয়। প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি গণভবনে নিজের তত্ত্বাবধানেই সেই বিয়েবাড়ির বিবাহের সব আয়োজন করবেন, ভাল কথা। কিন্তু তিনি এভাবে সরকারী খরচে নিজেকে এক মহীয়সী নারী হিসেবে লোকজনের কাছে উপস্থিত করাতে এর দ্বারা কোন কাজ হবে না। তিনি আহতদের চিকিৎসা সরকারী টাকায় হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ধনী লোকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে! সরকার যদি খরচ দেবেই তাহলে আর এ ধরনের আবেদনের প্রয়োজন কী? তাছাড়া রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের ঘোষণা সত্ত্বেও অনেক গরিব রোগীকেও হাসপাতালে নিজ খরচে ওষুধপত্র কিনতে হচ্ছে। সরকারী কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে কী ধরনের বিশৃঙ্খলার ব্যাপার ঘটছে তা এসব থেকে ভালভাবেই বোঝা যায়।

এ মুহূর্তে প্রধান মন্ত্রীর সব থেকে জরুরী কাজ ছিল ঢাকার আবাসিক ব্যবস্থার ওপর একটি জরুরী মনিটরিং সেল তৈরী করে সেটি নিজের অধীনে রাখা। পুরান ঢাকার আবাসিক ভবনগুলোর অবস্থা, রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত ভবনগুলোর অবস্থা, নিচু জমি ভরাট করা এলাকাগুলোতে তাড়াতাড়ি নির্মাণ কোম্পানিগুলো যেসব ভবন তুলছে সেগুলোর অবস্থার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা। যারা এক্ষেত্রে ক্রিমিনাল কাজ করছে তাদের পাকড়াও করা, তাদের ব্যবসা বন্ধ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বহু ভবন ভেঙে ফেলা। ঢাকা সিটি করপোরেশন, রাজউক, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ ও পুলিশের দুর্নীতি যতদূর সম্ভব বন্ধ করা। কিন্তু এ কাজ অতি জরুরী ভিত্তিতে না করে গণভবনে একটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মেয়ের বিয়ের আয়োজন করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে না। আসলে প্রধান মন্ত্রী এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে অবশ্যই পারতেন। কিন্তু গণভবনে বিয়ের আয়োজন করার প্রয়োজন কী? এটা আসলে সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টা না করে তার আসল চরিত্র আড়াল করে নিজের ভাটা পড়তে থাকা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা রক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কী? এ ধরনের কাজের মাধ্যমে দেশের জনগণের কোন উপকার তো হবেই না, এমনকি প্রধান মন্ত্রীর জনপ্রিয়তা রক্ষা হবে অথবা বৃদ্ধি পাবে– এমন মনে করারও কোন কারণ নেই।

সমকাল : ০৮.০৬.২০১০ ৭.৬.২০১০

www.pathagar.com

আটক ব্যক্তিদেরকে নিয়মিতভাবে রিমান্ডে নেয়া ফ্যাসিবাদেরই বহিঃপ্রকাশ

বাঙলাদেশে যেভাবে ও যে শর্তে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেটা যে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের উপায় নয়, এটা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেলেও ২০০৮ সালের নির্বাচন তা আবার নোতুনভাবে প্রমাণ করেছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে বিপুল বিজয় অর্জন করে, জাতীয় সংসদে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করেছে। এই নির্বাচনের আগে তারা এমনভাবে প্রতিশ্রুতির বন্যা প্রবাহিত করেছিল যা ইতিপূর্বে কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এমনকি ১৯৯৬ সালেও তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেখা যায়নি। সে নির্বাচনে জয়লাভ করে তারা সরকার গঠন করেছিল।

প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর প্রতিশ্রুতি পালনের ধারে-কাছে না গিয়ে তার উল্টো কাজ করলে, তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া হয়। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি যত বড় আকারে দেয়া হয়, তার বহর যত বেশী হয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও হয় তত বড় আকারের। শুধু তাই নয়, এ প্রতিক্রিয়া হয় ততই দ্রুত ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে সরকার গঠনের পর এটাই দেখা যাচ্ছে। এত বড় বিজয় লাভ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকার ঘটনা ইতিপূর্বে অন্য কোন সরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণী ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করে। এই শোষণ একটা প্রক্রিয়া ... নিয়ম অনুযায়ী চলে। এর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সেটা প্রতিরোধের তাগিদ সৃষ্টি করে, তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ইত্যাদি করে থাকেন। কিন্তু শোষণের থেকে নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া অধিকতর তীব্র হতে দেখা যায়। এখানে বলা দরকার যে, নির্যাতন কোন স্বাধীন ব্যাপার নয়। অর্থাৎ মানুষ নির্যাতনের জন্যই নির্যাতন করে না। নির্যাতন করা হয় তখনই যখন শোষিতরা শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, সংগঠিত হন, প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। জনগণের সম্পদ লুটপাটের সঙ্গেও নির্যাতন সম্পর্কিত থাকে। শোষণের মতো লুটপাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও জনগণের ওপর নির্যাতন হয়।

বাঙলাদেশে এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ বড় আকারে নির্যাতন চলছে। এই নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকাই মূল কারণ, যে জন্য বর্তমান সরকার দেড় বছরেরও কম সময়ে এত অজনপ্রিয় হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন সরকারকে হতে দেখা যায়নি। এমনকি এদের ১৯৯৬-২০০১ সালে ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষেত্রেও এটা ঘটেনি। তারা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারানোর ফলে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত

www.pathagar.com

হয়েছিল কিন্তু সেভাবে অজনপ্রিয় হতে দেরি হয়েছিল। সেরকম কোন দেরি ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। এভাবে দ্রুত জনগণের মধ্যে তাদের সমর্থন হারানোর কারণ জনগণের ওপর তাদের ব্যাপক ও মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন।

যেখানে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের আন্দোলন, সেখানেই নির্যাতন হচ্ছে। লাঠি, গুলি, ধরপাকড়, জেল-জুলুম সবকিছুই চলছে। তবে এ নির্যাতন শুধু রাস্তা ও মাঠে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেই হচ্ছে না, যারা সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন এজন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কথা বলে ও লিখে মতপ্রকাশ করছেন, তাদের ওপর সরকারী নির্যাতন এখন যথেচ্ছভাবে শুরু হয়েছে। টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েই সরকার ক্ষান্ত থাকছে না, টিভিতে যেসব প্রোগ্রামে সরকারের সমালোচনা হচ্ছে সেগুলোও তারা বন্ধ করছে। এ ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে, শুধু সরকার বিরোধিতার কারণেই যে এসব নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তাই নয়, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যেও নির্যাতনের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে।

চ্যানেল ওয়ান এবং যমুনা টিভি বন্ধ করার পর সরকার দৈনিক আমার দেশ শুধু বন্ধই করেনি, পত্রিকা ও তার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকসহ অন্য কর্মীদের ওপর যেভাবে হামলা করেছে, এটা বাঙলাদেশের সংবাদপত্রের ওপর সরকারী হামলার ইতিহাসে নজিরবিহীন। যেভাবে এ কাজ করা হয়েছে তার কোন প্রকৃত আইনগত ভিত্তি না থাকলেও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই আক্রমণের মাধ্যমে সরকার তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রই উন্মোচন করেছে।

এক্ষেত্রে আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তার উল্লেখ করা দরকার। ১ জুন আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুধু গ্রেফতার করাই হয়নি, তাকে বারবার রিমান্ডেও নেয়া হচ্ছে। রিমান্ডে নিয়ে মাহমুদুর রহমানের ওপর যে নির্যাতন করা হচ্ছে সেটা আলোচনার আগে বলা দরকার যে, কথায় কথায় যে কোন গ্রেফতার হওয়া লোককে রিমান্ডে নেয়ার ব্যাপারে বাঙলাদেশে আগে ছিল না। এটা শুরু হয়েছে ২০০৭-০৮ সালে ক্ষমতাসীন মঈন-ফখরুদ্দীন সরকারের বেনামি সামরিক শাসনামলে। সে সময় নির্যাতনের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, একজন রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হওয়ার অর্থই দাঁড়িয়েছিল পুলিশ বা র‍্যাবের রিমান্ডে নিয়ে তার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালানো। এসব নির্যাতন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয় দলই দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করে গদিনসিন হওয়ার পর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতো এ ক্ষেত্রেও সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এরা এখন বাস্তবত ২০০৭-০৮ সালের ফ্যাসিস্ট সরকারের যাবতীয় নীতিরই উত্তরাধিকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে তাদের কীর্তিকলাপেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। এরা যদি এই পথে না হাঁটত তাহলে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে কিছু অনিয়ম যদি হয়ে থাকত তাহলে তার জন্য প্রথম সারির একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদককে এভাবে রিমান্ডে নেয়ার ঘটনা সম্ভব হতো না। পুলিশ রিমান্ডে একজন গ্রেফতার হওয়া লোককে নিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এই নির্যাতন বাঙলাদেশের সংবিধান অনুযায়ীও করা যায় না। কিন্তু সরকার যেভাবে

www.pathagar.com

সংবিধান লঙ্ঘন করে এখন নানা কাজ করছে, এর দৃষ্টান্ত একমাত্র ফখরুদ্দীন সরকারের আমল ছাড়া অন্য কোন আমলে পাওয়া যায় না। এভাবে আটক ব্যক্তিদের রিমান্ডে নেয়া সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। ফখরুদ্দীন সরকারের মতো বর্তমান সরকারও অনুরূপ ফ্যাসিবাদী চরিত্র পরিগ্রহ করার কারণেই এরকম ঘটছে।

মাহমুদুর রহমানকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তার ওপর যে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে, তার বিবরণ তিনি আদালতের সামনে দিয়েছেন। এ বিবরণ দিয়ে তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেছেন যাতে আবার তাকে রিমান্ডে না দেয়া হয়। কিন্তু তার আবেদন অগ্রাহ্য করে তাকে আবার রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। প্রথমবার তাকে রিমান্ডে দেয়ার সময় আদালত তার ওপর নির্যাতন না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ আদালতের সে নির্দেশ অমান্য করে মাহমুদুর রহমানের ওপর নির্যাতন করেছে। একথা তিনি আদালতের সামনে বলা সত্ত্বেও এজন্য পুলিশকে জবাবদিহি করতে বলা হয়নি। উপরন্তু মাহমুদুর রহমানকে আবার রিমান্ডে পাঠানো আছে। শুধু মাহমুদুর রহমানই নয়, যে কোন গ্রেফতার হওয়া লোককে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাধারণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালত কর্তৃক পাইকারি হারে পুলিশের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করার বিষয়টিও রীতিমতো বিস্ময়কর।

আমার দেশ পত্রিকা তাদের প্রকাশনা পুনরায় চালু করার জন্য হাইকোর্টে যে মামলাটি করেছিল তাতে আদালত সরকারী নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে প্রকাশনা চালু করার এবং প্রেসের তালা খুলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই রায়ের ওপর ভিত্তি করে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে অন্য প্রেস থেকে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সরকারের পাল্টা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্টের চেম্বার জজ আমার দেশ প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছেন। কাজেই পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়ে আবার বন্ধ হয়েছে। হাইকোর্ট এখন এক মাসের জন্য বন্ধ। কাজেই পত্রিকাটি অন্তত আরও এক মাস বন্ধ থাকবে।

বাঙলাদেশে শাসন ব্যবস্থা এখন এভাবেই চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, চুরি, চাঁদাবাজিসহ সব সম্ভাব্য রকম দুর্নীতির কবলে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন এখন দুর্বিসহ হয়েছে। তার ওপর পুলিশ ও র‍্যাবের ক্রসফায়ারে হত্যাকাণ্ড থেকে নিয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলা জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। বর্তমান সরকার চিরদিন গদিনসিন থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বেপরোয়াভাবে জনগণের ওপর নিজেদের শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে তাদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে তাদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া যে তাদের দেখতে হবে এবং এ প্রতিক্রিয়া যে ক্রিয়ার মতোই প্রচণ্ড হবে এতে সন্দেহ নেই। ১৭ জুন অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে মহিউদ্দিন চৌধুরীর পরাজয় এটা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছে।

যুগান্তর : ২০.০৬.২০১০ ১৮.৬.২০১০

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর

প্রশ্ন : বিরোধী দল সরকার পতনের যে আন্দোলন করে চলেছে এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য–

এখন যা কিছু হচ্ছে সবই তো নির্বাচনমুখী। নির্বাচনেরও নানা রকম সংকট দেখা যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার দরকার, নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তন দরকার। এসব নিয়ে সরকার ও বিরোধীপক্ষের ঝামেলা হচ্ছে এবং নির্বাচন হবে কিনা সেটাই বলা মুশকিল। নির্বাচন যাতে হয় সে জন্য চেষ্টা করছে কোন কোন মহল। অন্যদিকে এনজিও মিলে নাগরিক কমিটি করেছে। সুশীল সমাজ করেছে। তাদের কথা শুনে মনে হয় মুখে বললেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হলেই শান্তি আসবে। এসব নানা সরলীকরণ চলছে। এসবের মধ্য দিয়ে বিরাট কনফিউশন তৈরী হচ্ছে। আসলে মানুষের যে সমস্যা, দৈনন্দিন যে সমস্যা, বড় বড় যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো থেকে যাতে তাদের দৃষ্টি দূরে থাকে এজন্য শুধুমাত্র নির্বাচনের দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রশ্ন : সুশীল সমাজের কথা বলছিলেন– এদের প্রচেষ্টাকে কিভাবে দেখেন?

সুশীল সমাজ সাম্রাজ্যবাদ যা চায় সেটা করছে তারা। সব সাম্রাজ্যবাদের পয়সা খাওয়া লোক। যত এনজিও আছে বাইরের পয়সায় চলে। যেমন সিপিডি থেকে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন যে, এখানে অন্য কারও কোন টাকা-পয়সা দিতে হবে না। সিপিডি পয়সা কোথা থেকে পায়? কাজেই বাইরের পয়সায় এসব হচ্ছে। বড় বড় জায়গায় মিটিং হচ্ছে। যারা মিটিং করছে তারা নিজেরাই হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত। এর মধ্যে অনেকে আছে আগে হয়তো আমলা ছিল, এরশাদের আমলে মন্ত্রী ছিল। বুদ্ধিজীবীও আছে দুই-তিন জন। কিন্তু তাদের করার কিছু নাই।

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়গুলো কি?

গণতন্ত্র তো হাতের মোয়া না যে চাইলাম আর হলো। বাঙলাদেশ হওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে এখানে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। '৭৩ সালে নির্বাচন হয়েছিল– সেখানেও গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না। শেখ মুজিবের সময়ও ছিল না।

প্রশ্ন : বাঙলাদেশ হওয়ার পর কোন কার্যকর বাম আন্দোলন আমরা দেখতে পাইনি–

বাম আন্দোলন, বামপন্থি কে– সেটাই দেখার বিষয়। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি বামপন্থী বলে যে দলগুলো পরিচিত, এদের মধ্যে বামপন্থি উপাদান বলে কিছু নেই। এরা সব নির্বাচন নিয়েই আছে। যারা এদিক-সেদিক আছে সমাজের মানুষের সঙ্গে এদের যোগাযোগ নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। একসঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : অভিযোগ আছে বাম দলগুলো বড়দলের লেজুড়বৃত্তি করে–

লেজুড়বৃত্তি তো এমনি করে না। ওরা হচ্ছে দুর্বল। ফলে ওদের আর একজনের পেছনে থেকে কাজ করতে হয়। এরা হচ্ছে দক্ষিণপন্থিদেরই একটি অংশ। যদি তারা সত্যিই বাম আদর্শের হয় তাহলে লেজুড়বৃত্তি করবে না। লেজুড়বৃত্তি করে তারাই যারা ওই শ্রেণীরই অন্তর্গত এবং তারা সাম্রাজ্যবাদেরই অংশ। এখন সিপিবিতে যারা আছে তারা বলে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। অন্য বাম দলগুলোও বলে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। কিন্তু তাদের নেতা হচ্ছে আওয়ামী লীগের, যারা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। যারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ যখন মিটিং করে তখন সঙ্গে তারাও থাকে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যারা জোট গঠন করেছে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একথা বলা যাবে না। আগেও এরকম জোট ছিল, এরশাদের সময় সাত দল ছিল। এর ভিতরেও কিছু বাম দল ছিল, কিছু দক্ষিণপন্থী ছিল।

প্রশ্ন : '৭১-এ বাম দলগুলোর কি অবস্থা ছিল–

'৭১-এ তাদের চরিত্রগুলো সেভাবে উন্মোচিত হয়নি। কারণ তখন একটা অন্যরকম স্ট্রাগল ছিল। জাতীয় আন্দোলন ছিল। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এগুলো কিছুই ধরা পড়ে না। তখন বিদেশী শক্তিকে তাড়ানোর ব্যাপার কাজ করছিল।

প্রশ্ন : বর্তমান অবস্থা কেমন?

বাঙলাদেশের অবস্থা যা হয়েছে এরাই এখন শোষক শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল। এই যে ছাত্র সমাজ, এর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কোন রকম সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। এ ছাত্রদের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে রয়েছে তাদেরও কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। বাম দলগুলোতে যারা আছে তারা শুধু চা খানায় আড্ডা আর কথাতেই পটু।

কানসাটে যেটা ঘটল, সেখানে কোন ছাত্ররা প্রতিবাদে ছিল? আগেকার দিনে এটা হতে পারতো না। নাচোলে ইলা মিত্র যে আন্দোলন করলো সেই '৫০ সালে তখনো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছে। কানসাটে এত বড় ঘটনা ঘটলো ছাত্রদের কোন খবর নেই। এখন রাজনীতির যে অবস্থা এখানে যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিত তাদের তো উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাই নেই। এখানে সংবাদপত্রের ভূমিকাও খারাপ। কারণ সংবাদপত্রগুলো যারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল তাদের সংবাদ ফলাও করে প্রচার করছে। অন্যান্য সবরকম প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন সংবাদ তারা প্রচার করছে না। যেমন আমরা যেসব মিটিং করি, বিবৃতি দেই তার কোন সংবাদই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না। আমরা '৭৩ সালের অক্টোবরে এত বিশাল এক কনভেনশন করলাম, ঢাকার কাগজে সে খবর এলো না। একটা দুটা কাগজে দায়সারা কোন রকম খবর প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ অফিসে বসে কতগুলো বামপন্থি সংগঠন আছে একটা দুটো কথা বললে, সেগুলো ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। তার কারণ এই জন্যই করছে, তারা কাগজ ওলাদের সঙ্গে এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। আবার তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অতো সোজা না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পক্ষের-বিপক্ষের শক্তি বলতে কাদের বোঝেন?

দুটোই বাজে জিনিস। স্বাধীনতার পক্ষের এবং বিপক্ষে এই দুই দলই জনগণের বিরুদ্ধে। যারা এসব কথা বলে তারাই জনগণের বিরুদ্ধে। কে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ছিল '৭১ সালে, কে বিপক্ষে ছিল এ দুটোই অপ্রাসঙ্গিক। এখন স্বাধীনতার পক্ষের, যেমন আওয়ামী লীগ বলে তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি কিন্তু আমেরিকানদের স্বার্থে তারা নিজের দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা কি সাম্রাজ্যবাদী তেল-গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেনি? ২৩টা ব্লকে যে ভাগ করে দিয়েছে এটা আওয়ামী লীগ দিয়েছে। কাজেই কথা হচ্ছে, এখানে তারা কি আগে চুক্তি করেনি। আগে চুক্তি মানে দেশ বিক্রি। কাজেই সেই '৭১ সালে কি হয়েছে, কে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, কে বিপক্ষে তা নির্ণয় নিষ্প্রয়োজন। বরং এখন তারা কি করছে সেটাই বিবেচ্য। তো সেদিক থেকে যদি দেখা যায় যত রকম সরকার সবই স্বাধীনতার বিপক্ষে।

প্রশ্ন : একজন লেখক এবং রাজনীতিক কোন্ পরিচয়টি আপনাকে কাছে টানে?

রাজনীতিক এবং লেখক বলে কিছু নেই। আমি যে লিখি, সেটা রাজনৈতিক প্রয়োজনেই লিখি। এ দু'য়ের মধ্যে তো কোন দেয়াল নেই।

প্রশ্ন : এটাকে কি পলিটিক্যাল লিটারেচার বলা যায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই।

প্রশ্ন : পলিটিক্যাল লিটারেচারের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে হাতেগোনা কিছু লেখক ছাড়া নোতুন লেখক আসছে না কেন?

কারণ তারা লিখছে না। সব ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে বখশিশ নেয়। বড় বড় নেতার কাছ থেকে বখশিশ নেয়। তারা কি লিখবে। এসব তো সমাজের একটা অবস্থা থেকে তৈরী হয়। সমাজ নিয়ে যাদের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই তারা আবার কি লিখবে। তারা বড় জোর বসে বসে কবিতা লিখবে। রাস্তাঘাটে জোড়ায় জোড়ায় বসে প্রেম করবে। কবিতা লিখবে। আর কাগজে যা বের হয় তা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে দু'চারজন হয়তো এদিক ওদিক কিছু লিখছে।

প্রশ্ন : লেখকের সামাজিক দায়িত্ব এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ– দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন কিভাবে?

দু'য়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু দেখি না। অসামঞ্জস্য থাকলে তো সামঞ্জস্য রক্ষা হবে কিনা সে প্রশ্ন আসে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন লেখক এবং রাজনীতি করছে, তো যিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তিনিই তো সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন। অন্যান্য যেসব যারা লিখেছে, এই ধরুন লেলিন। লেলিন কি সাহিত্য করতে নেমেছিল? রাজনীতি করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে তিনি লিখেছেন। তার লেখার মধ্যে ৯০ ভাগ হচ্ছে প্র্যাক্টিকেল রাজনীতির প্রয়োজনে লেখা। বাকি ১০ ভাগ যা আছে তাও কোন না কোনভাবে রাজনীতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত। দর্শনের ওপর তিনি যখন লিখেছেন, তখনও তাই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি লিখতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?

প্রতিবন্ধকতা একটাই– লোকের মিথ্যা কথা। প্রতিবন্ধকতা বলা যাবে না। সুবিধা, অসুবিধা যেটা সেটা হলো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। যেসব লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তখন তো টেপ রেকর্ডার ছিল না, পুরোটাই নোট করতে হয়েছে, সেসব সমস্যা ছিল। আর অসুবিধার মধ্যে যেটা সেটা হলো লোকদের মিথ্যা কথা। যেসব লোকের ইন্টারভিউ করা হচ্ছিল তারা নিজেকে বড় করে দেখাচ্ছে, অন্যকে ছোট করছে। বানিয়ে বানিয়ে ঘটনা বলা এসব সমস্যা হয়েছে।

প্রশ্ন : নব্বই দশকে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত হওয়া নিয়ে দেশে-বিদেশে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিলন। পরে তা এদেশে নিষিদ্ধ করা হয়–

এটা ব্যান্ড করে দেয়া হলো, আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবরের ভূমিকার কথা থাকার জন্য। '৪৮ সালে শেখ মুজিবের ভূমিকা সে রকম ছিল, যে রকম আর পাঁচ-দশজনের ছিল। '৫২ সালে তো জেলেই ছিল। অথচ তারা বলে যে, শেখ মুজিবই এই করেছে সেই করেছে। সেই কথাই ওখানে বলা হয়েছে। মূল কথা কিছু ছিল না। যেহেতু শেখ হাসিনা সে সময় প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, যখন তারা খবর পেল দেশ পত্রিকায় সেটা বেরিয়েছে, তখন তারা বর্ডারে সেটা আটক করলো। এখানে ঢুকতে দিল না। কিন্তু তারপরেও সেটা এখানে চলে এসেছিল এবং অনেক কাগজে প্রিন্ট হলো। এই মানবজমিনেও সেটি ছাপা হয়েছিল। আরও অনেক কাগজে ছেপেছিল। ৩০ হাজার দেশ পত্রিকা এলে তাদের সমস্যা হতো অথচ এদেশে অনেক কাগজে সেটা ছাপা হলো, লাখ লাখ কপি বাজারে বিক্রি হলো। উল্টো ফল হলো। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে নাচে। Who is জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান কে যে এভাবে তাকে নিয়ে নাচতে হবে।

প্রশ্ন : ইতিহাস বিকৃতিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

ইতিহাস বিকৃত যারা করছে তাদের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। মূর্খ এগুলো। রাস্তার কতগুলো কর্মী, যারা কিছুই জানে না। আওয়ামী লীগের এরকম চার-পাঁচজন নেতা, বিএনপি'র এরকম কয়েকজন এ ওর সম্বন্ধে আবোল-তাবোল বলছে। এ ওকে বকছে। এরা সকলে বিকৃত করছে। বিকৃত করছে বলাও ঠিক না। মিথ্যা কথা বলছে। এরা হচ্ছে ইতিহাসের সম্বন্ধে কিছু জানেই না। ইতিহাস সঠিক না বেঠিক এসব যাচাইয়ের দায়িত্ব পড়েছে এসব মুর্খ রাজনীতিবিদদের ওপর। ইতিহাসের লোকেরা এখানে বিশেষ কিছু বলে না।

প্রশ্ন : আপনার দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন বহুধাবিভক্ত। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

কমিউনিস্ট আন্দোলন বহুধাবিভক্ত নয়। কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে কিছু নেই। যারা কমিউনিস্ট বলছে তাদের আচরণে কমিউনিস্ট বলে কোন কিছু নেই। যা ছিল আগে সেটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি তো বলি আমরা ছাড়া কেউ নেই। কমিউনিস্ট

www.pathagar.com

আন্দোলনের যোগ্য আর কেউ নেই বাঙলাদেশে। সিপিবিসহ ইত্যাদি কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশন যেসব কথাবার্তা বলে, কখনও আওয়ামী লীগের সঙ্গে লাইন, কখনও বিএনপি'র সঙ্গে লাইন। যার তার সঙ্গে দেখা করছে, নানা রকম কথাবার্তা বলছে, এমন সব জায়গায় যাচ্ছে যেগুলো কিনা কমিউনিস্টদের আচরণ হতে পারে না। আমাদেরকে বলে আমরা নাকি রাস্তায় নামি না। আমরা রাস্তায় নামি না কে বলেছে। রাস্তায় নামি এটা বলায় তাদের সুবিধা হয় এই যে, আমাদের রিপোর্ট তাদেরকে দেয়া হয় না। তাই তারা বলে যে আমরা রাস্তায় নামি না।

প্রশ্ন : বাঙলাদেশের সংস্কৃতির ধারা কেমন বলে মনে করেন?

বাংলাদেশের সংস্কৃতি অতি নিম্নমানের এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এখানে সংস্কৃতির সবচেয়ে যেটা বড় দিক– আচরণগত সংস্কৃতি, এটার অভাব। কারণ দেখা যাবে একটা লোক হয়তো ভাল ছবি আঁকে। গান গাইছে, কিন্তু আচরণগত ক্ষেত্রে তার রুচি অতি নিম্নমানের।

প্রশ্ন : আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি?

রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এ সম্পর্কে সম্প্রতি আমি যুগান্তরে লিখেছি। এই যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন, বিশেষ করে দুই নারী নেত্রী, এদের একজন আরেকজনের সঙ্গে বসে কথা বলার মানসিকতা পর্যন্ত রাখে না। এগুলোকে আমি বলি কি গ্রাম্য রাজনৈতিক বর্বরতা। গ্রাম্য মোড়লের মধ্যে যেটা দেখা যায়। মোড়লরাও বোধ হয় এর চেয়ে ভাল। মোড়লরাও একটা সামাজিক নিয়মের মধ্যে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

এই যে বর্বরতা, এটা আওয়ামী লীগের এবং বিএনপি'র নেতা-পাতিনেতা এদের মধ্যেও আছে। এরা হচ্ছে যে, বড় নেতাদের চাকরি করে। ওদেরটা হচ্ছে এক ধরনের চাকরি। ওরা যেসব কথা বলে, নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই মন্তব্য নেই। উপর থেকে যা বলছে তাই এরা জ্বি হুজুর বলে সায় দিচ্ছে।

প্রশ্ন : সংস্কৃতির আগ্রাসন সম্পর্কে আপনার মত কি?

আগ্রাসন বলতে কি– এখন যা চলছে তার তো কোন মান নেই। টেলিভিশনে যেসব অনুষ্ঠান হচ্ছে, এগুলোতে যে ধারাবাহিক নাটক বলে যেগুলো দেখানো হয় এগুলো তো কোন নাটক নয়। স্বাধীনতার পর নাটকের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তখন যারা নাট্য আন্দোলন বলে কিছু শুরু করেছিল, এখন তারা আছে পয়সা কামানোর তালে। প্রত্যেকটা নাটকের যারা বড় কর্তা, মেজো কর্তা, সেজো কর্তা সব হচ্ছে এরা পয়সাওয়ালা। এই যখন অবস্থা হয়েছে কালচারাল এরিয়াতে– এতো খুব মন্দ অবস্থা। এই ধরো, যখন ছায়ানটে বৈশাখী অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন কানসাটে পুলিশ গুলী করে দু'জন মেরে ফেলেছে। তো ওইখানে গান গাওয়া হলো। কিন্তু একটা প্রতিবাদ বা ব্যাখ্যাও তারা সেখান থেকে উচ্চারণ করেনি। এর আগের বছরেও সাভারে ছয়তলা ভবন ধসে পড়েছিল। এটাও পহেলা বৈশাখে। এখানে বৈশাখী অনুষ্ঠান যখন হচ্ছিল তখন শত শত লোক চাপা পড়েছিল।

www.pathagar.com

যা বলছিলাম, যেই রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হয়, তিনি তো পাঞ্জাবের গুলি হওয়ার ঘটনায় নাইট উপাধি বর্জন করেছিলেন। তো রবীন্দ্রনাথ এখন যদি বেঁচে থাকতেন এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

প্রশ্ন : অপসংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব কিভাবে?

রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া অর্থনীতি বলো, সংস্কৃতি বলো, কোন কিছুই পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন : সাম্প্রদায়িকতা নিয়েতো আপনি অনেক লেখালেখি করেছেন–

সাম্প্রদায়িকতা নিজে কোন সমস্যা না। অন্য সমস্যা থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেদিন নিজামী বলেছেন, আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে কেন? আমরা তো হিন্দুদের জমি দখল করতে যাইনি। হিন্দুদের জমি দখল করেছে আওয়ামী লীগ। কাজেই এখানে যারা অসাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলছে তারাই আবার সাম্প্রদায়িক আচরণ করছে। কথা হচ্ছে, তারা সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলে যাতে করে সাম্প্রদায়িকতা দুর্বল না হয়ে আরও বেড়ে ওঠে। এটা হচ্ছে সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতা যতই সে বলে, ততই জামায়াতে ইসলামী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমি এমন করিনি। সেই ১৯৬০ সালে আমি তো কাউকে ছেড়ে কথা বলিনি। এখন যারা বড় বড় কথা বলেন, তখন একটা প্রাণীকেও পাওয়া যায়নি। তখন যে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছিল তার দ্বারা তো সাম্প্রদায়িকতা শক্তিশালী হয়নি বরং দুর্বল হয়েছিল। যেভাবে বলা হয়েছিল এবং দু'চারজন বললেই হতো। সমাজে সাম্প্রদায়িকতার কোন ভিত্তি ছিল না, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিটা সমাজের মধ্যেই থাকে। সেই ভিত্তিটা তখন ছিল না। বাঙলাদেশ হওয়ার পর শুরু হয়েছে লুটপাট করার জন্য। ইনডিয়াতে যা হচ্ছে বিধানসভার নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক মুসলমান অংশ নিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা সেখানেও আছে। তো সেখানে হিন্দু মেরে ফেললে এখানে হৈ চৈ করে। কিন্তু গুজরাটে যে মুসলমান মেরে ফেলছে তার কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না। কাজেই এদের সাম্প্রদায়িকতা মানে ফায়দা খোঁজা। এদের কথা কোন কাজে আসে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ হওয়ার পরতো সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যততো পরে। আগে দেখতে হবে এদের উত্থানটা কেন হলো? জামাতের উত্থানটা কিভাবে হলো যারা এখানে ক্ষমতায় এসেছিল এদের প্রশ্রয়ের কারণে জামায়াতের উত্থান হয়েছে।

তুমি যদি জনগণের জন্য কাজ না করে, ক্ষমতায় বসে মাদ্রাসাগুলো ব্যবহার করো, তাহলে এমন হবেই। শেখ মুজিবই তো মাদ্রাসাগুলোকে ব্যবহার করেছেন। কিছু ভাল মাদ্রাসা রেখে বাকি যে মাদ্রাসা আছে সেগুলো তুলে দেয়া উচিত। তো এটা না করে শেখ মুজিব মাদ্রাসাগুলোতে অনুদান বাড়িয়ে দিলেন। এরপর থেকে মাদ্রাসা সংখ্যা বাড়তেই আছে।

পশ্চিমবাংলায়ও মাদ্রাসা আছে। পশ্চিমবাংলার মাদ্রাসাগুলোতে বেশীরভাগ শিক্ষক হচ্ছেন হিন্দু। ওখানে যারা ছাত্র তাদের সিলেবাস অনেক আধুনিক। কিছু ধর্মের জিনিস

www.pathagar.com

পড়ার পাশাপাশি অন্য বিষয়গুলোও থাকে। এখানের মাদ্রাসাগুলো জঘন্য, এখানে তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়। এখানে সব জিনিস পড়ায়, তাতে করে কোন শিক্ষিত মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। যত রকম কুশিক্ষার ব্যবস্থা। তাদের সংখ্যা তো বাড়ছে। জামায়াতের জাগরণ তো ছাত্রশিবিরের জাগরণের জন্য।

জিয়াউর রহমান এর সময় সিলেবাস চেঞ্জ করা হয়। আসলে সিলেবাস কিছুই চেঞ্জ হয়নি এবং তাদের কোন শিক্ষা হলো না। কিন্তু তাদের সুযোগ হয়ে গেল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার। আগেতো মাদ্রাসার ছেলেরা ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারতো না। জিয়াউর রহমান এর সময় সিলেবাস পাল্টে মাদ্রাসার ছেলেমেয়েদের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরী হলো। এতে করেই তো জামায়াত-শিবিরের প্রসার সম্ভব হলো।

প্রশ্ন : বাম দলগুলোর চেয়ে তো জামায়াত এগিয়ে রয়েছে। এর কারণ–

তথাকথিত বাম দলগুলো জনগণের জন্য কাজ করছে না। এখন ছাত্রশিবির যেটা, এটা সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন। সবচেয়ে শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় আছে। বিএনপি'র যে ছাত্র দল আছে তার কেউ তো এটা মানছে না। এসব থেকে লোকের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। লোকে মনে করে যে, আওয়ামী লীগ করে কোন লাভ নেই, বিএনপি করেও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল এদের সঙ্গে থাকলে পরকালে কিছু পাওয়া যাবে।

এখানে কিছু হবে না, বেহেস্তে গিয়ে যা পাওয়া যায়– এতে করে জামায়াতের দিকে মানুষের দৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু যখন কানসাটের মতো ঘটনা ঘটে দেখা যাবে যে, এসব জামায়াত-শিবিরের কোন ভূমিকা নেই এবং আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক নীতির দ্বারা এদের দূর করা যাবে না।

প্রশ্ন : জামায়াতের আক্রমণের লক্ষ্য তো কমিউনিস্ট প্রগতিশীল তত্ত্ব– তো এদের দ্বারা কতটুকু ক্ষতি হতে পারে?

ক্ষতি আবার কতটুকু! এদের টার্গেটই তো প্রগতিশীলরা। আমি তো বলেছি, প্রতিরোধ করতে হলে আন্দোলন করতে হবে। জনগণের আন্দোলন ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্টের রেভুলেশন-এর মাধ্যমে এগুলো কিছুই থাকবে না। আমি বলি তোমাকে, এটা করলে রাতারাতি এগুলো যাবে। লোকে টুপি ফেলে দাড়ি কামিয়ে কিংবা দাড়ি যদি থাকে তাতেও অসুবিধা নেই। মোটকথা অবস্থার পরিবর্তন হবে।

প্রশ্ন : ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন–

এভাবে তো ধর্মের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা যায় না। নিষিদ্ধ করার জন্য সেই রকম ক্ষমতা দরকার : কে নিষিদ্ধ করবে। মিসেস জিয়া করবেন, না হজ করে মাথায় পট্টি বাঁধা হাসিনা করবেন? এদের দ্বারা এসব হবে না। এরাই তো এগুলো ব্যবহার করে। কাজেই নিষিদ্ধ করতে হবে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, লেখা একটি সামাজিক কাজ, এর দ্বারা কি সমাজ পরিবর্তন সম্ভব?

লেখা সামাজিক কাজ, এ তো এটা ক্রিয়েটিভ লেখা হতে পারে। যাতে সমাজ

www.pathagar.com

পরিবর্তন না হয় তার জন্য লেখা হতে পারে। কাজেই লেখার মাধ্যমেই তো সবকিছু হয় না। কি উদ্দেশ্যে লিখছে কি লিখছে কে লিখছে সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই লিখলেই তো হলো না। একটা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। জামায়াতে ইসলামীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

প্রশ্ন : এখন তো সমাজতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের কথা বলেন?

আমিও তো বলি গণতন্ত্রের কথা। সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নেই এটা তোমাকে কে বলেছে।

প্রশ্ন : সেটাতো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র-

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র একটা বড় দিক। এখানে গণতন্ত্র বলে যেটা হচ্ছে সেটা শুধু ভোট দেয়ার ব্যাপার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হচ্ছে যে সকলের অধিকার। সকলের চাওয়া-পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে। সকলের থাকার জায়গা থাকতে হবে। সকলের কাপড় থাকতে হবে, শিক্ষা থাকতে হবে। সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে হবে। এটাই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মানে শুধু কথা বলা, আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব, এটাইতো গণতন্ত্র না। এটা কোন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র না।

প্রশ্ন : কানসাটে যেটা ঘটেছে। সেটাকে কি অবিকশিত বিপ্লবী প্রবণতা বলা যায়?

ঠিক অবিকশিত নয়। এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। এটার ওপর আমি লিখেছি তো, যে কতগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয় এবং এ ধরনের আন্দোলন কোন অবস্থায় হয়। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয়, যেখানে কিছু চাহিদা রয়েছে, কিছু দাবি রয়েছে সেই দাবিতে। কিন্তু সেই দাবিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি থাকে না, তখনই জনগণের আন্দোলন হয়। কানসাটে তাই ঘটেছে। এবং কানসাটের আন্দোলনটায় কোন রাজনৈতিক দল জয়েন্ট করতে পারেনি। এই যে শনি আখড়াতে হয়েছে। একটা ছেলে, কি যেন নাম, মাসুদ, ছাত্র ইউনিয়নের ছেলে, তো সেখানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয়েছে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে একটা ব্যাপার কাজ করায় সেটা ক্রোধে পরিণত হয়েছে। তার পর আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে।

প্রশ্ন : আপনি সম্প্রতি ইত্তেফাকে এক লেখায় ড. ইউনুসকে উন্মাদ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার কার্যক্রমের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের আশংকা রয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন–

আমি বলেছি, সে যে কাজ করছে, সাধারণভাবে বিচার করলে সেটা উন্মাদের মতো মনে হয়। সে বলছে যে, এক মাসের মধ্যে সমস্ত নমিনেশন দিয়ে দিতে হবে। তিন মাসের মধ্যে নমিনেশন দিতে যেখানে বড় বড় দলগুলো হিমশিম খায়, সেখানে সে এক মাসের মধ্যে নমিনেশন দিয়ে দেবে। তা সেই এক মাস অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। তাও আবার দুটো করে। একটা পুরুষ, একটা মহিলা– এই কথা যে বলছে তাকে উন্মাদ বলতে হবে। কেউ যদি তাকে উন্মাদ বলায় রাজি না হয় তবে বলতে হবে প্রতারক। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে। আমি যেটা বলেছিলাম যে, এই কথাগুলো উন্মাদের মতো। আর কেউ যদি তা না বলতে চান একটাই বিকল্প আছে– সেটা হলো প্রতারক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ড. ইউনুসের কার্যক্রমকে কিভাবে দেখেন–

আমি লিখেছিলাম ড. ইউনুসের দারিদ্র্য বাণিজ্য নামে, এখানে যে সুদি কারবার করছে। সে গ্রামের পরিবর্তনের কথা বলে। একথা, সেকথা বলে আসলে সে দুনিয়ার বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এবং তারা দুনিয়াতে ২৫ জন সফল ব্যবসায়ীর মধ্যে ড. ইউনুসের নাম প্রকাশ করে বেড়ায়। একজন গরিবের বন্ধুর পক্ষে কি সম্ভব, এসব গরিব ঠকিয়ে যে খায় তার পক্ষে সম্ভব।

প্রশ্ন : এনজিও সরকার প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায়, এটা কি শুধুই গুজব?

না, এনজিও সরকার সম্ভব নয়। এনজিওরা নানা রকম কলকাঠি নাড়তে পারে। চক্রান্ত করতে পারে। এনজিও সরকার সম্ভব না।

প্রশ্ন : সামনে তো নির্বাচন, এ সম্পর্কে আপনার বিবেচনা কি?

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জিতুক আওয়ামী লীগ জিতুক এতে কারও তেমন কিছু হবে না। যেমন বিদ্যুৎ নিয়ে, পানি নিয়ে, গ্যাস নিয়ে যা হচ্ছে, এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দু'এক মাসের মধ্যে তাদের অবস্থাও তাই হবে। কাজেই নির্বাচনের মাধ্যমে এমন কোন পরিবর্তন হবে না যাতে দেশের জনগণ সমস্যামুক্ত হয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃতির ওপর ধর্মের প্রভাব– এ সম্পর্কে কি বলবেন?

ধর্মের প্রভাব সবকিছুর ওপরই ক্ষতিকর। শিক্ষার ওপর ক্ষতিকর, সংস্কৃতির ওপর ক্ষতিকর। এটা সংস্কৃতির অগ্রসরতাকে রোধ করে, আবার ধর্মীয় সংস্কৃতির কথা যারা বলছে তারাই আবার মিথ্যাবাদী, ঠক, প্রতারক। তারাই মেয়েদের সঙ্গে বাজে আচরণ করে। তার মধ্যে ভাল লোক আছে। ভাল লোকের কোন জায়গা নেই। কিন্তু সাধারণভাবে যারা লম্বা চওড়া করে কথা বলে ধর্মীয় সংস্কৃতির কথা বলে, এদের মধ্যে ৯৯টা হচ্ছে বদমাইশ।

প্রশ্ন : উত্তরাধিকারের রাজনীতি এটাকে কিভাবে দেখেন?

এটা পশ্চাৎপদতার একটি লক্ষণ এবং করে কোনো সময় সুবিধা হয়নি। এটা আন্ডার ডেভেলপ দেশগুলোতে বেশী চলে। ভারত, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় আছে। বাংলাদেশের নূতনদের নিয়ে এই লাফালাফি করে।

মানবজমিন : ২৫.০৬.২০০৬

www.pathagar.com

হরতাল প্রসঙ্গে

২৭ জুন ২০১০-এ বিএনপি হরতাল ঘোষণার পর থেকে এর সমর্থনে এবং তার থেকেও বেশী এর বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি, বিবৃতি, সভা-সমিতি, মিছিল ইত্যাদি হয়েছে। এসব হৈচৈ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এটা এমন এক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যা নিয়ে মাতামাতি করে নাকের ডগায় অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ধাপাচাপা দেয়া বা খর্ব করা চলে। বাস্তব ব্যাপারটা সে রকমই দাঁড়িয়েছে।

হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। একথা সব পক্ষ স্বীকার করলেও কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দল ও তাদের সরকার বিরোধী পক্ষের যে কোন হরতাল প্রতিরোধ করার জন্য দলীয় শক্তির সঙ্গে সরকারী শক্তি ব্যবহার করে। অন্যদিকে যারা হরতাল আহ্বান করে তারা গণতান্ত্রিক হরতালের শর্ত লঙ্ঘন করে তা কার্যকর করার জন্য জোরজবরদস্তির আশ্রয় নেয়। এর ফলে হরতালের সময় প্রায়ই এক মারদাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং এতে অনেক লোক হতাহত পর্যন্ত হয়ে থাকে।

হরতাল রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি উপায় বা পদ্ধতি। যখন কোন দল হরতাল ডাকে, তখন তার সাফল্যের জন্য শুধু তাদের দলীয় লোকদেরই অংশগ্রহণ তারা আশা করে না। তারা আশা করে, সাধারণভাবে মানুষ তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে হরতাল সফল করবে। এ আশা যদি তাদের না থাকে তাহলে হরতাল সাধারণত আহ্বান করা হয় না। হরতালে যদি এভাবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে, তাহলে কাউকে হরতালে অংশ নিতে বাধ্য করার প্রশ্ন ওঠে না। এ কারণে হরতাল যারা আহ্বান করে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ওপরই তাদের নির্ভর করা দরকার। কারণ এর দ্বারা তাদের নিজেদেরও বোঝার সুবিধা হয়, জনগণের সমর্থন কতটা পক্ষে এবং কতটা তাদের প্রতিপক্ষ সরকারের পক্ষে।

সরকারের দিক থেকেও হরতালের ব্যাপারে এই একই দৃষ্টিভঙ্গি গণতান্ত্রিক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। নির্বাচন ছাড়া অর্থাৎ নির্বাচনের বাইরে হরতাল সরকার পক্ষের অবস্থান বোঝার একটা উপায়। কাজেই নিজেদের পক্ষে জনসমর্থন যাচাইয়ের জন্যও সরকারী দল ও সরকারের প্রয়োজন নির্বিঘ্নে হরতাল পালিত হতে দেয়া।

কিন্তু বাঙলাদেশে গণতন্ত্র কোথায়? বাঙলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই এদেশে গণতন্ত্র অনুপস্থিত। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে যা পাওয়া যায় তা হলো নির্বাচিত সরকারের গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র অথবা সরাসরি সামরিক শাসন। এ দুই ধরনের শাসনই হল ফ্যাসিবাদের বৃন্তে দুই ফুলের মতো। শাসনব্যবস্থার এই চরিত্র শাসক শ্রেণীর চরিত্রেরই প্রতিফলন। এই শাসক শ্রেণী

www.pathagar.com

বলতে শুধু সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল ও লোকজনকেই বোঝায় না, বিরোধী দলসহ ধনিক শ্রেণীর সমগ্র অংশই এর অন্তর্গত। এ কারণে যে দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সে দলই তার পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষের মতো আচরণ করে। এর দ্বারা তাদের সবার শ্রেণীগত ঐক্য এবং অভিন্নতাই প্রমাণিত হয়।

১৯৯১ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচিত সরকার ও বিরোধী দল অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে হরতালের ক্ষেত্রেও একই আচরণ করে এসেছে। বিরোধী অবস্থানে থাকলে হরতাল আহ্বান, হরতাল পালনের জন্য মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর নির্ভর না করে অল্পবিস্তর জোরজবরদস্তির আশ্রয় গ্রহণ করা এবং ক্ষমতায় থাকার সময় বিরোধী পক্ষের হরতাল বন্ধ করার জন্য দলীয় লোকজন ও পুলিশের সহায়তায় ফ্যাসিস্ট কায়দায় বিরোধী পক্ষের ওপর আক্রমণ।

হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও এর যথেচ্ছ ও বাড়াবাড়ি ব্যবহার শুধু যে হরতালের রাজনৈতিক কার্যকারিতা হ্রাস করে তাই নয়, এর ফলে অনেক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। এটা বোঝার অসুবিধা যে শাসক শ্রেণীর প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের আছে, এমন নয়। তারা বারবার অঙ্গীকার করে হরতাল না করার। কিন্তু বিরোধী অবস্থানে যে দলই আসুক, তারা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে হরতালকেই নিজেদের আন্দোলন কর্মসূচির প্রধান অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করে।

২৭ জুনের বিএনপি আহূত হরতাল নিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে এখানকার বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী খুব স্পর্শকাতর দেখা যাচ্ছে। তারা বিএনপি'র হরতালের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর হুমকি দিচ্ছে। হরতাল আহবানকারী বিএনপিও পাল্টা হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, হরতালে বাধা দিলে লংকাকাণ্ড হবে। হরতাল প্রতিহত করার আহ্বান গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন আহ্বান নয়। কিন্তু ২৫ জুন ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে হরতাল প্রতিহত করুন, জঙ্গীবাদ রুখে দাঁড়ান শীর্ষক এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের নেতারা প্রকৃতপক্ষে এ আহ্বান জানিয়ে হরতাল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৬.৬.২০১০)। এই উস্কানি শুধু যে দলীয় কর্মী ও লোকজনকেই দেয়া হয়েছে, তাই নয়। এর দ্বারা পুলিশকেও হরতাল প্রতিরোধের জন্য প্ররোচিত করা হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, ২৭ তারিখের হরতাল ও জঙ্গীবাদকে একই দড়িতে বেঁধে তা রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে আওয়ামী লীগের উপরোক্ত আলোচনা সভায়। হরতাল ও জঙ্গীবাদকে এভাবে সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপিত করা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক। এর দ্বারা আওয়ামী লীগেরও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ার সম্ভাবনা। কারণ ২৭ জুনের হরতালকে এভাবে দেখলে তার থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের কোন অবকাশ থাকে না যে শিক্ষার কথা ওপরে বলা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা যে এখন দ্রুত কমছে, এতে সন্দেহ নেই। চট্টগ্রামে

www.pathagar.com

মহিউদ্দিনের শোচনীয় পরাজয়কে মূলত ব্যক্তি মহিউদ্দিনের পরাজয় হিসেবে দেখানোর একটা চেষ্টা আওয়ামী লীগ দল ও আওয়ামী ঘরাণার বুদ্ধিজীবীদের আছে। কিন্তু এ পরাজয়ে মহিউদ্দিনের দুষ্ট কর্মকাণ্ডের ভূমিকা যাই থাক, আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন থাকলে তার এই পরাজয় হতো না। এই পরাজয়ের মূল কারণ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের অজনপ্রিয়তার পাল্লা ভারী হতে থাকা। কিন্তু চট্টগ্রাম সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। চট্টগ্রামে জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের যে ব্যাপার ঘটেছে, এটা দেশজুড়েই ঘটেছে। এটাই অন্যতম কারণ, যে জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকায় মেয়র নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিচ্ছে, যদিও বর্তমান মেয়রের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির আলোচনা সভায় ২৭ তারিখের হরতালের সঙ্গে জঙ্গীবাদ যুক্ত করে জঙ্গীবাদকে বাঙলাদেশে যত বড় রকম উপদ্রব হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, আসলে সেটা তত বড় উপদ্রব নয়। যে কোন উপদ্রবকে যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। জঙ্গীবাদ নিয়ে বিশ্বজুড়ে এখন যে প্রচারণা হচ্ছে, সেটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, এ জঙ্গীবাদ তাদেরই অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্যে অনেক দেশেই জন্মলাভ করেছে ও পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও এর অস্তিত্ব আছে। তা নিয়ে বাড়াবাড়ির কোন কারণ বাঙলাদেশে নেই। কিন্তু সেটা না থাকলেও রাজনৈতিক মতলববাজরা তাই করছে।

বাঙলাদেশে জঙ্গীবাদ নামে কথিত উপদ্রব থেকে অনেক বিপজ্জনক হচ্ছে শাসক শ্রেণীর নিজেরই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনে বিজয়ের পর থেকে তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্র লীগ, যুব লীগ ও সেই সঙ্গে খোদ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যে চাঁদাবাজি, টেন্ডারববাজি, ভর্তি-বাণিজ্য, চুরি-ডাকাতি, ঘুষখোরী ও ভূমিদস্যুতা সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে চালিয়ে দেশজুড়ে এক মারাত্মক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, এ নৈরাজ্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। সমাজে এখন অপরাধ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে এ পরিস্থিতি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জয়-পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়ার কোন ক্ষমতা বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর নেই। এদের কোন দলেরই আদর্শ এবং অন্তর্নিহিত শক্তি নেই। কিন্তু এরা নির্বাচনের মাধ্যমে পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় থাকে। এদের একদল যেমন অন্য দলের অপকর্মের কারণে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় বসে, তেমনি এরা শ্রেণীগতভাবে বাঙলাদেশে এখনও ক্ষমতাসীন থাকার কারণ বাঙলাদেশে কোন বিপ্লবী তো নয়ই, এমনিক প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির কার্যকর উপস্থিতির অভাব এবং তাদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সমর্থন।

যুগান্তর : ২৭.০৫.২০১০ ২৬.৬.২০১০

www.pathagar.com

ঈশ্বরদীতে শ্রমিকদের ওপর ফ্যাসিস্টদের একটি হামলা

একটা রাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদ যখন শাসন প্রক্রিয়ার মূল ধরনে পরিণত হয় তখন সেটা শুধু কেন্দ্রীয় বা শীর্ষতম পর্যায়ে এবং সেই পর্যায়ের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ, ফ্যাসিবাদ শুধু শাসনের একটা ধরন নয়, এটা সমাজে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, বিকশিত অথবা অবিকশিত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কতগুলো অমানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটাকে এ ধরনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকটের প্রতিফলন হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। এর ফলে ফ্যাসিবাদী শাসক দলের উচ্চতম থেকে নিম্নতম ও মধ্যবর্তী সব পর্যায়েই দেখা যায়। উচ্চ পর্যায়ের এই আচরণের সংস্কৃতি যখন নিম্নতর পর্যায়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে তখন সমাজে ফ্যাসিবাদ যে ব্যাপকভাবে তার শাখা বিস্তার করে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বাঙলাদেশে এখন এই পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। পরিস্থিতির এই দিকটি যে এখন এক বাস্তব ব্যাপার সেটা উল্লেখ করার জন্যই সম্প্রতি সংঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা দরকার।

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী ধান-চাল ব্যবসায়ের একটি বড় মোকাম। এই মোকাম থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ঈশ্বরদীর চাল ভাঙা কলের চাতাল গুলোতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে থাকেন। এই চাতাল শ্রমিকরা অন্য শিল্পের কর্মরত শ্রমিকদের মতোই মালিকদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে থাকেন। এজন্য তারা নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন। অনেক দিন ধরেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের শরীক সংগঠন বাঙলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের (টাফ) সঙ্গে সম্পর্কিত ঈশ্বরদী থানা চাতাল মজদুর ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজকর্ম ঈশ্বরদীর আইকে রোডস্থ চাতাল এলাকায় পরিচালিত হয়ে আসছে।

গত ১ আগস্ট ২০১০ তারিখে বিকাল বেলায় উপরোক্ত চাতাল মজদুর ইউনিয়নের একটি সভা আইকে রোডস্থ ছলিমপুর কলেজ প্রাঙ্গণে আহ্বান করা হয়। ১৬ দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে এই সভা শুরু হওয়ার সময় ঈশ্বরদী চাল ব্যবসায়ী সমিতির নেতা মজিবর রহমান মোল্লার নেতৃত্বে ব্যবসায়ীদের ১৫-২০ জন লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে চাতাল মজদুর ইউনিয়নের সভায় প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা তাদের সভার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কোন সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে অন্যত্র সরে গিয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মালিকদের লোকজনের সঙ্গে বেশী বাকবিতণ্ডায় জড়িত না হয়ে তারা নির্ধারিত সভাস্থলের পার্শ্ববর্তী লেংড়ার মোড়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেদের সভার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত ব্যবসায়ী লোকজন শ্রমিকদের সভায় হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালিয়ে সভার মাইক, রিকশা ইত্যাদি ভাংচুর করে এবং কয়েকজন শ্রমিককে এলোপাতাড়িভাবে মারধর করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রতিরোধ করতে দাঁড়ালে মালিকপক্ষের লোকজন সভাস্থল ছাড়তে বাধ্য হয়।

পরদিন ২ আগস্ট সকালে ঈশ্বরদী থানার পুলিশ এএসআই মাসুদ পারভেজ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নেতা আখতার হোসেন মজিবরসহ চাতাল মজদুর ইউনিয়নের কয়েকজন নেতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে। ধান-চাল ব্যবসায়ী ও তাদের নেতা মজিবর রহমান মোল্লার নির্দেশ বা প্ররোচনাতেই যে এএসআই মাসুদ এভাবে তাদের আটক করে এটা স্পষ্ট হয় যখন সে মালিকপক্ষের হামলার কোন কথা না বলে, তাদের দ্বারা শ্রমিকদের সভার মাইক ইত্যাদি ভাংচুরের কোন কথা না বলে, উল্টো উপরোক্ত শ্রমিক নেতাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল, হুমকি প্রদান ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। ১ আগস্ট শ্রমিক সভায় মালিকদের হামলার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে পুলিশ অফিসার মাসুদ উল্টো গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কার্যক্রম বন্ধ করা, শ্রমিকদের সংগঠন না করা, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন না করা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কোন সভায় শ্রমিকদের যোগদান নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি নিয়ে আটককৃত শ্রমিক নেতাদের থেকে অঙ্গীকার আদায় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এ ঘটনার সময় সেখানে মালিকদের নেতা মজিবর রহমান মোল্লাসহ ঈশ্বরদী থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আনিসুন নবী বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মিন্টু ও উপস্থিত ছিলেন। এসব থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল, আওয়ামী লীগের উচ্চতর স্থানীয় অন্য নেতাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। সকাল থেকে নিয়ে বিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ অফিসার মাসুদ শ্রমিক নেতাদের জোর হুমকি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তির শর্ত লিপিবদ্ধ করে সেটিতে স্বাক্ষর করার জন্য তাদের বাধ্য করে। এভাবে চুক্তি স্বাক্ষরের পর তাদের থানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করিয়ে দেয়া হয় তাতে আছে– ১. চাতাল শ্রমিকদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, ২. ধান-চাল ব্যবসায়ীদের কাছে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে, ৩. গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট কোন সভা ধান-চাল মিল এলাকায় করতে পারবে না ও শ্রমিকদের সভা অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করতে পারবে না, ৪. সংগঠনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড থানা পুলিশকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবে, ৫. ধান-চাল মিল শ্রমিকদের কাছ থেকে কোন টাকা উঠানো যাবে না। স্ট্যাম্পে লেখা রয়েছে আপসনামা। হলফনামা।

প্রথম পক্ষ : মজিবুর রহমান মোল্লা (ব্যবসায়ী সমিতির নেতা)।

দ্বিতীয় পক্ষ : গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতা আখতার হোসেন মজিবর, মোশাররফ হোসেন মুছা, গোলাম হোসেন, আবদুল মালেক। চুক্তিটির বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে কোন সন্দেহ থাকে না, কাদের স্বার্থে পুলিশ কর্মকর্তা মাসুদ পারভেজ জোরপূর্বক শ্রমিক নেতাদের তাতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট ঈশ্বরদী শাখার সমন্বয়কারী আবুল কালাম আজাদ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক

www.pathagar.com

সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে এক লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। (সাপ্তাহিক জনদাবী, ঈশ্বরদী, ৮.৮.২০১০) তাতে তিনি বলেন, "উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তম চাল মোকাম ঈশ্বরদীর আইকে রোডস্থ চাতাল শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে গত ১ আগস্ট বিকেলে ছলিমপুর কলেজ প্রাঙ্গণে পূর্ব আহ্বানকৃত চাতাল মজদুর ইউনিয়নের সভাস্থলে চাল ব্যবসায়ী সমিতির নেতা মজিবর রহমান মোল্লার নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল উপস্থিত হয়ে বাধার সৃষ্টি করে। অন্যত্র সভা করার সময় শ্রমিকদের ওপর মজিবর রহমান মোল্লার লোকজন সন্ত্রাসী কায়দায় আক্রমণ পরিচালনার কথাও তার লিখিত বক্তব্যে বলা হয়। এছাড়া বলা হয়, কীভাবে পরদিন এএসআই মাসুদ পারভেজ কর্তৃক থানায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট ও চাতাল শ্রমিক নেতাদের ধরে নিয়ে আটক করে জোরপূর্বক তাদের দ্বারা লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, 'ওই ধরনের চুক্তিনামা প্রণয়নের ক্ষমতা ঈশ্বরদী থানার একজন এএসআই'র আছে কিনা এবং তা বর্তমান সংবিধানের পরিপন্থী কিনা তা আপনারাই বিবেচনা করুন। তাই আমরা পুলিশ অফিসার মাসুদ পারভেজের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য দাবি জানাচ্ছি।

ঈশ্বরদী থানা পুলিশের এএসআই মাসুদ পারভেজ অবশ্যই নিজের এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে স্থানীয় চাতাল মালিক ও তাদের রাজনৈতিক মুরুব্বি আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশ করেই যে কাজ করেছে, সেজন্য তার কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাঙলাদেশের মতো একটি ফ্যাসিস্ট শাসিত প্রশাসনে ওই ধরনের ক্রিমিনালদের শাস্তির কথা বলা অরণ্যে রোদনেরই নামান্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরদীর উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার কারণ এই যে, সমাজের ও প্রশাসনের নিম্নতর স্তরে ফ্যাসিবাদের প্রয়োগ এখন কীভাবে হচ্ছে তার বিশেষ কোন রিপোর্ট সংবাদপত্রেও পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার প্রয়োজন অস্বীকার করবে কে?

আমার দেশ : ১২.০৮.২০১০ ১১.৮.২০১০

www.pathagar.com

ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ একই পালকের পক্ষী

ব্যক্তি, দল, জাতি বা যেই হোক– সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা যখন কারও থাকে না তখন বুঝতে হবে তার এ অস্বীকৃতির কারণ কোন গভীর দুর্বলতা অথবা অন্তর্নিহিত সংকট। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাদের ঐতিহ্যবাহী ও চিরকালীন অঙ্গসংগঠন ছাত্র লীগকে অস্বীকার করার চেষ্টা এ ধরনেরই এক ব্যাপার।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র লীগের তাণ্ডব শুরু হয়। তারা অন্যদের রাতারাতি তাড়িয়ে দিয়ে হল দখল করে। এভাবে হল দখলের পর তারা শুরু করে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তি বাণিজ্য ও তার জন্য সন্ত্রাস। অন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে এভাবে সবকিছুর দখল নেয়ার পর শুরু হয় টাকা-পয়সা, সুযোগ-সুবিধা ভাগবাটোয়ারা নিয়ে তাদের নিজেদের দ্বন্দ্ব এবং এ দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে এখন এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যাতে তারা পরস্পরকে নানাভাবে আক্রমণ করে খুন-জখম পর্যন্ত করছে। এক কথায় তারা এখন পরিণত হয়েছে ক্রিমিনাল এক সন্ত্রাসী সংগঠনে। বলাই বাহুল্য, আঠারো মাস অর্থাৎ তাদের নির্বাচন বিজয়ের পর থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত সরকারের ছত্রছায়াতেই ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীরা এখন বেসামাল। এরা এতই বেসামাল যে পিতৃ সংগঠন আওয়ামী লীগও আর এদের সামাল দিতে পারছে না, একথা আওয়ামী নেতৃত্বের পক্ষ থেকেই বলা হচ্ছে। সামাল দেয়ার কথা এভাবে বললেও আসলে সে চেষ্টা এতদিন প্রকৃতপক্ষে করাই হয়নি। পুলিশের নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সক্রিয় সমর্থনেই ছাত্র লীগ এভাবে বেপরোয়া হয়েছে। এমনভাবে বেপরোয়া হয়েছে যা সামাল দেয়া তাদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে। যে প্রক্রিয়া তারা নিজেরাই শুরু করেছে, যেভাবে ছাত্র লীগকে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে সরকারীভাবে সাহায্য করা হয়েছে, সে প্রক্রিয়া রাতারাতি ঠেকানো সম্ভব নয়। অনেক গালভরা কথা বলা সত্ত্বেও আসলে ছাত্র লীগের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ার কারণেই শুধু যে তাদের স্পর্ধা সীমা অতিক্রম করেছে তাই নয়, অর্থ ও ক্ষমতার লালসা তাদের এক গ্রুপকে এখন অন্য গ্রুপের সঙ্গে ক্রিমিনাল সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একথা ঠিক, কর্মসূচিবিহীন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যবিহীন ছাত্র লীগ এখন একটি পুরোদস্তুর দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী ক্রিমিনাল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ছাত্র লীগের এ চরিত্র বিষয়ে জনগণের আর কোন সন্দেহ নেই। এটাই মূল কারণ যেজন্য আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগকে সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে এখন তার সঙ্গে নিজের সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলছে। কিন্তু একথার কোন গ্রাহ্যতা কারও কাছে নেই। ইসলামী ছাত্রশিবির আশির

www.pathagar.com

দশক থেকে ছাত্রমহলে সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। বস্তুতপক্ষে তারাই ছাত্র সংগঠন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটিয়েছে। অনেক কীর্তি তারা করেছে এবং এখনও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়নি। এসব দেখে জামায়াতে ইসলামী যদি বলে ছাত্র শিবিরের সঙ্গে তাদের কোন সাংগঠনিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক নেই তাহলে কে তাদের কথা বিশ্বাস করবে? আওয়ামী লীগ কি বিশ্বাস করবে সে কথা? সেটা যদি না হয় তাহলে আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের নির্ভরযোগ্য অঙ্গসংগঠন হিসেবে যে ছাত্র লীগ কাজ করে এসেছে, তাকে হঠাৎ আওয়ামী লীগ বেকায়দায় পড়ে অস্বীকার করলে সে কথা বিশ্বাস করবে কে? কেউ বিশ্বাস করবে এ কারণে যে, এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখনও পর্যন্ত ছাত্র লীগ খুব সত্য অর্থেই আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন। এর কার্যকলাপ থেকে আওয়ামী লীগ নিজেকে কিছুতেই দায়মুক্ত রাখতে পারবে না।

ছাত্র লীগ এখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, সেটা রাতারাতি হয়নি। আওয়ামী লীগের নাকের ডগাতেই এটা ঘটেছে। আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা যে আচরণ করে এসেছেন, তার থেকে শিক্ষা নিয়েই এবং তাদের আচরণ থেকে প্রণোদনা লাভ করেই ছাত্র লীগের নেতারা তাদের দুর্নীতিমূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। আলুর বস্তায় একটা পচা আলু মুখ বন্ধ অবস্থায় থাকলে যেভাবে বস্তাভর্তি আলুকে পচিয়ে দেয়, সেভাবেই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকে তরুণ ছাত্র লীগ কর্মীরা আওয়ামী লীগের গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়ে তার বর্তমান চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। কাজেই ছাত্র লীগ একটি ছাত্র সংগঠন হিসেবে কেন তার বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্ত হলো, এর কারণ অনুসন্ধান করলে এদিকে দৃষ্টি দেয়া ছাড়া উপায় নেই।

আওয়ামী লীগের দলীয় লোকজন ও তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীদের এখন জোর চেষ্টা চলছে আওয়ামী লীগের ভাবমর্যাদা থেকে ছাত্র লীগের ভাবমর্যাদা আলাদা করার। এদের কথা থেকে মনে হয় দেশে আওয়ামী লীগের ভাবমর্যাদা খুব উজ্জ্বল এবং ছাত্র লীগ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের এই 'উজ্জ্বল' ভাবমর্যাদা নষ্ট করছে। এর থেকে বড় ভ্রান্তি আর কী হতে পারে? আসলে ছাত্র লীগের অবস্থা চন্দ্রের মতো সূর্যের আলোর ছটাতেই সে আলোকিত।

এ প্রসঙ্গে ১০ জুলাই ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিট মিলনায়তনে টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী যা বলেন, সেটা উল্লেখযোগ্য। একটি সংবাদপত্র রিপোর্টে বলা হয়, 'ছাত্র লীগের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির অভিযোগের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আপনারাই বলুন ছাত্র লীগ কি খুনাখুনি করে? বিএনপি-জামায়াত জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গত ৭ বছরে এই ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরাই তো পড়ে পড়ে মার খেয়েছে। তারা এসবের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে চক্রান্তকারীরা ছাত্র লীগ ও যুব লীগে ঢুকে পড়েছে। এরাই সংগঠনে নাশকতা চালাচ্ছে। (সমকাল, ১১.৭.২০১০)

এসব বক্তব্য কি সঠিক ও সত্য? তা যদি হয় তাহলে মিথ্যা আর কাকে বলে? মন্ত্রী এমনভাবে কথা বলেছেন, যার থেকে মনে হয় ছাত্র লীগ খুনাখুনি করে না। অথচ প্রায়

www.pathagar.com

প্রতিদিন খবরের কাগজে সচিত্র রিপোর্টে দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র লীগের কর্মীরা পিস্তল, চাপাতি, দা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে অথবা সরাসরি আক্রমণ করছে। সে প্রতিপক্ষ অন্য কোন সংগঠনের হোক অথবা হোক খোদ ছাত্র লীগেরই অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব সৃষ্ট অন্য গ্রুপ। কাজেই 'ছাত্র লীগ কি খুনাখুনি করে?' এভাবে প্রশ্ন করে তিনি ছাত্র লীগকে নিরামিষ বানানোর যে চেষ্টা করেছেন, সেটা যে সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার ঝুড়ি সামনে রাখার ব্যাপার– এ নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। এতে বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এভাবে সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার প্রচার তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এখানেই শেষ নয়, মন্ত্রী ছাত্র লীগকে নিরীহ সংগঠন হিসেবে উপস্থিত করার জন্য এভাবে চেষ্টা করলেও তাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করতে হয়েছে, ছাত্র লীগ নানাভাবে নাশকতামূলক কাজ করছে। এ কারণে তিনি বলছেন, 'চক্রান্তকারীরা ছাত্র লীগ ও যুব লীগে ঢুকে পড়েছে। এরাই সংগঠনে ঢুকে নাশকতা চালাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'চক্রান্তকারী কিছু অশুভ শক্তি অপকর্ম করে ছাত্র লীগের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায় ছাত্র লীগের এমন বিশুদ্ধ চরিত্র যে তার কর্মীর সংজ্ঞা অনুসারেই কোন খারাপ কাজ, বিশেষত খুনাখুনি করতে পারে না। কাজেই যখন ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীরা এ ধরনের কাজ করে বলে দেখা যায়, তখন সেটা কোন ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীর কাজ নয়। সে কাজ হলো বাইরের, অন্য সংগঠনের, চক্রান্তকারীদের কাজ– যারা ছাত্রলীগে, যুব লীগে অনুপ্রবেশ করে অপকর্ম করছে। এসব শুনে মনে হয় বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যেসব অপকর্ম করছেন সেগুলোও আওয়ামী লীগের কাজ নয়; সেসব হলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী অনুপ্রবেশকারীদের কাজ! এ আলোচনার শুরুতেই সত্যকে অস্বীকার করার যে কথা বলা হয়েছে এর থেকে তার উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য উদাহরণ আর কী হতে পারে?

মজার ব্যাপার হলো, ছাত্র লীগের নিরীহ চরিত্র বিষয়ে এতো কথা বলার পর মন্ত্রী ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করো। এটা না করে ওদের (যুদ্ধাপরাধীদের) মারতে পারো না?' (ওই) তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীরা আসলেই যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে এটা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করছেন। তারপর তনি তাদের উপদেশ দেয়ার মতো করে বলছেন নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে যুদ্ধাপরাধীদের মারতে। তাহলে তার মতে যুদ্ধাপরাধীদের আইন অনুযায়ী বিচার না করে তাদের মারাই হলো এদের কাছে শুধু সমর্থনযোগ্য নয়, একেবারে আসল কাজ! এই চিন্তা একজন ফ্যাসিস্ট মনোভাবাপন্ন লোকের মাথা ছাড়া আর কার মাথায় আসতে পারে?

এখানেই শেষ নয়, টাঙ্গাইলবাসী এই আওয়ামী লীগ মন্ত্রী আরও বলেন, 'বিএনপির কর্মীরা ডাকাত' আর আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছিঁচকে চোর। আগে বিএনপি নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হলে পুলিশকে প্যাকেট বিরিয়ানি খাইয়ে সরাসরি নিজেরা জেল থেকে বের হয়ে আসত। আর বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা গ্রেফতার হলে টুকু সাহেবের

www.pathagar.com

(স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) সহেযাগিতা নেন।' (ওই) অর্থাৎ আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাদের ছাড়িয়ে আনেন। তাহলে এই মন্ত্রীর কথা থেকে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল, বিএনপি নেতাকর্মীদের মতো আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ডাকাত না হলেও ছিঁচকে চোর! আর ছিঁচকে চোরদের পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার কাজ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এবং ক্ষমতাবান নেতারাই করে থাকেন! উল্লেখযোগ্য যে, ওই সভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার সহকর্মী মন্ত্রীর এই বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করেননি! ডাকাত হচ্ছে দুর্ধর্ষ অপরাধী। কিন্তু ছিঁচকে চোর হলো নিম্নশ্রেণীর নিচ অপরাধী এবং কাপুরুষও বটে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা ডাকাত না ছিঁচকে চোর, এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মন্ত্রীর উক্তি অনুযায়ী এটা অবশ্যই বলা চলে– তারাও অপরাধী। অন্যের টাকা-পয়সা, সম্পত্তি অপহরণ ও আত্মসাৎ করার কাজ তারাও করে থাকে। নিজের দলের লুটপাটের মাত্রা কম করে দেখানোর জন্য উপরোক্ত মন্ত্রী তাদের ছিচকে চোর বলে অভিহত করলেও আসলে তারা শুধু ছিঁচকে চোরই নয়, অন্য অনেক ধরনের অপরাধই তাদের নিত্যকর্ম। এর অনেক দৃষ্টান্ত সংবাদপত্রেই পাওয়া যায়।

সংবাদপত্র রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এক অফিসার মিরপুর এলাকার এক সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এর কারণ ওই সংসদ সদস্য আশুলিয়ায় যানজটে আটকে পড়ে ট্রাফিক পুলিশকে হুকুম করেন অন্য গাড়ি সরিয়ে তাকে রাস্তা করে দিতে। এটা সম্ভব না হওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ অফিসারটার গালে থাপ্পড় মারেন। ক্ষমতা মদমত্ত হয়ে এর থেকে নিম্ন রুচির আচরণ কল্পনারও বাইরে। এই লোকরাই যে অন্য পরিস্থিতিতে বড় আকারে ও জঘন্যভাবে সন্ত্রাসের মতো অপকর্ম করে থাকেন এটা কি দেশের লোকের অজানা আছে?

এ আলোচনা শেষ করার আগে এটা বলা দরকার, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা কোন সাধু চরিত্রের লোক নন। তারা যে শুধূ ছিঁচকে চোর তাও নয়। সব রকম অপরাধই যে তাদের অনেকে করে থাকেন এটা জনগণের সাধারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তারা জানেন। ছাত্র ও যুব লীগের নেতা-কর্মীরা এই আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের থেকেই তাদের বর্তমান আচরণবিধি আয়ত্ত করেছে। এদিক দিয়ে ছাত্র লীগ, যুব লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নাড়ীর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টার দ্বারা আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের ভাবমর্যাদা জনগণের সামনে খোলা করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেন না। হাজার চেষ্টা করলেও নয়। আসলে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীরা যা করছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও পর্দার ভেতরে-বাইরে সে একই কাজ করছেন। এঁরা সবাই একই পালকের পক্ষী।

যুগান্তর : ১৮.০৭.২০১০

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক পরই উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু এবং বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে অপরাধীদের তাদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া দরকার ছিল। প্রথম দিকে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গ্রেফতার ও আটক রাখার পর তাদের সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হয়। শুধু ছেড়ে দেয়াই নয়, তাদের প্রতি শেখ মুজিব আহ্বান জানান দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের জন্য।

১৯৫ জন পাকিস্তানী সামরিক অফিসারকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঐভাবে গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের বাঙলাদেশের কারাগারে আটক রাখাই এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বাক্ষর হিসেবে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবি জলাঞ্জলি দিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাঙলাদেশের জনগণের জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হোক, পাকিস্তানের সঙ্গে দর কষাকষির জন্য ভারতের প্রযোজন ছিল তাদের নিজেদের কব্জায় রাখা। ভারতেরই জয় হয়েছিল। তারা বাঙলাদেশ থেকে ঐ যুদ্ধাপরাধীদের নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই যুদ্ধাপরাধীরা ভারতে আটক থাকার সময় শেখ মুজিব ও তার মন্ত্রী কামাল হোসেন কয়েকদিন পরপরই এই বলে আওয়াজ দিতেন যে, যুদ্ধবন্দিদের বিচার বাঙলাদেশের মাটিতেই হবে। তৎকালীন সংবাদপত্রে ঐ বক্তব্য নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হতো। এভাবে কিছুদিন চলার পর দেখা গেল ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে পাকিস্তানে ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। বাঙলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের ঐ সিদ্ধান্তকে সালাম জানালেন। পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীরা কোন বিচারের মুখোমুখি না হয়েই দেশে ফেরত গেল।

বাঙলাদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের বিচার হবে– এই আওয়াজের পর তাদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো, যদি সেই যুদ্ধাপরাধীদের ফেরত না দেয়া হতো এবং বাঙলাদেশে তাদের বিচার ও শাস্তি হতো তাহলে পাকিস্তানে আটক সামরিক ও বেসামরিক হাজার হাজার লোককে পাকিস্তানীরা হত্যা করতো। কাজেই 'মহানুভব' শেখ মুজিব পাকিস্তানে আটক বাঙলাদেশীদের জীবন রক্ষার জন্যই পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের তাদের দেশে ফেরত

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিলেন। প্রথমত তাই যদি হয় তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার আইন মন্ত্রী মাসের পর মাস কেন এই বিচারের কথা দেশের জনগণকে শোনালেন? কেন তিনি এ কাজ করলেন? এ কথা বলতে থাকার সময় কি বাঙলাদেশীরা পাকিস্তানে আটক ছিলেন না? বাঙলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলে পাকিস্তানে আটক হাজার হাজার বাঙলাদেশীকে হত্যা করা হবে– এই জ্ঞানের উদয় কি তখন তাদের মস্তিষ্কে হয়নি? সেটা যদি না হয়, তাহলে কী কারণে তাদের মাথায় পরে এ জ্ঞানের উদয় হলো এবং পাকিস্তানে আটক স্বদেশবাসীদের জীবন রক্ষার জন্য তাদের হৃদয় ব্যাকুল হলো? এ ধরনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন যদি অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণে না হয়ে থাকে তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিতান্তই নাবালক এবং অপরিপক্ব বলতে হবে। কারণ পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিলে পাকিস্তানে আটক বাঙলাদেশীদের পাকিস্তানীরা হত্যা করবে এই বোধ তার মাথায় আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এই বোধ তার মাথায় এসেছিল ভারত সরকার পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বাঙলাদেশের কোন ভূমিকা ছিল না, ভারতের এ সিদ্ধান্ত রদ করার কোন ক্ষমতা বাঙলাদেশের ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে বাঙলাদেশের অনেক হম্বিতম্বির পর গোঁফ নামিয়ে ফেলার কারণ ভারতের সিদ্ধান্তের কাছে শেখ মুজিবের আত্মসমর্পণ। এর সঙ্গে তার 'মহানুভবতার' কোন সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের মহানুভবতার কথা একটা ধাপ্পাবাজি এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণার ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তাদের সামরিক বাহিনী বাঙলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা করেছিল, যেভাবে লাখ লাখ লোক হত্যা করেছিল, তার জন্য পাকিস্তান আন্তর্জাতিকভাবে ধিকৃত ও প্রায় একঘরে হয়েছিল। পরাজয়ের পর তাদের দেশেও যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাতে যুদ্ধ শেষে সেখানকার লোক সামরিক বাহিনীর কর্তা ইয়াহিয়া খানের গলায় মাল্যদান করেনি। তাকে তাড়িয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল। সে অবস্থায় বাঙলাদেশে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের বিচার হলে পাকিস্তান সরকার সেখানে আটক বাঙলাদেশীদের হত্যা করবে, এ চিন্তা মহা মুর্খ ছাড়া আর কে করতে পারে? অথবা ঘৃণ্য মতলববাজ ছাড়া আর কে বলতে পারে?

তৃতীয়ত, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ব্যাপার। কাজেই বাঙলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছে– এই অজুহাতে পাকিস্তানে আটক বেসামরিক ও সামরিক বাঙলাদেশীদের পাকিস্তান সরকার হত্যা করবে, এটা তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে অচিন্তনীয় ছিল। পাকিস্তান সরকার সেরকম কোন সংকল্পের কথা কোথাও কোনভাবে ব্যক্ত করেনি। সেটা তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির ব্যাপার হতো। যুদ্ধাপরাধী সামরিক অফিসারদের বিচার বাঙলাদেশে হচ্ছে এ কারণে তাদের সরকার আটক বাঙলাদেশীদের হত্যা করতে পারে– এ চিন্তা তখন কারও মাথায় ছিল না। পরেও সেটা কারও মাথায় আসেনি, একমাত্র উর্বর মস্তিষ্কসম্পন্ন মতলববাজ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব

www.pathagar.com

ছাড়া। তারা তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত এই মিথ্যা তাদের প্রচার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার পর তাদের দলীয় লোকেরা একটাকেই যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর যুক্তি হিসেবে জাবর কাটার মতো করে বলে চলে। এর দ্বারা শুধু যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা এবং মতলববাজই প্রমাণিত হয় তাই নয়, চিন্তা ক্ষেত্রে তাদের দলীয় লোকজনের অতি নিম্ন রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়ও এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

শেখ মুজিবের 'মহানুভবতার' শেষ ছিল না। জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার সব থেকে ঘৃণীত যুদ্ধাপরাধী। যাদের যুদ্ধাপরাধের কারণে লাখ লাখ বাঙলাদেশী নিহত হয়েছিলেন, তাদের মাফ করে দিয়ে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করা 'মহানুভবতা' ছাড়া আর কী? কাজেই ঐ মহানুভবতার বশবর্তী হয়েই ১৯৭৪ সালের জানুয়ারীতে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে শেখ মুজিব ভুট্টোকে 'আমার প্রিয় পুরনো বন্ধু' বলে সম্বোধন করে তার গালে চুমু খেয়েছিলেন! তিনি ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এ সঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, অতীত আঁকড়ে থাকা ঠিক নয়। অতীতকে ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকানো দরকার! এসব আমার কোন বানানো কথা নয়। তখনকার সংবাদপত্রেই এসবের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

লাহোর ইসলামী সম্মেলনের পর শেখ মুজিব ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাঙলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে তাকে তিনি রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এ সবই ছিল শেখ মুজিবের 'মহানুভতার' পরিচায়ক! কিন্তু আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারি, ৩০ লাখ বাঙলাদেশী হত্যার জন্য যে ক্রিমিনাল দায়ী ছিল তার প্রতি ওই 'মহানুভবতা' প্রকাশের অধিকার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে কে দিয়েছিল? ঐ মহানুভবতা কি জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না? প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়। অথবা বলা চলে তার যবনিকা পতন ঘটায়।

এই যবনিকা উত্তোলন করে নোতুনভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হয়নি। হওয়ার কথাও ছিল না। কারণ যে মতিউর রহমান নিজামীকে তারা এখন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জেলে পুরেছেন, তারই সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে তিনি সরকার গঠন করে জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন।

যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনেক আগেই সম্পন্ন হওয়া দরকার ছিল সেটা না করে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারকে ধামাচাপা দিয়ে যারা দেশের জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করে এসেছে, তারা হঠাৎ এমন কোন কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে বিরাট তোলপাড় শুরু করেছে, এটা সাধারণভাবে অনেকের কাছে রহস্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে কোন রহস্য নেই এবং রহস্য যে নেই এটা বোঝার জন্যই সবার প্রয়োজন যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পূর্বকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই পরিচয়ই উপরে সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীর বিচার এমন জিনিস যা ধামাচাপা দিয়ে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করা যায় না। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ীই সেটা হয় না। কারন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, নুরেমবার্গ বিচারেরও অনেক দিন পর পর্যন্ত, যুদ্ধাপরাধীদের অনেককে গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করে তাদের বিচার করা হয়েছে। কাজেই আগে আওয়ামী লীগ সরকারসহ অন্য সব সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করলেও এ বিচারের গ্রাহ্যতা ও প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এমন দল নয়, তাদের রাজনৈতিক চরিত্র এমন নয় যাতে কোন ন্যায় বিবেচনার দ্বারা চালিত বা তাড়িত হয়ে তারা এ কাজ করতে পারে। এরা এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে হঠাৎ করে যে মাত্রাতিরিক্ত দাপাদাপি ও মাতামাতি শুরু করেছে, যেভাবে 'দেশপ্রেমিক' হিসেবে কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে, তার কারণ বোঝা দরকার। আসলে এদের আঠারো মাসের নানা অপকর্মের ও জনবিরোধী কার্যকলাপের ফলে এদের পায়ের তলা থেকে মাটি খুব দ্রুত সরে যাচ্ছে। অন্যভাবে বলা চলে, এরা এখন সাঁতার না জানা লোকের মতো অগাধ পানিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে এবং খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো একটি বিষয়কে এরা এখন খড়কুটোর মতো আকড়ে ধরেই নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তাদের এখন এমন দিশেহারা এবং উন্মাদের মতো অবস্থা যে, তারা নিজেরা ছাড়া অন্য সবাইকেই তারা যুদ্ধাপরাধীদের সমগোত্রীয় বলে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকানোর চেষ্টা করনেওয়ালা হিসেবে অপবাদ দিয়ে নিজেদের এই হঠাৎ উন্মাদনাকে জনগণের কাছে গ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে দেশে ও বিদেশে অবস্থিত তাদের চাকরবাকর বুদ্ধিজীবীরা সংবাদপত্রে কলাম লিখে এবং সভা-সমিতি করে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাতাস গরম করছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের পায়ের তলা থেকে মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে। এরা এখন অগাধ পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে তারা যেভাবে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে, এটা তাদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে কানাকড়ি অবদানও রাখবে না।

আমার দেশ : ২২.০৭.২০১০ ২১.৭.২০১০

www.pathagar.com

সভা সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা প্রসঙ্গে

ধর্মের কল নাকি বাতাসে নড়ে। অধর্মের কলও যে বাতাসে নড়ে তার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হলো সরকার কর্তৃক রাজধানী ঢাকায় সভা-সমাবেশ-মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া। মহা যানজটের শহর হিসেবে ঢাকা এখন দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করেছে। এই যানজটের জন্য ঢাকাবাসীর জীবন অতিষ্ঠ। যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার সারা শহরে স্কুল বন্ধ রেখে, সিএনজি স্টেশন দিনে দীর্ঘ সময় বন্ধ রেখে, পুরনো আধা-অকেজো গাড়ি রাস্তায় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে অনেক রকম কাজ করেছে। এদিক দিয়ে সরকারের অবস্থা দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় যেমন আছে 'ধুলাকে মারি করিয়া দিল কাদা'। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান কিছুমাত্র হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তারা এখন যানজট নিরসনের কথা বলে ঢাকায় সভা-সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করেছে। ঢাকায় এমনিতেই সভা-সমাবেশ-মিছিল করা সহজ নয়। পুলিশের অনুমতি, খবরদারি ও লাঠিপেটা লেগেই আছে। তা সত্ত্বেও এসবের ওপর আরও কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞার জন্য সরকার খালি অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছে। এখন অধর্মের কল বাতাসে নড়ে তাদের জন্য সেই সুবিধা করেছে। তারা আবিষ্কার করেছে, জনগণ সরকারের নানা নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ যে সভা-সমাবেশ-মিছিল করেন সেটা যানজটের মস্ত বড় কারণ। কাজেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে দিয়ে হুকুম জারী করে তারা সব রকম সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ করেছে। যতই সরকার ও সরকারী দল নিজেদের অপকর্মের কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ততই তাদের নিজেদের সভা-সমাবেশ-মিছিল করার ক্ষমতা কমে আসছে ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ-মিছিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার যে সুযোগ তারা খুঁজছিল সে সুযোগ যানজট তাদের জন্য সৃষ্টি করেছে। একেই বলে অধর্মের কল বাতাসে নড়া।

অনুন্নত, অসংগঠিত ও সাম্রাজ্যাদের পদানত নির্ভরশীল দেশগুলোতে যে ধরনের শাসন ফ্যাসিবাদের নোতুন সংস্করণ হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তারই নিকৃষ্টতম রূপ দেখা যায় বাঙলাদেশে। ১৯৭২ সালেই এর গোড়াপত্তন হয়ে এখন এই ফ্যাসিবাদ এক প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। এ কারণে কোন ধরনের নির্যাতনের জন্য এদের অজুহাতের অভাব হয় না। এ ক্ষেত্রেও হয়নি। এমনভাবে সরকার সভা-সমাবেশ-মিছিলের জন্য যানজট সৃষ্টির কথা বলছে যাতে মনে হয় ঢাকা শহরে প্রতিদিন বা অন্তত প্রতি সপ্তাহেই বিশাল সভা-সমাবেশ-মিছিল হয়ে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে! ঢাকায় যে সভা-সমাবেশ-মিছিল এখন হয় সেগুলো প্রায় সবই ছোট আকারের। তাতে বড় রকম

www.pathagar.com

যানজট সৃষ্টি হয় না। যানজট সৃষ্টির মতো বড় সভা-সমাবেশ কমই হয়। কারণ প্রধান বিরোধী দল বিএনপিরও এমন অবস্থা নয় যে তার ঘন ঘন বড় ধরনের সভা-সমাবেশ করতে পারে।

সভা-সমাবেশ-মিছিল ইত্যাদি করা জনগণের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাদের কোন অজুহাতেই বঞ্চিত করে কেউ গণতান্ত্রিক সরকার ও শাসন ব্যবস্থার দাবি করতে পারে না। কিন্তু সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রী থেকে নিয়ে তাদের দালালদের কারও মুখে এখন কোন লাগাম নেই। সরকারী ক্ষমতার মোহে তারা তাদের কার্যকলাপের সাফাই গেয়ে যা ইচ্ছে তাই বলছে এবং সংবাদপত্রে তা ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের মহানগর শাখার এক দুর্নীতিপরায়ণ ও দালাল নেতার বক্তব্য হলো, 'বিষয়টি পুলিশের নিজস্ব ব্যাপার। নগরী যানজটমুক্ত ও অপরাধমুক্ত রাখাসহ অনেক সেবা দেয় পুলিশ। তারা এসব সেবা দিতে গিয়ে যদি সভা-সামবেশ, মিটিং-মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় তাহলে তো বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করা ঠিক হবে না।' (ডেসটিনি, ২৪.৮.২০১০)।

তাহলে ওই দালাল আওয়ামী লীগ নেতার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জনগণের সভা-সমাবেশ-মিছিল করার অধিকার অথবা সেই অধিকারের ওপর হামলা কোন রাজনৈতিক ব্যাপার নয়! এটা হলো পুলিশের নিজস্ব ব্যাপার!। এটা যদি রাজনৈতিক ব্যাপার না হয়, তাহলে রাজনৈতিক বিষয় বলতে কী বুঝায়? খুব সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বিষয় হলো, জনগণকে প্রতারিত করে ক্ষমতার গদিতে বসে তাদের ওপর শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের সময় তাদের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করা!।।

এই সরকারের যে এখন দিশেহারা অবস্থা এর প্রমাণ এরা প্রতিদিন নিজেদের কাজকর্মে এবং উদ্ভট সব বক্তব্যের মধ্যে রাখছে। স্কুল বন্ধ করে ও সিএনজি স্টেশন বন্ধ রেখে যানজট সমাধানের চেষ্টা তাদের এই দিশেহারা অবস্থারই দৃষ্টান্ত। এরা যানজট নিরসনের জন্য একদিকে শিক্ষাব্যবস্থা স্থগিত এবং অন্যদিকে সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ করে যে ফরমান জারী করেছে, এর মধ্যে শুধু দিশেহারা অবস্থাই নয়, এদের দেউলিয়াপনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয় যে স্কুল বন্ধ করে, সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ করে, যানজট কমানোর চেষ্টা সত্ত্বেও রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ি চলাচল এবং প্রতিদিন রাস্তায় নোতুন নোতুন গাড়ি নামানোর বিরুদ্ধে, অবাধে নোতুন গাড়ি আমদানীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ এদের নেই। অথচ বাসের থেকে বিপুল অধিক সংখ্যক প্রাইভেট গাড়িই এখন ঢাকা শহরে যানজট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

দিশেহারা সন্ত্রাসীর মতো দিশেহারা ফ্যাসিস্ট সরকার অতিরিক্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। এ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই সারাদেশের জনগণ এখন জীবন কাটাচ্ছেন। সরকারের দলীয় লোকজন, তাদের ছাত্র, যুব সংগঠনসহ অন্যসব অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব সর্বক্ষেত্রে কায়েম করে রেখেছে। এসব সামাল দেয়ার কোন ইচ্ছে সরকারের নেই। উপরন্তু এ সবেরই তারা প্রেরণা ও শক্তির উৎস। কাজেই এসব

www.pathagar.com

চলছে অপ্রতিহতভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রী থেকে নিয়ে তার সাঙ্গপাঙ্গ মন্ত্রী ও দলীয় নেতারা প্রতিদিনই বলছেন 'অপরাধ যেই করুক তারা যে দলেরই হোক, তাদের রক্ষা নাই'। এই বহু ব্যবহৃত বচনের ফাঁকা ও প্রতারণামূলক চরিত্র এখন জনগণের এতো ভালভাবে জানা হয়ে গেছে যে, সংবাদপত্রের পাতা ছাড়া এর কোন গুরুত্ব অন্য কোথাও নেই।

সরকারী লোকজনের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনের কোন নীতি ও কর্মসূচি আওয়ামী লীগ সরকারের নেই। লুটপাটই তাদের লক্ষ্য এবং লুটপাটের প্রয়োজনেই তারা সন্ত্রাস করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণকে আবার তারা ভয়ও করে। এই ভয় শুধু ভোটের মাধ্যমে পরাজিত হওয়ার ভয় নয়। জনগণের সম্মিলিত ক্রোধ এবং আক্রমণের ভয়েও এরা অস্থির। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা নিজেদের জন্য গানম্যান চেয়েছেন! কিন্তু দেশে শোষণ ও নির্যাতনের যে পরিস্থিতি বর্তমান সরকার সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় জনগণের রোষাণল থেকে রক্ষা পাওয়া গানম্যান নিযুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। সরকার জনগণের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাস করছে তার প্রতিক্রিয়া এমন হওয়া সম্ভব, যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই নেই।

আমার দেশ : ২৬.০৮.২০১০ ২৫.০৯.২০১০

www.pathagar.com

প্রধান মন্ত্রীর ৫২৫ নম্বর সতর্কবাণী

২ সেপ্টেম্বর দৈনিক সমকাল পত্রিকায় 'ওদের ঠেকাবে কে' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। যে বিষয়ে রিপোর্টটি তৈরী করা হয়েছে তা নোতুন নয়। এর নির্যাতনে সর্বস্তরের মানুষ অতিষ্ঠ। এর ওপর আলোচনারও কমতি নেই। তবু সমস্যাটি এমন যে, এর ওপর বারবার লেখার প্রয়োজন আছে। বিশেষত এজন্য যে, লেখা ছাড়া এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কোন পথ বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নেই। বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথমে রিপোর্টটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা দরকার। এতে বলা হয়েছে– "চিত্রটি মোটেও নোতুন নয়। এ দৃশ্যপটটি দেখতে সবাই মোটামুটি অভ্যস্ত। সরকার বদল হলে কিছু দিনের মধ্যেই সরকারী দলের আনুগত্য লাভ এবং নানা কৌশলে চাঁদাবাজি করার জন্য বহু ভুইফোঁড় সংগঠনের জন্ম হয়। জোট সরকারের সময় অলিগলি রাজপথে এসব সংগঠনের বাহারি ব্যানার-পোস্টার শোভা পেত। এখন শোভা পাচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করে অসংখ্য ভুইফোঁড় সংগঠনের ব্যানার-পোস্টার। বিশেষ উপলক্ষে ১৫ আগষ্ট, ২১ আগষ্ট, ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চসহ নানা উল্লেখযোগ্য দিনকে সামনে রেখে চাঁদাবাজি করার জন্য এই ফাঁদ। এ ধরনের চাঁদাবাজ সংগঠনের পেছনে এমন কিছু চতুর ও বাকপটু 'নেতা' আছেন যারা নেতা-মন্ত্রীদের পর্যন্ত নিজেদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিও করতে পারেন। সম্প্রতি জাতীয় শোক দিবসকে কেন্দ্র করে এইসব ভুইফোঁড় সংগঠনের অপতৎপরতা অসহনীয় পর্যায়ে পৌছেছিল। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের এসব তথ্য অজানা নয়। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরাও জানেন। তবুও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না। ফলে ভুইফোঁড় সংগঠনের নেতারা চাঁদাবাজির সঙ্গে তদবির পেশায় নেমেছেন। বাঙলাদেশে দুর্নীতি কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ও শাসক শ্রেণীর রাজনীতির ক্রিমিনালাইজেশন বা অপরাধিকীকরণ কোন্ পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় এ রিপোর্টের মধ্যে আছে। এটা ঠিক যে, যে কোন দল ক্ষমতায় এলে তাদের লোকজন এবং কিছু সুবিধাবাদী তার নাম ভাঙিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ভুয়া সংগঠন খাড়া করে চাঁদাবাজিসহ নানাভাবে দুর্নীতি করে থাকে। বিএনপি সরকারের আমলেও এ ধরনের চাঁদাবাজি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগ আমলে যেভাবে বিস্তার লাভ করে দেশের জনগণের সম্পদ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং জনগণের পকেট মারছে, এভাবে বা এতো বিশাল আকারে এ কাজ করা তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। এর কারণ দলটির সীমাবদ্ধতা। আওয়ামী লীগ হলো বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর সর্বপ্রধান, সব থেকে বড় ও শক্তিশালী দল। এর তুলনায় বিএনপি অনেক ছোট, দুর্বল ও শেকড়বিহীন; যদিও নির্বাচনে জয়লাভ করে তারা দু'বার ক্ষমতাসীন হয়েছে। তাদের সাধ থাকলেও আওয়ামী লীগের মতো এতো ব্যাপক আকারে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি

www.pathagar.com

করার সাধ্য নেই। তবে এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, এটা বিএনপি বা আওয়ামী লীগের বিশেষত্ব নয়। সামগ্রিকভাবে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীরই এ অবস্থা। এ কারণে জোট সরকার গঠন করে মূল দলের আশপাশে দক্ষিণ ও বামপন্থী যেসব দল ঝুলতে থাকে তারাও অপকর্ম সাধ্য মতো করে থাকে। কাজেই চোর-দুর্নীতিবাজ বামপন্থী নেতা-কর্মীর সংখ্যা কম হলেও তাদের একেবারে অভাব এ দেশে নেই।"

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে আওয়ামী লীগ সমর্থক লোকেরা যেভাবে ভুয়া সংগঠন খাড়া করে চাঁদাবাজিসহ নানা দুর্নীতি করছে, এটা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অজানা নয়। বলাই বাহুল্য, এ নেতাদের মধ্যে নেত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই এ বিষয়ে ভালোভাবে অবগত থাকলেও এ প্রক্রিয়া বন্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে কিছুই করেন না। যারা এ পরিস্থিতিতে দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিছুই করেন না, তাদের চিন্তাভাবনা ও আচরনের সঙ্গে এসব দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীর চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই– এটা মনে করা সঙ্গত নয়। যারা ক্ষমতাসীন থাকাও সত্ত্বেও নিজেদের দলের লোক এবং দলের নাম ভাঙিয়ে খাওয়া লোকদের সংযত করা ও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো থেকে বিরত থাকেন, তারা নিজেরাও দলের মধ্যে নিজেদের অবস্থান ব্যবহার করে একই কাজ করেন। দেশে আজ যে অরাজকতা চলছে এটাই হল তার মূল কারণ। চাঁদাবাজি, ঘুষখোরী, কমিশনখোরী শুধু যে কিছু সুবিধাবাদী লোক আওয়ামী লীগের নাম ভাঙিয়ে করছে তা নয়। খোদ আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীরাও একই কাজ করছেন। এ অবস্থা না হলে কোন দল ক্ষমতায় বসলেই তার নাম ভাঙিয়ে অন্যরা কখনও এভাবে দুর্নীতি করতে পারে না, যেভাবে এখন এদেশে দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম হয়েছে। একমাত্র দুর্নীতিবাজ দলের ছাতার তলায়ই এ ধরনের দুর্নীতি সম্ভব। ক্ষমতাসীন দল ও লোকদের চরিত্র যদি অন্য প্রকার হয়, তাহলে এ কাজ অন্যদের দ্বারা তাদের নাম ভাঙিয়ে কখনোই করা সম্ভব হয় না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুলিশের নাকের ডগায় এভাবে দুর্নীতি ও নানা ধরনের অপরাধ ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় হচ্ছে। পুলিশ এসব ক্ষেত্রে বাধা দেয় না। কারণ তার জানে এসব কাজ সরকারী দলের সমর্থন, এমনকি সহায়তায় হচ্ছে। এই সরকারী দলের লোকেরা খুন, জখম, চাঁদাবাজি, ঘুষখোরী, প্রতারণাসহ কত রকম অপরাধ যে করে যাচ্ছে তার কিছু রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এসব থেকেই বোঝা যায়, যারা রক্ষক তারাই আসলে ভক্ষক। যেসব দিবসকে কেন্দ্র করে ভুয়া সংগঠন এখন চাঁদাবাজি করে, তার মধ্যে ১৫ আগষ্টকে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এ দিবসকে কেন্দ্র করে অপ্রতিহতভাবে চাঁদাবাজির সুযোগ সরকারই করে দিয়েছে। শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শাসক শ্রেণীর লোক, তাদের সেনাবাহিনীর কিছু লোকের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। সেটা ছিল এক মস্ত ক্রিমিনাল কাজ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দিবসটি পালনের ব্যবস্থা করেছে, ওইদিন সরকারী ছুটিরও বরাদ্দ করেছে। ঠিক আছে। কিন্তু পুরো আগষ্টকে শোকের মাস হিসেবে ঘোষণা করে ৩১ দিন ধরে শোক পালন এক কথায় ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এমনটি কোন দেশেই দেখা যায় না। এটা প্রকৃত শোক পালনের কোন পদ্ধতি, নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসে এভাবেই শেখ মুজিব হত্যা উপলক্ষে শোক পালনে ব্যবস্থা করেছে। এভাবে

www.pathagar.com

মাসব্যাপী শোক পালনের ব্যবস্থার কারণে দেশের লোক যে ৩১ দিন শোক পালন করছে এমন নয়। তবে এর ফলে ভুয়া সংগঠন খাড়া করে চাঁদাবাজদের দুর্নীতির জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা শুধু একদিন নয়, ৩১ দিন ধরে এভাবে দুর্নীতি করার সুযোগ ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। যেসব সংগঠনের নামে এ ধরনের কাজ হচ্ছে, তার একটি বড় তালিকা উপরোক্ত রিপোর্টে দেয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কতকগুলোর পোস্টারের ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা হয়েছে। সংগঠনগুলো হলো– 'বঙ্গবন্ধু নাগরিক সংহতি পরিষদ', 'বঙ্গবন্ধু প্রজন্ম লীগ', 'বাঙলাদেশ যুব আইনজীবী পরিষদ', 'নৌকার নোতুন প্রজন্ম', 'বঙ্গবন্ধু আদর্শ সংসদ', 'বঙ্গবন্ধু শিশু একাডেমী', 'বাঙলাদেশ আওয়ামী মোটর চালক লীগ', 'বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন' ইত্যাদি।

শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয়, এর জন্য আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতারা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত করে চলেছে। এদের অপরাধপ্রবণতা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যাতে নিজেদের দলের লোকজন পর্যন্ত তারা নিজেরা খুন করছে। সম্প্রতি একজন সংসদ সদস্য এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে বলে নিহতের পরিবার থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। যে সরকারের নেতৃস্থানীয় লোকজন এ ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত, তাদের ছত্রছায়ায় অপরাধ যে ক্রমাগত বিস্তার লাভ করবে এতে সন্দেহ নেই।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিজয়ের দিন থেকে রাজনীতির অপরাধিকীকরণ বা ক্রিমিনাইজেশন যেভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে এবং সমাজের সর্বস্তরে অপরাধপ্রবণতার বিস্তার ঘটিয়েছে, এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ পরিস্থিতিকে কেউ যদি বিচার করতে যান তাহলে সেটা হবে এক অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু অবাস্তব হলেও দেশে বিদেশে অবস্থিত ও ধরনের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীর অভাব আওয়ামী লীগের নেই।

আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগকে নিজেদের অঙ্গসংগঠন হিসেবে স্বীকার না করলেও দলটির সঙ্গে তাদের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়নি, হওয়ার নয়। কাজেই আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রছায়াতেই ছাত্র লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ইত্যাদি সংগঠন দেশের সর্বত্র এখন এক অপরাধের রাজত্ব কায়েম করেছে। এদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের মধ্য ও নিম্ন স্তরের নেতা থেকে নিয়ে তাদের সভানেত্রী ও প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই শাস্তির হুংকার ছাড়ছেন। 'অপরাধী যে দলেরই হোক তার রেহাই নেই'– প্রধান মন্ত্রীর এ কথা শুনতে শুনতে লোকজন এখন ক্লান্ত। ছাত্র লীগের বিরুদ্ধে তার এ ধরনের সতর্ক বাণী মনে হয় '৫২৫ নম্বর' পার হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেন হয়নি, তার কারণ ওপরের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যবস্থায় 'বেড়াতে ধান খায়' এবং রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে, সেখানে দেশে আজ যেভাবে দুর্নীতি, লুটতরাজ ও খুনখারাবির রাজত্ব কায়েম হয়েছে এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

যুগান্তর : ০৫.০৯.২০১০ ৪.৯.২০১০

www.pathagar.com

রাজনীতির ক্রিমিনালাইজেশন : কী হচ্ছে এই দেশে?

বাঙলাদেশে হচ্ছে কি? গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে এ দেশের প্রেসিডেন্ট ২০ জন ফাঁসির আসামীকে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে কারামুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট যে সরকারের অনুগত লোক ও শিখণ্ডী হিসেবেই এই কাজ করেছেন এ নিয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। কারণ এ দেশে যে কোন ক্ষমতাসীন সরকার প্রশ্নাতীতভাবে তার নিজের আজ্ঞাবহ লোক ছাড়া কাউকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করে না। কাজেই এই অপকর্মের জন্য প্রেসিডেন্টকে সরাসরি দায়ী করার কিছু নেই। এর মূল দায়িত্ব তাদেরই, যাদের নির্দেশে প্রেসিডেন্ট এ কাজ করেছেন।

আইন মন্ত্রণালয় উপরোক্ত ২০ জন ফাঁসির আসামীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করে পাঠিয়েছিল। সেই সুপারিশের পর প্রেসিডেন্ট তা শিরোধার্য করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এই কর্ম সম্পাদন করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে ফাঁসির আসামীদের এইভাবে ক্ষমা করে দিয়ে জেলমুক্ত করা হয়েছে, তারা সবাই আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মী। এই আসামীদের রাজনৈতিক পরিচয়ই এদের ক্ষমাপ্রাপ্তি ও জেল মুক্তির কারণ। এরা আওয়ামী লীগের লোক। এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখা যায় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এভাবে এতোজন ফাঁসির আসামীকে ক্ষমা করে দেয়ার কোন কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। শুধু তাই নয়, সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এ ব্যাপারে খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ক্ষমা ঘোষণার কারণ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। কেন নেই? দেশে আইন-আদালত আছে। সেই আদালতের রায় যেমন কতগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, তেমনি প্রেসিডেন্ট যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন তখন সেই সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে ক্ষমা কেন করা হলো, তার কারণও প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে এবং তার কাছে সুপারিশ দেনেওয়ালা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। এই ব্যাখ্যা পাওয়া জনগণের এক গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা-রাজড়ারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ইচ্ছেমত লোকজনের গলা কাটত এবং সব রকম অন্যায় করে জবাবদিহিতা ও শাস্তির ঊর্ধ্বে থাকত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নামে পরিচয়দানকারী কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোন স্বৈরাচারী শাসক নন। তাকে স্বেচ্ছাচার করার জন্য প্রেসিডেন্টের গদিতে বসানো হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কারণ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। (ডেইলি স্টার, ৮.৯.২০১০)। এই ঔদ্ধত্যের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবের আচরণের বিচার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কারণ প্রেসিডেন্টকে ক্ষমা ঘোষণার অধিকার সংবিধান অনুযায়ী দেওয়ার অর্থ আগেকার

www.pathagar.com

দিনে রাজা রাজড়াদের মতো স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা দেয়া নয়। কাজেই স্বেচ্ছাচারী হিসেবে নয়, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন প্রেসিডেন্টকে দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে, তাঁর প্রত্যক কাজের জবাবদিহিতা ও ব্যাখ্যা জনগণের সামনে অবশ্যই উপস্থিত করতে হবে। তিনি যদি এ ব্যাপারে ক্ষেত্র বিশেষে নিজের দায়িত্ব অবহেলা করে গুরুতর কোন অপরাধ করেন তার জন্য তার অভিশংসন বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থাও সংবিধানে আছে। এটা আছে এ কারণে যে, প্রেসিডেন্টসহ কেউই একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে আইনের উর্ধ্বে নয়। আসলে রাষ্ট্র যেভাবেই পরিচালিত হোক, গণতান্ত্রিক চেহারা বজায় রাখার জন্য এ ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়ে থাকে। বাঙলাদেশের সংবিধানেও আছে। এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে এই আলোচনার কারণ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির থাকলেও তিনি স্বেচ্ছাচারীর মতো এ কাজ করতে পারেন না। কোন স্বৈরাচারী প্রধান মন্ত্রী বা সরকারী মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ বা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলে দেশের প্রচলিত সংবিধান অনুযায়ী তাকে জনগণের কাঠগড়ায় অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। ২০ জন আওয়ামী লীগ দলীয় খুনের আসামীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তির ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রপতি এখন জনগণের কাঠগড়াতেই নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন।

মুক্তি পাওয়া ফাঁসির আসামী নলডাঙ্গা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম ফিরোজ বলেছেন, 'মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘদিন পলাতক থেকে আমরা আদালতে আত্মসমর্পণ করি। এরপর রাষ্ট্রপতির কাছে সাধারণ ক্ষমার জন্য আবেদন করি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার অফিস হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদনগুলো পৌঁছলে তিনি আমাদের সাধারণ ক্ষমা করেন।' (কালের কণ্ঠ, ৮.৯.২০১০)। এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, আইনের হাতের বাইরে লুকিয়ে থেকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের আশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই এই ফাঁসির আসামীরা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আদালতে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর সরকার প্রদত্ত আশ্বাসের ভিত্তিতে আসামীরা প্রেসিডেন্টের কাছে সাধারণ ক্ষমার জন্য আবেদন করে। এই প্রক্রিয়াতে ২০ জন ফাঁসির আসামী এক অদৃষ্টপূর্ব প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে। পুরো প্রক্রিয়াটিই যে রাজনৈতিক মতলববাজির ব্যাপার, এতে সন্দেহ নেই। এই মতলববাজির খেলায় প্রধান মন্ত্রী, সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাই জড়িত। এটা যে এক রাজনৈতিক ব্যাপার, এর সঙ্গে যে আইনী প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই, এটা বোঝা যায় সাজাপ্রাপ্ত ফাঁসির আসামীদের মুক্তি লাভের পর আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাদের সংবর্ধনার মাধ্যমে। কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় 'মুক্তিপ্রাপ্তদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করলেন ক্রীড়া প্রতি মন্ত্রী' এই শিরোনামে এক সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে সাজাপ্রাপ্ত ক্রিমিনালদের মুক্তির পর শুধু যে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়েছে তাই নয়; তাদের এক সমাবেশে গণসংবর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে যার অনুষ্ঠান হবে আজ ৮ সেপ্টেম্বর।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, এভাবে ফাঁসির আসামীদের ক্ষমা লাভ করে মুক্তি বাঙলাদেশে এখন ক্রিমিনালদের জয় জয়কার এবং তাদের রাজত্ব এদেশে কায়েম হওয়ার কথাই ঘোষণা করছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগের সাজাপ্রাপ্ত আসামী থেকে নিয়ে যাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ঘোরতর দুর্নীতির মামলা ছিল সবাই সরকারী ক্ষমতার জোরে নিজেদের কলঙ্ক মোচনের ব্যবস্থা করছে। যেভাবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে মামলা পাইকারি হারে আদালতকে দিয়ে খারিজ করা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগে কোন দুর্নীতিবাজ, চোর, ঘুষখোর, কমিশনখোর নেই। তারা সবাই সাধুসন্তু, তাদের সবারই চরিত্র 'ফুলের মতো পবিত্র'। প্রধান মন্ত্রী থেকে নিয়ে আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা যেভাবে প্রত্যাহার করা হযেছে, তাতে এছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কাজেই আগে যেসব ক্রিমিনাল আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-নেত্রী-কর্মীরা গলায় মামলা ঝুলিয়ে ও জেলের ভাত খেয়ে জীবন অতিবাহিত করছিল, আওয়ামী লীগ সরকারের 'সুবিচার' পেয়ে এখন মামলার পরিবর্তে তাদের গলায় ফুলমালা শোভা পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ২০ জন ফাঁসির আসামী প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি লাভের পর আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্য হলো 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী'।

সত্য বলতে এই আওয়ামী লীগ নেতারা যাই ভেবে থাকুন, এই সত্য আসলে হচ্ছে এই যে, বর্তমান বাঙলাদেশে রাজনীতির ক্রিমিনালাইজেশন বা অপরাধিকীকরণ প্রক্রিয়া এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা– এমনকি সাংস্কৃতিক তৎপরতা পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রে নিজের জয়জয়কার ঘোষণা করছে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২০ জন সাজাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ দলীয় লোকদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা মধ্যে ক্রিমিনালদের এই জয়ধ্বনিই শোনা যাচ্ছে।

আমার দেশ : ০৯.০৯.২০১০ ৮.৯.২০১০

www.pathagar.com

শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও বাঙলাদেশে ফ্যাসিবাদ

দেশে অপরাধ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে, এ কথা বলতে গিয়ে ঢাকা রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি ১৫ সেপ্টেম্বর নিজের সেগুনবাগিচা কার্যালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সামনে অনেক কিছু বলেন। তার মধ্যে দুটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। অপরাধ কারা করছে এ প্রসঙ্গে পুলিশ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পুলিশ ফেনসিডিল পান করছে'। এছাড়া গার্মেন্টি মালিকদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ঈদের আগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুরে বেশ কয়েকটি পোশাক তৈরীর কারখানা মালিক রমজান শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে গা-ঢাকা দেন'। (আমার দেশ, ১৬.৯.২০১০) এভাবে অপরাধের এবং অপরাধীর তালিকা দিতে গিয়ে উপরোক্ত পুলিশ কর্মকর্তা দেশে অপরাধ মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকার পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের দ্বারা কৃত কোন অপরাধের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, পুলিশেরই অপরাধের কথা, যে পুলিশকে নিযুক্ত করা হয় শ্রমিকদের 'অপরাধ' দমনের উদ্দেশে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের দেশের সব থেকে বিপজ্জনক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত এবং আখ্যায়িত করে এ দেশের 'গণতান্ত্রিক' সরকার শিল্পাঞ্চল পুলিশ গঠন করে শ্রমিকদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করেছে। নোতুনভাবে গঠিত এই শিল্পাঞ্চল পুলিশ বাহিনীকে অল্প দিনের মধ্যেই বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে, বিশেষত গার্মেন্ট শিল্পাঞ্চলে মোতায়েন করা হবে।

সরকারের চোখে শ্রমিকরা অপরাধী এ কারণে যে, তারা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে মনুষ্যোচিত মজুরি দাবি করেন। তারা দাবি করেন, কোন বকেয়া না রেখে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মজুরি পরিশোধের, একইভাবে ওভারটাইম মজুরি পরিশোধের। তারা দাবি করেন, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। তারা দাবি করেন, রীতি ও নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগপত্রের ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার। এসব ন্যায্য দাবিই সরকারের চোখে অপরাধ! এ ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকরাই হলেন সরকারের কাছে সব থেকে বড় চিহ্নিত অপরাধী। সরকারের এই শ্রমিক বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রমিক শোষণ ও দমন-পীড়ন নীতি যে ১০০ ভাগ শিল্প মালিকদের স্বার্থে এ নিয়ে কোন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সন্দেহ থাকার কথা নয়। সরকার মালিকদের পক্ষে থেকেই, মালিকদের সরকার হিসেবেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শত্রুতার বশবর্তী হয়েই কাজ করছে।

প্রত্যেক সরকারই গার্মেন্টি শিল্পকে দেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী বলে বাহবা দেয় এবং এই শিল্প মালিকদের যত ধরনের সম্ভব ছাড় দিতে কার্পণ্য করে না। শ্রমিকদের চরমভাবে শোষণ ও শ্রমিকদের এর বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য সরকার গার্মেন্টি শিল্পে আইএলও'র নিয়ম-কানুন কার্যকর করা থেকে মালিকদের অব্যাহতি দিয়েছে। এ কাজ যে সম্পূর্ণ বেআইনি এ নিয়ে সরকারের কোন মাথা ব্যথা

www.pathagar.com

নেই। শুধু তাই নয়, এটা আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের এমন এক দৃষ্টান্ত, যাকে অপরাধ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গার্মেন্টস শিল্প মালিকরা সরকারকে কোন ট্যাক্স দেন না। সব থেকে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে সরকার তাদের ট্যাক্স প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়েছে! জনগণের পকেট মেরে এ কাজ করতে কোন সরকারেরই অসুবিধা হয় না।

গার্মেন্ট শিল্প দেশের সব থেকে বেশী বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে যে অবদান রাখে, তাতে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের থেকে বেশী অবদান আর কারও নেই। অতি অল্প মজুরিতে, সর্বপ্রকারে অধিকারবঞ্চিত থেকে তারাই এই শিল্পের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভূমিকার কোন স্বীকৃতি মালিকদের পক্ষ থেকে ও তাদের সরকারের পক্ষ থেকে নেই। এদের উভয়ের চোখেই শ্রমিকরা বাঙলাদেশের অপরাধের জগতে এমনই অপরাধী যার কারণে তাদের শায়েস্তা করা ও শাস্তি দেয়ার জন্য সরকার মালিকদের প্ররোচনায় এখন শিল্প পুলিশ গঠন করেছে।

পুলিশের উপরোক্ত বড় কর্তা দেশে অপরাধের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে গার্মেন্ট শিল্প মালিকরা কীভাবে ঈদের সময়েও শ্রমিকদেরকে তাদের পাওনা মজুরি ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়, সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে কতিপয় অঞ্চলের কথা বলেছেন, তাছাড়া আরও অনেক অঞ্চলে অনেক গার্মেন্ট শিল্প মালিকই শ্রমিকদের সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করেন, তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখে সরকারের কোলে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ থাকেন। তারা শ্রমিকদের এভাবে কম মজুরিতে নিযুক্ত রাখার কারণ হিসেবে নিজেদের ক্ষতির কথা, সমগ্র গার্মেন্ট শিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন কিন্তু দেখা যায়, তারাই কোটি কোটি টাকা মূল্যের গাড়ির খরিদ্দার হিসেবে এ দেশের ধনিক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শীর্ষস্থানে থাকেন।

এবার আসা যেতে পারে শিল্প পুলিশ গঠনের অন্য একটি দিক প্রসঙ্গে। বাঙলাদেশে জনগণের ওপর খবরদারির জন্য সশস্ত্র বাহিনীর অভাব নেই। পুলিশ ছাড়াও এখানে আছে আনসার ও র‍্যাব। বিডিআরকেও প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এরা থাকা সত্ত্বেও শিল্পাঞ্চলের জন্য বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল? এসব এলাকায় কোন আইন-শৃঙ্খলাগত সমস্যা দেখা দিলে পুলিশই বরাবর সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। আনসারকেও এ কাজে ব্যবহার করা হয়। র‍্যাব গঠিত হওয়ার পর থেকে শ্রমিক অঞ্চলে র‍্যাবকেও ব্যবহার করা হয়। এরপরও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের 'অপরাধ' দমনের জন্য বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপুর্ণ এবং এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। বিশেষত এ কারণে যে, দেশে অনেক রকম সশস্ত্র বাহিনী এতদিন পর্যন্ত শিল্পাঞ্চলে ব্যবহার করা সত্ত্বেও একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র বাহিনী গঠন এক ব্যতিক্রমী ব্যাপার। কারণ শুধু শ্রমিকরাই দেশের একমাত্র অধিবাসী নন। সারাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটি কোটি লোক কর্মরত আছেন। এসব ক্ষেত্রেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতে যা বলা হয় সেটা স্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে চিকিৎসার বিষয়, সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর কথা, পরিবহন ব্যবস্থার কথা, এমনকি অফিস-আদালতের কথা। এসব ক্ষেত্রে যে আকারে-প্রকারে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস হয়ে থাকে তার তুলনায় শ্রমিক অঞ্চলে দুর্নীতি এবং অপরাধ বলতে বুঝায় তার কিছুই নেই। তাদের আছে শুধু বাঁচার লড়াই, নিম্নতম অধিকার আদায়ের লড়াই। এ লড়াই দমনের জন্য মালিকদের স্বার্থে আজ সরকার বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করেছে। কিন্তু তুলনায় অনেক বেশী অশান্ত এবং প্রকৃত অপরাধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার জন্য সরকারের বিশেষ বাহিনী নেই। শিল্পাঞ্চলের জন্য সরকার যেভাবে বিশেষ পুলিশ গঠন করেছে ও যে যুক্তিতে করেছে তার থেকেও অনেক শক্তিশালী যুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্যও বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতেই শুধু নয়, এর বাইরেও ছাত্র লীগ, যুব লীগ, খোদ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা যেভাবে লুটতরাজ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মতো অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে তা দমন করার জন্যও তাহলে দরকার বিশেষ পুলিশ বাহিনী। কারণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ পুলিশ যদি শিল্পাঞ্চলে 'অপরাধ' দমনে অপারগ হয় তাহলে তার থেকে অনেক বেশী অপারগ তাদের দেখা যাচ্ছে এই দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ এবং দমন ক্ষেত্রে। এরা দেশব্যাপী অপরাধের বিস্তৃতি যেভাবে ঘটাচ্ছে দেশের ইতিহাসে তার কোন তুলনা বা পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

শিল্পাঞ্চল পুলিশের বিষয়ে ফিরে এসে আবার বলা দরকার যে, শ্রমিকদের 'অপরাধ' নিয়ন্ত্রণ ও দমন নয়, তাদের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে, তাদের ওপর চরম শোষণ-নির্যাতন জারী রেখে, গার্মেন্টি মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফার লালসা চরিতার্থের জন্য সরকার যেভাবে জনগণের ট্যাক্সের পয়সা খরচ করে এই বাহিনী গঠন ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে জাতীয় স্বার্থ, গণতন্ত্র ইত্যাদির নামগন্ধ নেই। এ হলো সরকারের ও সেই সঙ্গে সমগ্র লুণ্ঠনজীবী শাসক শ্রেণীর ফ্যাসিস্ট চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বাঙলাদেশে এদের ফ্যাসিবাদ এখন সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে হিংস্র থাবা বিস্তার করে আছে শিল্পাঞ্চল পুলিশ সেই ফ্যাসিবাদেরই এক প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত।

সমকাল : ২১.০৯.২০১০ ২০.৯.২০১০

www.pathagar.com

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফেরত যাওয়া প্রসঙ্গে

বাঙলাদেশে আদালত, বিশেষত শীর্ষ আদালত পর্যন্ত এখন যেভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে এটা সমগ্র বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ একটি দেশের বিচার ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সে দেশের শাসনব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। উপরন্তু তারই অংশ ও সেই হিসেবে তার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিছুদিন আগে বাঙলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেছেন। এই বাতিল বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের আলোচনা সব মহলেই শুরু হয়েছিল এবং এখনও চলছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার কথা বলা হলেও সামগ্রিকভাবে তা বাতিল হয়নি। এভাবে বাতিল না হওয়া অংশের মধ্যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমও আছে। আদালত এটা বাতিলের বাইরে রেখেছেন। কিন্তু এটা বাতিল না করার যৌক্তিকতা আদালতের পরিবর্তে জোরেশোরে দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান সরকারের প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের অনেক দলীয় নেতা। এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য হলো এই যে, বিসমিল্লাহ বাদ দেয়াটা বাস্তবসম্মত নয়। বাস্তব কারণেই সংবিধানের মুখবন্ধে বিসমিল্লাহ রাখার প্রয়োজন আছে। এই বাস্তব কারণটি হলো, বাঙলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই এটা রাখা দরকার। তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিসমিল্লাহ না রাখা বাস্তবসম্মত কাজ ছিল না। তারা সংবিধান প্রণয়নের সময় যে অবাস্তব কাজ করেছিলেন তার সংশোধন করেছিলেন জিয়াউর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের সেই বাস্তব কাজের অনুমোদন দিচ্ছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার!

এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথা হলো, একটি রাষ্ট্র নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করলে তার সংবিধানে বিসমিল্লাহর মতো বিষয় রেখে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি যে পক্ষপাতীত্ব করা যায় না, এটা স্বতঃসিদ্ধ। এ নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। কাজেই যখনই সংবিধানে বিসমিল্লাহ বাস্তবসম্মত হিসেবে অথবা অন্য কারণে রাখা হচ্ছে, তখন এটা অবধারিতভাবে আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে না। এর একটা ধর্মীয় চরিত্র অবশ্যই থাকছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে অন্য কথাও আছে। সংবিধান সংশোধন করে একে আবার ১৯৭২ সালের আদিরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখন যে উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তা বা শোরগোল শোনা যাচ্ছে

www.pathagar.com

তাতে মনে হওয়ার কথা যে, তারা এরশাদ সরকারের আমলে প্রবর্তিত অষ্টম সংশোধনীও সরাসরি বাতিল করবেন। কারণ এই সংশোধনীতে ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যতই বাকচাতুর্য প্রয়োগ করে আওয়ামী ঘরাণার বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বুদ্ধির পরিচয় দেন বাঙলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং বাঙলাদেশ একটি ইসলামী রাষ্ট্র এই দুই কথার মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। কাজেই অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে এরশাদ তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ চাতুর্যে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে বাঙলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবেই ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণার ফলে বাস্তবত দেশের অথবা এরশাদের নিজের চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটেনি। ঘটার কথাও ছিল না। কারণ, এরশাদের জীবনযাপনের সঙ্গে যেমন ইসলামের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং এখনও নেই, তেমনি জনগণেরও ইসলাম নিয়ে মাতামাতির মতো কোন অবস্থা নেই। তারা নিজেদের ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে ভাবতেই ব্যস্ত এবং এই ভাবনার কোন কুল কিনারা তাদের নেই। তবে এভাবে ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম বাঙলাদেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার পর এর থেকে শুধু জামায়াতে ইসলামী নয়, বাঙলাদেশের সমগ্র শাসক শ্রেণীই যে ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করে আসছে, এতে সন্দেহ নেই। যাদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল তাদের এ সন্দেহের নিরসন হয়েছে আওয়ামী লীগ কর্তৃক একদিকে ১৯৭২ সালের সংবিধানকে তার আদিরূপে ফেরত নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, অন্যদিকে সংবিধানে জিয়াউর রহমান কর্তৃক বিসমিল্লাহ রাখা এবং এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিপূর্ণ অনুমোদন দেয়া ও তা বাতিল না করার সিদ্ধান্ত। এসবেরই লক্ষ্য যে নির্বাচনে ভোটপ্রাপ্তির কৌশল এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনগণ যে এর কোন পরোয়া করেন না এর প্রমাণ তারা রেখেছেন নিজেদের ১৯৯০ সালের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'কে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ কারণে বারবার নির্বাচনে পরাজিত করে। এদিক দিয়ে বলা চলে যে, সংবিধানে বিসমিল্লাহ রেখে ও বাঙলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করে কার্যক্ষেত্রে কোন দলেরই ভোটের বাজার গরম করা সম্ভব হয়নি। এদিক দিয়ে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্য কোন দলেরও লাভ হবে না। যারা এটা ভাবে তাদের জানা নেই যে, বাঙলাদেশের জনগণের চিন্তার মধ্যে যতই পশ্চাদপদতা থাকুক তারা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করতে আর মোটেই আগ্রহী নন। এদিক দিয়ে বাঙলাদেশের জনগণের মতো ধর্মনিরপেক্ষ জনগোষ্ঠী তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশেই নেই, যদিও এখানকার লুম্পেন শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্মকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে বাঙলাদেশের জনগণকে সাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত করার চেষ্টায় বরাবর নিয়োজিত থেকেছে এবং তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীরাও এই একই বিষয়ে খুব কৌশলের সঙ্গে ঘ্যান ঘ্যান করে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে বাঙলাদেশের জনগণকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছে এবং এখনও আছে।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশের সদ্য নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি তার কার্যভার গ্রহণের পরপরই এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর সংবিধান তার আদিরূপে ফেরত গেছে! এ কথার পর তিনি সংবিধান নোতুন করে ছাপার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন! প্রধান নিচারপতির মতো একজন উচ্চমার্গের আইনজ্ঞ ও দেশের আইন ব্যবস্থার অভিভাবক কীভাবে এই উক্তি করতে এবং অনুরোধ জ্ঞাপন করতে পারেন এটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এ ধরনের কথা তার মুখে শোভা পায় না। শুধু তাই নয়। এটা এতই অশোভনীয় এবং ভ্রান্ত ব্যাপার যে, দল নিরপেক্ষভাবে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এর প্রতিবাদ করেছে। তাদের কথা হলো, আদালত সংবিধান বিষয়ে কাটসাট দিতে পারেন, কিন্তু সংবিধান সংশোধনীর সাংবিধানিক কোন এখতিয়ার আদালতের নেই। সে কাজ জাতীয় সংসদের এবং জাতীয় সংসদকেই সেটা করতে হবে।

কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মহলের কথা হলো, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে আদালত যে কাজ করেছেন, সেটাকেই সংবিধানসম্মত করার জন্য তাকে জাতীয় সংসদে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। কাজেই পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে আদালত যে রায় দিয়েছেন তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন বিরোধ নেই। তারা শুধু চান এই বাতিল কর্মকে জাতীয় সংসদে অনুমোদন দিয়ে জায়েজ করিয়ে নিতে।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, এর দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাঙলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের আদিরূপে মোটেই ফেরত যায়নি। মনে রাখা দরকার যে, আদালত পঞ্চম সংশোধনী পুরোপুরি বাতিল না করে তাকে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী আংশিকভাবে বাতিল করেছেন। তারা সংবিধানের মুখবন্ধে বিসমিল্লাহ বহাল রেখেছেন। সরকারও এর পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে। কিন্তু বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রেখে যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের আদিরূপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় না, এটা আগেই বলা হয়েছে।

এছাড়া অন্য প্রশ্নও আছে। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে চরম অগণতান্ত্রিক চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করে একদলীয় সরকার ইত্যাদির স্থানে বহুদলীয় সরকার ব্যবস্থা ফেরত আনা হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনীর কিছু অংশ মোশতাক ক্ষমাসীন হয়ে অ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাতিল করেছিলেন। বাকি অংশ জিয়াউর রহমান বাতিল করেছিলেন পঞ্চম সংশাধনীর মাধ্যমে। এখন পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর চতুর্থ সংশোধনী স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আবার ফেরত এসেছে। কাজেই ১৯৭২ সালের আদিরূপে ফেরত যেতে হলে শুধু জিয়াউর রহমান কৃত পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করলেই হবে না, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান যে চতুর্থ সংশোধনী, দ্বিতীয় সংশোধনী ইত্যাদি করেছিলেন, সেগুলোও বাতিল করতে হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নীতির অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য যাই থাক, প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলে দেশের ৮০ ভাগের ওপর শিল্প-ব্যবসা জাতীয়করণ করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান তার সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র উঠিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফেরত যেতে হলে সেই সমাজতন্ত্রের কী হবে? সমাজতন্ত্রের কথা বলে যেসব শিল্প-বাণিজ্য ব্যক্তিগত খাতে দেয়া হয়েছিল সেগুলো কি এখন আবার রাষ্ট্রীয় খাতে ফেরত আনা হবে? তাছাড়া এখন থেকে আবার রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্প-বাণিজ্য শুরু করার ব্যবস্থা হবে, না সমাজতন্ত্রের অবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতার মতোই দাঁড়াবে? আওয়ামী লীগ ও তাদের সরকার তো গোড়ারও খাবো আগারও খাবো নীতিতে বিশ্বাসী হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা যেভাবে বজায় রেখেছে, তাতে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে বজায় রাখা কি তাদের দ্বারা সম্ভব? শুধু আওয়ামী লীগই নয়, বাঙলাদেশের লুম্পেন শাসক শ্রেণীর কোন অংশের, কোন দলের পক্ষেই কি সেটা সম্ভব? তাহলে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেই লাফ মেরে ১৯৭২ সালের আদি সংবিধানে ফেরত যাওয়ার কথা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবিধানিক আইনজ্ঞ হিসেবে প্রচারিত ড. কামাল হোসেন ও বর্তমান প্রধান বিচারপতি যা বলছেন তার কি কোন মাথামুন্ডু আছে?

শেষ করার আগে অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ অবশ্যই দরকার। বাঙলাদেশে এখন আদালত কথায় কথায় Contempt of Court বা আদালত অবমাননার দায়ে মানুষকে অভিযুক্ত করছেন, শাস্তিও দিচ্ছেন। শুধু সর্বোচ্চ আদালতই নন, নিম্ন আদালতগুলোও তাই করছেন। দু'এক দিন আগে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসককে এভাবে অভিযুক্ত করে আদালত তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন। ক্ষমা না চাইলে তাকে শাস্তি পেতে হতো, যেমন শাস্তি পেতে হয়েছে 'আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে। মাহমুদুর রহমানকে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। কারণ তিনি বলেছেন যে, চেম্বার আদালত মানেই হলো Stay করার আদালত। এটা কী এমন ব্যাপার ছিল যার জন্য একজন পত্রিকা সম্পাদক, এমনকি দেশের কোন সাধারণ নাগরিককেও কারাবাসের দণ্ড দেয়া চলে? বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বর্তমান প্রধান বিচারপতি তার কার্যভার গ্রহণ করে মাহমুদুর রহমানের মতো একইভাবে বলেছেন যে, চেম্বার আদালত মানেই হলো Stay করার ব্যাপার। যে কথা বলার জন্য মাহমুদুর রহমানের শাস্তি হয়েছে, সেখানে একই কথা বলার জন্য খোদ প্রধান বিচারপতি, দেশের আইন ব্যবস্থার অভিভাবকের কী হবে? এর থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে কেস খাড়া করে আদালত অবমাননার দায়ে যেভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে আদালতের সম্মান অথবা অবমাননার কোন সম্পর্ক নেই। এটা হলো প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণতারই এক কুৎসিত ব্যাপার, যার প্রতিফলন ঘটেছে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মধ্যে।

Contempt of Court এখন বাঙলাদেশে যেভাবে হচ্ছে এটা কোন সভ্য দেশে হওয়ার কথা নয়। কারণ আদালতের যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনি এ ক্ষমতা ব্যবহারের শর্তও আছে যে কোন আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রে। এটা মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অধিকারের সঙ্গেও সম্পর্কিত। কাজেই সংবিধানে আদালত অবমাননার জন্য মানুষকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা যেমন আদালতের আছে, তেমনি এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার

www.pathagar.com

কোন সুযোগও আদালতের নেই। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের বিচারক লর্ড ড্যানিংয়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা দরকার। লন্ডনের এক সান্ধ্য ট্যাবলয়েড পত্রিকায় কোন এক প্রসঙ্গে তাকে 'গাধা' বলা হয়েছিল। তার সেক্রেটারি এ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাকে পত্রিকাটি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট বা বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কোন দিন কাউকে Contempt of Court এর জন্য অভিযুক্ত করবেন না। কারণ এর প্রয়োজন ছিল এমন এক সমাজে যখন মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না, তাদের অধিকার স্বীকৃতও ছিল না। কিন্তু অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে তিনি তার অধিকারের বাইরে কিছু করছেন মনে করার কারণ নেই। আদালত অবমাননার বিষয়টি অতীতের আইন ব্যবস্থার অবশেষ হিসেবে টিকে থাকলেও মানুষের স্বাধীনতার অধিকার যেখানে স্বীকৃত ও মতামতের অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানে কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে কিছু বললে সভ্য দেশে শাস্তি কারও প্রাপ্য হয় না। এরপর থেকে অনেক দিন ধরে ইংল্যান্ডে আজ পর্যন্ত Contempt of Court-এ কারও শাস্তি হয়নি।

সমকাল : ০৫.১০.২০১০ ৪.১০.২০১০

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জের ট্রেন দুর্ঘটনা এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া

অক্টোবরের ১১ তারিখে যমুনা ব্রিজ থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে সিরাজগঞ্জে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। বিএনপি আয়োজিত একটি জনসভার কার্যক্রম চলতে থাকার সময় বহু লোক রেললাইনের ওপর ছিলেন। কারণ তার একেবারে পাশেই ছিল জনসভার স্থান। রেললাইন থেকে মাত্র পনের গজ দূরেই ছিল সভা মঞ্চ। একটি বড় জনসভার জন্য রেললাইনের একেবারেই পার্শ্ববর্তী কোন জায়গা নির্বাচন যে সঠিক ও স্বাভাবিক বুদ্ধির কাজ, এটা বলা যাবে না। তাছাড়া এভাবে সভার স্থান নির্বাচন করলেও তার জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সভা আয়োজনকারীদের নিজেদের পক্ষ থেকে করা দরকার ছিল তার কিছুই করা হয়নি। সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি সভাপতির কথা অনুযায়ী তারা পুলিশকে জনসভার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ওই নিরাপত্তা বলতে তারা মনে করেছিলেন আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য হামলা থেকে সভাকে রক্ষা করা। কারণ অক্টোবরের ১ বা ২ তারিখে উল্লাপাড়ায় জনসভার জন্য বিএনপি স্থানীয় প্রশাসন থেকে অনুমতি পাওয়ার পর ওই একই স্থানে এবং একই সময়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ তাদের দলের একটি জনসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। (Daily Star, 12.10.2010)। আওয়ামী লীগের এই ঘোষিত সভার অনুমতিও স্থানীয় প্রশাসন থেকে দেয়া হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে এই পরিস্থিতিতে বিএনপি তাদের জনসভা উল্লাপাড়া থেকে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থান নির্বাচন করেছিল। আগেই বলা হয়েছে, ওই স্থান নির্বাচন সঠিক ও স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল না। আবার অন্যদিকে এটা অবশ্যই ভাবা দরকার, পূর্ব অনুমতিপ্রাপ্ত একটি জনসভার স্থানে আওয়ামী লীগ যেভাবে একই সময়ে তাদের দলীয় জনসভার ঘোষণা দিয়েছিল, তাকে দুরভিসন্ধিমূলক ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। বিএনপি'র জনসভায় হামলার উদ্দেশ্য ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল– এটা মনে করার কারণ নেই। ১১ অক্টোবর উল্লাপাড়া থেকে বিএনপি তার সভাস্থল সিরাজগঞ্জে সরিয়ে আনার পর উল্লাপাড়ায় আওযামী লীগ তাদের জনসভা অনুষ্ঠান করেছিল, এমন খবর কোন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়নি। মনে হয় বিএনপির জনসভার ওপর হামলার উদ্দেশ্যেই যেহেতু ওই পাল্টা জনসভা আহবান করা হয়েছিল, সে কারণে বিএনপি তাদের সভাস্থল পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ তাদের ঘোষিত জনসভা আর করেনি।

সিরাজগঞ্জের সায়েদাবাদে জনসভার দ্বিতীয় স্থান নির্বাচন সম্পর্কে বিএনপি উপরোক্ত নেতা বলেন, ওই স্থান রেললাইনের ধারে হলেও জনসভার নির্ধারিত সময় বিকাল ৩টা

www.pathagar.com

থেকে ৬টা পর্যন্ত সায়েদাবাদ স্টেশন দিয়ে কোন ট্রেন ছিল না। ঢাকামুখী দ্রুতযান এক্সপ্রেস ওই জায়গা বেলা আড়াইটার সময় অতিক্রম করার কথা। কাজেই ট্রেন থেকে কোন বিপদের আশংকা তারা করেনি। (Daily Star, 12.10.2010)। বাঙলাদেশে বসবাস করে ট্রেনের সময় রক্ষা বিষয়ে বিএনপি নেতার ধারণা বিস্ময়কর। আড়াইটায় ট্রেন আসার কথা, কাজেই ট্রেন আড়াইটার সময়ই আসবে এমন ধারণা স্বাভাবিক নয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। দিনাজপুর থেকে ট্রেনটি সময় মতো না ছেড়ে দেরিতে ছাড়ার কারণে সেটি সায়েদবাদ পৌঁছেছিল ৩টার পর।

এখানে আরও কথা আছে। যে কোন জনসভা যখন শুরু হওয়ার কথা থাকে তার আগে থেকেই লোকজন সভাস্থলে জড়ো হতে থাকেন। বড় জনসভার ক্ষেত্রে এটা আরও প্রযোজ্য। স্থানীয় বিএনপি বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার সফর উপলক্ষে এক বিশাল জনসভার আয়োজনই করেছিল এবং সেই সভায় যোগদানের জন্য বহু লোক তিনটার আগে থেকে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেছিলেন এবং সভাস্থল রেললাইনের একেবারে পার্শ্ববর্তী হওয়ায় অনেক মানুষ রেললাইনের ওপরও ছিলেন।

জনসভার স্থান এভাবে নির্ধারণ করার পর বিএনপি'র স্থানীয় নেতৃত্ব জনসভার নিরাপত্তা বলতে শুধু আওয়ামী লীগের হামলা থেকে নিরাপদ থাকারই চিন্তা করেছিলেন। তার থেকে বড় বিপদ যে ট্রেন থেকে হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না। কাজেই কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আড়াইটার সময় ট্রেন সায়েদাবাদ অতিক্রম করবে, ওই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার কথা বলেননি। বিএনপি নেতৃত্ব স্থানীয় প্রশাসনকে তাদের জনসভার নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনুরোধ করলেও স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ কেউই রেল কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করেনি।

এসব কিছুকেই আজব ব্যাপার বলা ছাড়া উপায় কী? কিন্তু আজব ব্যাপার হলেও এর কারণ আছে। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক দল থেকে নিয়ে প্রশাসন ও সর্বত্র যে নৈরাজ্য চলছে, যে অব্যবস্থাপনা-দায়িত্বহীনতা সহজেই লক্ষ্যণীয় এটা হলো তারই এক দৃষ্টান্ত।

এতো গেল পরিস্থিতির এক দিক। এর অন্যদিকে হলো, সিরাজগঞ্জের এই ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সুপরিচিত খেওয়াখেয়ী। পরস্পরের প্রতি অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের কুৎসিৎ প্রতিযোগিতা। উল্লাপাড়ায় খালেদা জিয়ার সফর উপলক্ষে জনসভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে একই স্থানে ও সময়ে আওয়ামী লীগের জনসভা ঘোষণার ব্যাপার ছাড়া সিরাজগঞ্জের ঘটনাবলীর অন্য কিছুর মধ্যে বিএনপি বা আওয়ামী লীগের কোন চক্রান্ত ছিল, বিশেষত রেল দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোন দূরভিসন্ধি বা চক্রান্ত ছিল, এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তবু এ দুই দলের পারস্পরিক শত্রুতার কারণে তারা এখন তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তিবিহীন এমন এক তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে যাকে গ্রাম্য মেয়েলি কোন্দল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। মেয়েলি কোন্দলের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এতে পুরুষরাও আছেন।

সিরাজগঞ্জের ওই রেল দুর্ঘটনা এড়ানো এতো সহজেই সম্ভব ছিল, এটা ভাবলে

www.pathagar.com

অবাক হতে হয়। অথচ যারা জনসভা আহ্বান করেছিলেন তাদের এবং সরকারী প্রশাসনের চরম দায়িত্বহীনতার কারণে পাঁচ-ছয়জনের জীবন গেল, অনেকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হলেন, অনেকে আহত হলেন, ট্রেনে ব্যাপক লুটতরাজের ফলে অনেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। ওই পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বোঝার অসুবিধে হয় না যে, বাঙলাদেশে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো এখন যেভাবে ব্যক্তি, পারিবারিক ও দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষমতায় ও ক্ষমতার বাইরে থেকে চেষ্টা করছে, এটাই অন্যতম মূল কারণ যে জন্য সর্বত্র আজ দুর্নীতি, মিথ্যাচার, দায়িত্বহীনতা ও চরম স্বার্থপরতার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সিরাজগঞ্জের ট্রেন দুর্ঘটনার মধ্যে জাতীয় জীবনের যে চরম সংকটের পরিচয় পাওয়া যায়, তার কোন উপলব্ধি শাসক শ্রেণীর এই দলগুলোর মধ্যে কোনটিরই আছে বলে মনে হয় না। নিজেদের কৃতিত্ব জাহির, অন্যদের দোষ-ত্রুটি-অপরাধ নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হওয়া ছাড়া এদের আর কোন রাজনৈতিক করণীয় আছে বলে মনে হয় না। এ এমন এক দেউলিয়াপনা যার কোন প্রতিকার নেই। এই শাসক শ্রেণী ও এদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর শাসন যতদিন এদেশে জারী থাকবে ততদিন এ দেশের জনগণের কোন কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। এমনকি তাদের নিরাপত্তারও কোন প্রশ্ন নেই। কাজেই শাসন ক্ষেত্র থেকে এদের বিতাড়িত করা ছাড়া জনগণের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

আমার দেশ : ১৪.১০.২০১০ ১৩.১০.২০১০

www.pathagar.com

'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় চিন্তার কারণ নেই'

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান সানাউল্লাহ নূর বাবু গত ৮ অক্টোবর শুক্রবার একটি মিছিল পরিচালনার সময় একশ'র বেশী আওয়ামী লীগ কর্মীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। পরদিন সকালে জাতীয় সংবাদপত্রে এ খবর বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়। সেই সঙ্গে ছাপা হয় বাবুকে পিটিয়ে মারতে থাকার দৃশ্য। ভিডিওতেও সেই দৃশ্য ধারণ করা হয়। সারাদেশে এ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৯ অক্টোবর পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খোন্দকার ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারকে বলেন, ভিডিওতে ধারণ করা ছবি থেকে তারা সন্দেহভাজন খুনীদের চিহ্নিত করেছেন এবং এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যও জানতে পেরেছেন। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মীদের দ্বারা স্থানীয় বিএনপি নেতা এবং উপজেলা চেয়ারম্যান বাবুর এ হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্য দিবালোকে বহু লোক ও পুলিশের উপস্থিতিতেই ঘটে। এ কারণে খুনীদের পরিচয় কারও কাছে গোপন থাকেনি। এ হত্যাকাণ্ড যে আওয়ামী লীগের কর্মীদের দ্বারাই ঘটেছে এ মর্মে সংবাদপত্রেও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেত্রী ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ অক্টোবর তাদের দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় বলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান সানাউল্লাহ নূর বাবুর হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়া হবে, তারা যে দলেরই হোক। পরে সাংবাদিকদের সামনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিচার করা হবে। (ডেইলি স্টার, ১০.১০.২০১০)

কোন অপরাধের ঘটনা ঘটলেই শেখ হাসিনা বলে থাকেন, "অপরাধী যে দলেরই হোক তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" কিন্তু তিনি মুখে এ কথা বললেও দেখা যায় অপরাধী তাদের দলের লোক হলে তার কোন শাস্তি হয় না। কারণ তিনি ও তার দলের অন্য নেতা-নেত্রীরা খেয়াল রাখেন যাতে এ ধরনের শাস্তির ব্যাপার না ঘটে। এর ফলে এই দাঁড়ায় যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা অবাধে এবং বেশ নিশ্চিন্তে চুরি, ঘুষ, টেন্ডারবাজি থেকে নিয়ে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত করলেও তাদের কোন শাস্তি হয় না। তাদের গ্রেফতার করা হয় না, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যাতে কোন মামলা না নেয় তার ব্যবস্থা হয়। মামলা হলে সে মামলা খারিজের ব্যবস্থা হয়, এমনকি ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমার মাধ্যমে খালাস করা হয়।

নাটোরের উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের পরও যে এরই পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে এবং খুব নগ্ন ও ন্যাক্কারজনকভাবে হতে হচ্ছে, সেটা এ বিষয়ে হাসিনার পরবর্তী বক্তব্য ও তাদের দলীয় নেতাদের কথা ও কার্যকলাপ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

উপজেলা চেয়ারম্যানের হত্যাকারী যে দলেরই হোক তাকে শাস্তি দেয়া হবে– এ কথা ৯ তারিখে বলার পর ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার শেখ হাসিনা বলেন, ওই বিএনপি নেতাকে

www.pathagar.com

বিএনপিই হত্যা করে তার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চড়াতে চাইছে! ১৩ অক্টোবর সব সংবাদপত্রে হাসিনার এ বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কিভাবে সরকার নাটোরের এ হত্যাকাণ্ডকে সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে প্রচার করে মামলার মোড় ঘুরিয়ে নিজেদের দলের অপরাধীদের রক্ষার জন্য কলকাঠি নাড়ছে, সেটা হাসিনার উপরোক্ত বক্তব্যের পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে আরও স্পষ্ট হচ্ছে।

নাটোরের বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর এলাকার আওয়ামী লীগ এমপি ১৩ অক্টোবর হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত দলীয় কর্মীদের এ মর্মে আশ্বস্ত করেন, হত্যা মামলার কারণে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। বনপাড়া বাইপাসে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "চিন্তার কোন কারণ নেই। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে। হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের কিছুই হবে না। মঙ্গলবার প্রদত্ত প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি আগেকার বিবৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনাদের এর কারণ বুঝতে হবে। প্রধান মন্ত্রীকে প্রকৃত ব্যাপার বোঝানোর জন্য আমরা যথাসাধ্য করছি।" এসব কথা বলেন উপরোক্ত আওয়ামী লীগ এমপি, যিনি আবার নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। (ডেইলি স্টার, ১৪.১০.২০১০)। প্রথমে প্রধান মন্ত্রী অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার কথা বললেও তিন দিন পর হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএনপিকে দায়ী করে নোতুন বক্তব্য দেয়ার পরই তাদের স্থানীয় নেতারা সমাবেশ করে এ বক্তব্য প্রদান করেন। এ বক্তব্যে উপরোক্ত আওয়ামী লীগ নেতা হত্যাকাণ্ডের মামলাকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করে এমপি, পুলিশ ও প্রশাসনকে প্রধান মন্ত্রীর সর্বশেষ বিবৃতি অনুযায়ী কাজ করতে বলেন। তিনি আরও বলেন, তিনি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক নেই। 'কোন আওয়ামী লীগ বা যুব লীগ নেতা বাবুকে হত্যা করেনি' এ কথা বলে তিনি পুলিশ, র‍্যাব, ডিবিকে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করতে এবং তদন্তের নামে তাদের দলীয় লোকদের হয়রানি না করতে বলেন।

ভিডিও ফুটেজে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা জাকিরকে চিহ্নিত করা গেলেও তিনি বলেন, জাকির বাবুকে রক্ষা করার চেষ্টাই করেছিল। বিএনপির মিছিলে তাদের নেতা নিহত হলেন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য আওয়ামী লীগের জাকির সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে রক্ষার চেষ্টা করল– এ গল্প কোন সৎ লোক বিশ্বাস করবে? শুধু তাই নয়, এই বক্তব্যের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া মনোভাব আছে সেটা বিস্ময়কর। কিন্তু বাঙলাদেশের সমগ্র শাসক শ্রেণীর শাসনে, বিশেষত বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনে যেভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে তছনছ হচ্ছে এবং ক্ষমতাসীন মহল থেকে অপরাধীদের রক্ষা করে অপরাধ করতে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, তাতে এর মধ্যে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। রাজনৈতিকভাবে অপরাধের এ বিস্তার সারাদেশে আজ অরাজনৈতিক অপরাধেরও অদৃষ্টপূর্ব বিস্তার ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা দরকার, বনপাড়া বাইপাসে উপরোক্ত আওয়ামী লীগ সমাবেশে স্থানীয় এমপি ছাড়াও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বলেন, দু'একজন বাবু খুন হলেও কিছু হবে না! তিনি পুলিশকে আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা শুনতে ও সে মতো কাজ করতে বলেন। এছাড়া ওই সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়াইগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

প্রকাশনা সম্পাদক শামসুজ্জোহা দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন ইউনিয়নের সক্রিয় বিএনপি কর্মীদের একটা তালিকা তৈরী করতে বলেন। হত্যাকারীদের খোঁজে পুলিশ তাদের বাড়ি তল্লাশি করতে এলে পুলিশকে বেঁধে রাখার জন্যও তিনি তাদের বলেন। (ডেইলি স্টার, ১৪.১০.২০১০)

পুরোপুরি সভ্য দেশ তো নয়ই, সভ্যতার নাম-গন্ধ আছে এমন দেশেও ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের লোকদের পক্ষে এসব কথা প্রকাশ্যে বলার ঘটনা আগে কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু আগে যা কল্পনা করা যেত না, স্বাধীন বাঙলাদেশে এখন সেটা এক নিয়মিত ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শাসক শ্রেণী নিজেকে কিভাবে ও কতখানি ক্রিমিনালাইজ করেছে তার প্রমাণ তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বেপরোয়াভাবে রাখছে। নাটোরের হত্যাকাণ্ড পরবর্তী এসব ঘটনা থেকে অপরাধ এবং অপরাধ জগতের যে চিত্র জনগণের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে তার চরিত্র ভয়াবহ ছাড়া আর কী?

প্রধান মন্ত্রী ১২ অক্টোবরের বক্তব্যে হত্যাকাণ্ডের জন্য বিএনপিকে দায়ী করা এবং তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় আওয়ামী ~~লীগ নে~~তৃত্বের উপরোক্ত সমাবেশ বক্তৃতার পর উপজেলা চেয়ারম্যান হত্যাকাণ্ডের আসামীদের পাকড়াও করার পুলিশী তৎপরতা শিথিল হয়েছে। ওই এলাকার বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার ডেইলি স্টারকে বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার অভিযান ধীরগতি হয়েছে কারণ আওয়ামী লীগ নেতারা দলীয় লোকদের বলেছেন, পুলিশ তাদের বাড়ি তল্লাশি করতে গেলে পুলিশকে বেঁধে রাখা হবে। তারা বলেন, পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এমনিতেই যখন অভিযুক্তদের কাউকে ধরতে পারবে না, তখন এ ধরনের বক্তব্য খুবই হত্যাশাব্যঞ্জক। এর ফলে নাটোরের পুলিশ এখন এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে। অবশ্য এদের কেউ কেউ বলেছেন, তারা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাবেন।

দেশ আজ সব দিক দিয়েই চরম সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে আছে। কিন্তু এ পরিস্থিতির সব থেকে বিপজ্জনক দিক হলো, সরকারী মহলের ক্রিমিনাল কার্যকলাপ। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘুষ, টেন্ডারবাজি, চাকরির ক্ষেত্রে দলবাজি, সন্ত্রাস ও খুনখারাবি– সব রকম ক্রিমিনাল কাজই এভাবে হচ্ছে। এসব কিছু মিলে সমাজ কিভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, নৈরাজ্য সমগ্র সমাজকে কিভাবে গ্রাস করছে তার ধারণা এখনও পর্যন্ত অনেকেরই নেই।

'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি : খুন বাড়ছে' এ শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর প্রথম পৃষ্ঠায় এক দীর্ঘ রিপোর্ট ১০ অক্টোবর প্রকাশ করেছে। এ রিপোর্টে দেশের পরিস্থিতির একটা বিবরণ দেয়া হয়েছে। নাটোরের ঘটনার উল্লেখও এর মধ্যে আছে। শুধু যুগান্তর নয়, এমনকি আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্র-পত্রিকাতেও এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এসব সংবাদ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও শাসক দলের কোন পরোয়া নেই। যেখানে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বলা হয় 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় চিন্তার কারণ নেই'– সেখানে প্রশাসনসহ সমগ্র সমাজের ক্রিমিনালাইজেশন বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার পরিবর্তে তার বিস্তার ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগের সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রীসহ তাদের দলীয় অন্য লোকদের নেতৃত্বে বাঙলাদেশে এখন সেটাই ঘটছে।

যুগান্তর : ১৭.১০.১০ ১৬.১০.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষা-সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নোট বই গাইড বই প্রকাশক ও বিক্রেতাদের মতবিনিময় সভা

বাঙলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি ৪ জানুয়ারী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে পুস্তক ব্যবসা ক্ষেত্রে তারা যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন সে বিষয়ে মতবিনিময়ের জন্য এক সভা আহ্বান করেছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, তারা সংকটের মধ্যে পড়ার কারণ বাঙলাদেশের হাইকোর্ট কর্তৃক এক রায়ের মাধ্যমে নোট ও গাইড বুক নিষিদ্ধকরণ। এর দ্বিতীয় কারণ হলো, সরকার কর্তৃক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেয়ার সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

সুস্থ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন সুশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যতালিকা বা সিলেবাস, তেমনি প্রয়োজন পাঠ্যবইয়ের সহজলভ্যতা। এই দুই শর্ত পূরণ না হলে কোন দেশেই ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষা সম্ভব নয়। বাঙলাদেশে এ দুই শর্তের কোনটিই ঠিকমতো পূর্ণ না হওয়ায় উপরন্তু এর উল্টো পরিস্থিতি বিরাজ করায় এখানে দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও শিক্ষার নিম্নমানতা। বর্তমান পাঠ্য তালিকার মধ্যে পশ্চাৎপদ চিন্তা-ভাবনার প্রাধান্যসহ এর অনেক নেতিবাচক দিক আছে, এ ক্ষেত্রে দলীয়করণ আছে। সুশিক্ষার ক্ষেত্রে এসব গুরুতর প্রতিবন্ধক। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় হাইকোর্টের নোট বই-গাইড বই সংক্রান্ত রায় ও সরকার কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদানের কারণে এ ধরনের পুস্তক ব্যবসায়ীর ব্যবসা সংকট এবং এর বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের চেষ্টা।

এই ব্যবসায়ীদের সংকটের মূল কারণ তারা নোট ও গাইড বই প্রকাশ এবং বিক্রি করে তাদের ব্যবসা চালান। এটি সবারই জানা যে, নোট ও গাইড বইয়ের আশ্রয় নেয়ার অর্থ মূল পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তে লেখাপড়ার জন্য কতকগুলো নিম্নমানের সস্তা পুস্তকের ওপর নির্ভরশীল থাকা। এভাবে নির্ভরশীল থাকা ছাত্রদের সুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক মস্ত প্রতিবন্ধক। এমনিতেই এখানে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলোর মান নিম্ন, তার ওপর সেগুলোকেও বাদ দিয়ে নোট ও গাইড বুকের ওপর নির্ভরশীর হওয়ার অর্থ হলো, সুশিক্ষার পরিবর্তে চরম কুশিক্ষার বৃত্তে আবদ্ধ হওয়া। এটিই হলো বাঙলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটের অন্যতম মূল কারণ।

এ সংকট যে নোট ও গাইড বুক প্রণেতা, প্রকাশক এবং বিক্রেতাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে এসেছে ও এখনও হচ্ছে, এতে সন্দেহের কারণ নেই। কাজেই বাস্তবত দেখা যায় যে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি করেই নোট ও গাইড বুক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং উন্নতি হয়েছে। এই ব্যবসায়ীরা এর থেকে দেড়-দুই

www.pathagar.com

হাজার কোটি টাকা ব্যবসা করছেন। এখন হাইকোর্ট নোট বই ও গাইড বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং সরকার পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে দেয়ার ফলে এদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ পুস্তক ব্যবসায়ীদের এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতিকর নোট বই গাইড বইয়ের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা ও তাদের জন্য বিনামুল্যে বইয়ের ব্যবস্থার কারণে। এখন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য মতবিনিময় সভা আহবান করেছেন। এখানে বলা দরকার, এই পুস্তক ব্যবসায়ীরা এতদিন নিজেরা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রি করে এসেছেন, যদিও এর তুলনায় তাদের নোট বই ও গাইড বইয়ের ব্যবসার আকার অনেক বড় এবং মুনাফা অনেক গুণ বেশী। কাজেই নোট বই নিষিদ্ধ ও বিনামূল্যে সরকার কর্তৃক ছাত্রদের বই দেয়ার কারণে তারা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত।

এখন দেখার বিষয় যে ব্যবসার কারণে দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষা ব্যাহত হয়ে কুশিক্ষা ও কূপমণ্ডুকতার বৃদ্ধি ঘটছে, সে ব্যবসা চালু রেখে দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য টিকিয়ে রাখা দরকার, না এই ব্যবসা বন্ধ করে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিবেশ তৈরী করা দরকার। যে কোন সৎ ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই এক বাক্যে বলবেন যে, এক্ষেত্রে নোট বই ও গাইড বইয়ের প্রকাশক এবং বিক্রেতাদের এই ব্যবসা বন্ধ করাই কর্তব্য। সরকার এমনভাবে চলে ও কাজ করে যে, তাদের কাজ সম্পর্কে ভালো কথা বলা সম্ভবই হয় না। কিন্তু তারা শিক্ষাক্ষেত্রে এখন যে পদক্ষেপ নিয়েছে বা দয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এটি ভালো। এদিক দিয়ে বাঙলাদেশের স্বরাষ্ট্র, আইন, জ্বালানি বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একটু করার যে চেষ্টা তারা নিয়েছেন, সেটি সমর্থনযোগ্য।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা নিজেদের সমিতির মাধ্যমে যা করার চেষ্টা করছেন তা হলো, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য ও সংকট টিকিয়ে রেখে নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থ পূরণ করা। এ ক্ষেত্রে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা এতকাল যে বাণিজ্য করে এসেছেন, সেটি বজায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকট ও নৈরাজ্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা, কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। যেখানে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট বজায় রেখে ও বৃদ্ধি করে কোন ব্যবসা টিকে থাকে সেখানে এ ব্যবসা উচ্ছেদ করাই দরকার।

এ বিষয়ে অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ অবশ্যই দরকার। নোট বই ও গাইড বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে শুধু এ বইগুলোর প্রকাশক ও বিক্রেতারাই সম্পর্কিত নন, এগুলোর রচয়িতাদের সম্পর্ক খুব গভীর। কারণ তারা এগুলো রচনা না করলে পুস্তক ব্যবসায়ীদের দ্বারা এ ধরনের বই প্রকাশ ও বিক্রির প্রশ্ন উঠে না। এসব বইয়ের লেখকরাও যে নোট বই-গাইড বই ব্যবসার সংকটের কারণে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বইয়ের লেখক কারা? এর উত্তর সহজ। এগুলোর লেখক প্রধানত স্কুল-কলেজের এক ধরনের শিক্ষক যারা ছাত্রদের সুশিক্ষা থেকে অসৎ কাজ করে নিজেদের পকেট ভারী করতেই শতগুণ বেশী আগ্রহী ও সক্রিয়। এরা একদিকে যেমন শিক্ষাদান ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ফাঁকিবাজি করে ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের কাছে কোচিংয়ে যেতে বাধ্য করেন, তেমনি এদের মধ্যেই অনেকে নোট বই গাইড বই রচনা করে এর প্রকাশক ও বিক্রেতাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সূত্রে আবদ্ধ হন। এখন এই প্রকাশক-বিক্রেতারা যে সংকটের মধ্যে পড়েছেন, সে সংকট এসব বইয়ের লোকদেরও অর্থাৎ এক ধরনের শিক্ষকেরও। এই শিক্ষকদের নীতিজ্ঞান বলে যে কিছুই নেই সেটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রভাব যথেষ্ট।

বাঙলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্বৃত্তায়ন কীভাবে হয়েছে এটি কোন অজানা ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের পরিচয় আছে। বাঙলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে তার সঙ্গে এই নোট বই-গাইড বই ব্যবসার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এ ব্যবসা শিক্ষকদের এবং এছাড়া অন্য কিছু শিক্ষিত লোককে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সরকার এখন এক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেটা প্রাথমিকভাবে কিছু সাফল্য হয়তো অর্জন করবে, কিন্তু এ সাফল্য তাদের পক্ষে টিকিয়ে রাখা কতখানি সম্ভব হবে এটি ভবিষ্যতে দেখার বিষয়। কারণ এই দুষ্টচক্রের সঙ্গে শাসক শ্রেণী ও সরকারের অসংখ্য লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এবং এ চেষ্টা তারা সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও চালিয়ে যাবে। এ চেষ্টা প্রতিহত করা অবশ্যই দরকার। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের বাধ্য কর দরকার নোট বই গাইড বইয়ের পরিবর্তে ভালো বই, সুশিক্ষার উপযোগী নানা বিষয়ের বই সাধারণ পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা।

যথার্থ শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের ব্যবসায়ী স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে তাদের নিজেদের ব্যবসাকে অন্য ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে, যাতে ছাত্রদের শিক্ষা জীবনকে অসুস্থ না রেখে তাকে সুস্থভাবে গঠন করে তারা নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত করতে পারেন। এজন্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতমানের বই, শিশুপাঠ্য থেকে নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও সাধারণ পাঠকদের জন্য বই প্রকাশের দিকে তাদের দৃষ্টি দিতে হবে। বাঙলাদেশের পুস্তক ব্যবসায় দীর্ঘদিন যে দুর্বৃত্তায়ন চলে আসছে তার অবসান ঘটিয়ে পুস্তক ব্যবসাকে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশের সঙ্গে যদি তারা যুক্ত করতে পারেন তাহলেই শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তারা নেতিবাচকের পরিবর্তে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবেন এবং জনগণের সমর্থন লাভ করবেন। এ কাজ না করে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি মতবিনিময় সভাসহ অন্য কোন পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের নোট বই গাইড বই ব্যবসা আগের মতো চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার পরিণতি তাদের জন্য ভালো হবে বলে মনে হয় না।

সমকাল : ০৫.১.২০১০ ৩.১.২০১০

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসন্ত্রাস

১৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র দলের দুই অংশের মধ্যে প্রায় দিনজুড়ে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলে। গত ১ জুলাই ছাত্র দলের পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরে ১ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের সময় সাত মাস পর ঘোষণা করা হয় তাদের পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি। ওইদিন কমিটি ঘোষণার পর তাদের পদবঞ্চিত অন্য অংশটি নোতুন কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নোতুন কমিটির নেতাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এই নিষেধাজ্ঞা বলবত রাখার জন্য তারা নিজেদের সশস্ত্র শক্তির মহড়া দিতে থাকে। এরপর জানুয়ারী মাসের ১৭ দিন নোতুন কমিটির সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখতে না পারলেও ১৮ জানুয়ারী প্রস্তুতি নিয়ে তারাও সশস্ত্র অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মোকাবিলা করতে নিযুক্ত হয়। এই মোকাবিলা শুরু হয় সশস্ত্রভাবেই। এর বিস্তারিত বিবরণ সব কয়টি জাতীয় দৈনিকেই প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বিএনপি-জামায়াত জোট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ বিএনপির ছাত্রনেতাদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হলগুলোর দখল নেয়। এই দখল নেওয়ার পর চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির কারণে ছাত্র লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ শুরু হয়। সেটা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত সামাল দিতে ব্যর্থ হন। সম্ভবত এই সংঘর্ষ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয় ঢাকার বাইরেও প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে কয়েক মাস চলার পর দুই গ্রুপের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ বন্ধ হয়, যদিও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনও অব্যাহত আছে।

১৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে নয়, বিরোধী দল বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র দলের দুই গ্রুপের মধ্যে যেভাবে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, যেভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ছুরি, দা, চাপাতিই শুধু নয় পিস্তল পর্যন্ত ব্যবহার করেছে, তাতে সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হওয়ার উপায় নেই যে এসব ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষার এক পীঠস্থানে এটা ঘটছে। অবশ্য এ ধরনের সংঘর্ষ আগে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগেরও মধ্যে ঘটেছে। কাজেই এটা নোতুন ব্যাপার নয়। ঠিক একই দলের দুই গ্রুপের মধ্যে ১৮ তারিখে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে সেটা আগে এভাবে দেখা যায়নি।

ছাত্রদের মধ্যে এই সংঘর্ষ কী ধরনের স্বার্থকে কেন্দ্র করে হতে পারে এটাই ভাবনার বিষয়। ছাত্ররা লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসে, উচ্চশিক্ষার জন্য আসে

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে। এই উচ্চশিক্ষার্থীদের ওপর তাদের শিক্ষা কী প্রভাব সৃষ্টি করে, কী ধরনের স্বার্থ চিন্তা ও আকাঙ্খার জন্ম দেয়, যার ফলে তারা এভাবে নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে? সংবাদপত্রের বিবরণ ও সচিত্র প্রতিবেদন দেখে তাদের ভয়াবহ গুন্ডা ও সন্ত্রাসী ছাড়া অন্য কিছু মনে করার উপায় থাকে না।

বিগত নির্বাচনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র লীগ কর্তৃক তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছাত্র দল বিতাড়ন ও তারপর নিজেদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ যে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, এ নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। এটা তাদের রাজনৈতিক পিতৃসংগঠন আওয়ামী লীগও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এই একই কাজ বিএনপি-জামায়াত সরকারে থাকার সময় তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্র দল ও ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই করে এসেছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের দলীয় পরিচয় যাই হোক, তাদের চারিত্রিক পরিচয়, বিশেষত শ্রেণীগত পরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। এই পার্থক্য না থাকার কারণ তারা যে মূল রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন সেগুলোর মধ্যেও বাহ্যিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন।

১৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে তার থেকে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যায় যে, বিএনপি এখন বিরোধীদলে থাকলেও তাদের রাজনীতি এবং ছাত্রসংগঠনের মধ্যে এমন সুযোগ-সুবিধা আছে যা নিয়ে দুই গ্রুপে এই মুহূর্তে এ ধরনের সংঘর্ষ হতে পারে। এই সুযোগ-সুবিধা মূলত আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার ছাড়া আর কি? নিকৃষ্ট গুন্ডা ও সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কোন আদর্শিক বা রাজনৈতিক কারণে নয়, নিছক পদ অধিকারের জন্য অস্ত্র হাতে ক্যাম্পাসে এরা যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তাতে এই পদ যে অর্থ ও ক্ষমতার উৎস– এ নিয়ে সন্দেহের উপায় নেই। সরকারী দল কিভাবে এই সুবিধা পাওয়া যায় এটা বোঝার অসুবিধা নেই, কিন্তু বিরোধীদলে থেকেও যে সুযোগ-সুবিধার অভাব নেই, ছাত্র দলের দুই গ্রুপের পারস্পরিক সংঘর্ষের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। এর থেকে প্রমানিত হয় যে, নিজেদের ছাত্র সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা ও তাদের মাস্তানির কাজে ব্যবহারের জন্য তাদের মূল রাজনৈতিক দল কর্তৃকও তাদেরকে উদারভাবে অর্থ সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে আবার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ছাত্রনেতা হিসেবে টিকে থেকে পরবর্তী সময়ে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ করে। ১৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গুপ্তামী ও সশস্ত্র তাণ্ডব দেখা গেছে, তার মধ্যে আবার এক ব্যতিক্রমী ঘটনার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ সংবাদটি হলো, ছাত্র লীগ কর্তৃক ছাত্রদলের একপক্ষ অবলম্বন করে এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া। এ বিষয়ে দৈনিক সমকাল-এর রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। এতে বলা হয়, সংঘর্ষের শেষ পর্যায়ে ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা শুধু ছাত্র দলের বিদ্রোহীদের চাপাতি, হকিস্টিক, লাঠিসোটা দিয়ে সহযোগিতা করেনি বরং বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে হামলা করেছে ছাত্রদলের মূল কমিটির

www.pathagar.com

নেতাদের ওপর। পরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয় তারা। এ সময় পুলিশের সামনে দিয়েই অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে ছাত্র লীগ কর্মীরা।' (সমকাল, ১৯.১.২০১০)।

এসব থেকেই বোঝা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন এমন পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে যা প্রকৃত শিক্ষার উপযোগী নয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার পরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ার কারণেই ছাত্রদের মধ্যে গুন্ডা ও সন্ত্রাসীদের দাপট বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দিকে তাকালেও গুণগতভাবে একই ব্যাপার দেখা যায় যে শিক্ষকরা প্রভাবশালী হিসেবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা কার্য পরিচালনা করেন, তারাও আজ দুই দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কুৎসিত চরিত্রের পরিচয় দেন। তাদের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তার ক্ষেত্রেও আছে হালুয়া-রুটির স্বার্থ। দেশের সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে উপাচার্য থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যান্য কার্য পরিচালনাকারীর পরিবর্তন যেভাবে হয়, তার থেকে ঘৃণ্য এই শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টকারী ব্যাপার আর কী হতে পারে?

এসব বিষয়ের দিকে না তাকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ না করে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা, গুণ্ডামী, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদির কারণ বোঝা সম্ভব নয়। আসলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ও এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

কালের কণ্ঠ : ২০.০১.২০১০ ১৯.১.২০১০

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমীর বইমেলা এবং কূপমণ্ডূকতা

১ ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলা একাডেমীর বইমেলা শুরু। এই বইমেলা নিয়ে এ দেশের কিছু লেখককে ফেব্রুয়ারী মাসে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেলেও এই বার্ষিক আয়োজনের দ্বারা পাঠকদের বিশেষত নোতুন প্রজন্মের পাঠকদের বিশেষ কোন উপকার হয় বলে মনে হয় না। এই মনে না হওয়ার ব্যাপারটা অনেক কারণেই ঘটে। কাজেই এর পরিবর্তে এ বইমেলার আয়োজন অন্য কীভাবে করলে তার দ্বারা শুধু কয়েকজন প্রকাশক ও লেখকের উপকার না হয়ে পাঠকদেরও উপকার হয় সেই চিন্তা থেকে কিছু কথা বলা দরকার। এসব কথার কোন গুরুত্ব ও আয়োজনের কর্তৃপক্ষের বিশেষত সরকারের কাছে না থাকলেও এবং বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন বিদ্যমান শাসন কাঠামোর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও এ নিয়ে চিন্তাভাবনা যাতে শুরু হতে পারে সেজন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হলো।

বাংলা একাডেমী ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মতো সরকারী, আধা-সরকারী সংস্থা কর্তৃক ঢাকায় জাতীয়ভাবে একাধিক বইমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যভাবেও কিছু বইমেলা হয়। এসব বইমেলার অনেক অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আছে। এগুলো দূর করার জন্য ঢাকায় একাধিকের পরিবর্তে বার্ষিক একটি বইমেলার আয়োজনই করা দরকার, যা ফেব্রুয়ারী মাসেই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

প্রথমেই বলা দরকার, বইমেলাকে যথেচ্ছভাবে বই উৎপাদনের প্রেরণা হিসেবে না রেখে একে বিদ্যা বিস্তারের আয়োজন হিসেবে সংগঠিত করা দরকার। বাংলা একাডেমীর বই মেলার নীতি ও ব্যবস্থাপনা, অন্যরকম হওয়ায় এর দ্বারা 'স্বদেশ প্রেমিক' মুর্খ এবং জাতীয়তাবাদী কূপমণ্ডূক এর কাজ যেভাবে হয় বিদ্যা বিস্তার তার ধারে কাছেও হয় না।

এই বইমেলাকে দেশীয় গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে এবং দেশীয় কিছু লেখকের লিখিত ও দেশীয় প্রকাশকদের দ্বারা উৎপাদিত বইয়ের বাজার হিসেবে টিকিয়ে না রেখে একে আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদান করা দরকার। যেভাবে একে সংকীর্ণ দেশীয় চরিত্র প্রদান করে বিদেশী বই আনার পথ বন্ধ রাখা হয়েছে, তার মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের থেকে বিদ্যার দরজা বন্ধ রাখার চিন্তাই প্রাধান্য আছে। অনেক দিন আগে মনে হয় ষাটের দশকের প্রথম দিকে মুসলিম সাহিত্য কাকে বলে এ বিষয়ে খালেদ চৌধুরী বলেছিলেন, 'যে সাহিত্য মুসলমানদের দ্বারা লিখিত এবং কেবলমাত্র মুসলমানদের দ্বারাই পঠিত তাকেই মুসলিম সাহিত্য বলে'। আমার কোন এক প্রবন্ধে খালেদ চৌধুরীর এই কথা আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। এখন বাঙলাদেশের বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও দাঁড়িয়েছে একই প্রকার। যে সাহিত্য বাঙলাদেশের বাঙালিদের দ্বারা লিখিত এবং কেবল তাদের দ্বারাই পঠিত, সে

www.pathagar.com

সাহিত্যকেই বাঙলাদেশের সাহিত্য বলা চলে। এদিক দিয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, বেশকিছু ভালো বই এখানকার বাঙালিদের দ্বারা লিখিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাই হলো সাধারণ অবস্থা।

শুধু বাংলা নয়, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষার বই বইমেলায় যাতে আসে তার জন্য একে ভারতসহ সব দেশের গ্রন্থ প্রকাশকদের জন্য উন্মুক্ত করা দরকার। এর ফলে পাঠকরা ভালো বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

বর্তমানে মেলা উপলক্ষে যেসব বইপত্র প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে এই আবর্জনা প্রকাশ করে প্রকাশকরা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশ দূষিত ও বিষাক্ত করে। বিদেশী বই মেলায় এলে এভাবে বাজে বইয়ের প্রকাশ একেবারে বন্ধ করতে না পারলেও অনেক কমে আসবে। এর ফলে প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতিও বন্ধ হবে।

বাইরের বইয়ের জগতের সঙ্গে তেমন পরিচয় না থাকার কারণেই নোতুন প্রজন্মের পাঠকদের মধ্যে কূপমণ্ডূকতা দেখা যায়। এই কূপমণ্ডূকতা সরকারের বই আমদানী নীতির ফলেও অনেকাংশে সৃষ্টি হয়েছে। আমদানীকৃত বইয়ের ওপর ট্যাক্স এদেশে যেভাবে বসানো আছে এটা অবাক হওয়ার ব্যাপার। কারণ বইয়ের ওপর এতো ট্যাক্স দুনিয়াতে অন্য কোন দেশে নেই। দেশের পাঠকরা যাতে উচ্চতর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে না পারে তার জন্য এবং ব্যবসায়িক কারণে এদেশের শাসক শ্রেণীর কর্তাব্যক্তিরা কিছু লেখক, বুদ্ধিজীবী ও প্রকাশক চক্রান্তমূলকভাবে এই পরিস্থিতি তৈরী করে রেখেছে। বাইরের বইয়ের আমদানী অবাধ করেই এ পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব। বই নিয়ে যত রকম দুর্নীতি হয় তার মধ্যে দলীয়ভাবে বছরে কোটি কোটি টাকার সরকারী বই ক্রয় অন্যতম। এভাবে বই ক্রয়ের প্রক্রিয়া অনুযায়ী একেক সময় একেক সরকার নিজেদের দলের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকাশক ও লেখকদের বই কেনে। এই দুর্নীতির কারণে অতি নিম্নমানের বই উৎপাদন করে কিছু লেখক ও প্রকাশক মুনাফা অর্জন করে। সরকারী এই বই ক্রয়নীতির সঙ্গে বই ও পত্রপত্রিকা আমদানীর সরকারী নীতি যুক্ত হয়ে দেশে বিদ্যার্জন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ এখন যেভাবে রুদ্ধ রাখা হয়েছে, এর প্রতিকার সম্ভব বইমেলাকে বিদেশি বইয়ের জন্য উন্মুক্ত ও আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদান করা।

বাইরের বই এলে লেখকরা চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রম করে বইয়ের মান উন্নয়নের চেষ্টা করতে বাধ্য হবেন। কারণ তখন তাদের বাইরের ভালো বইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা যাতে না করতে হয় এ জন্য এখানকার প্রকাশকরা এবং এক ধরনের লেখক মেলায় বাইরের বই আনার বিরোধিতা করেন।

ফেব্রুয়ারীর বইমেলার আয়োজনের দায়িত্ব এখন শুধু বাংলা একাডেমীর। বাংলা একাডেমী প্রকাশক, বাংলা একাডেমী একটি আধা সরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। মেলার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা শুধূ বাংলা একাডেমীর হাতে না রেখে বাংলা একাডেমীর

www.pathagar.com

লোক এবং অন্য প্রকাশকদের দ্বারা গঠিত কমিটির হাতেই এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা প্রয়োজন। এখানেও অবশ্য দলীয়করণের সম্ভাবনা কমে আসতে পারে। তাছাড়া যতই দলীয়করণ হোক, এ ধরনের মেলার আয়োজনে শুধু একটি প্রকাশক, তা যত বড়ই হোক সমগ্র দায়িত্বে না থেকে প্রকাশকদের অনেকের সমষ্টিগত ভূমিকা থাকলে ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও দলীয় দূষণমুক্ত হওয়ার শর্ত তৈরী হয়।

বাংলা একাডেমীর জায়গা সামান্য। বইমেলার জন্য, বিশেষ করে একটি আন্তর্জাতিক মেলা হিসেবে বইমেলার আয়োজনের জন্য দরকার আরও প্রশস্ত জায়গা। সে রকম জায়গা বাছাই করে বইমেলার নোতুন স্থায়ী স্থান নির্ধারণ করা দরকার।

সমকাল : ২.২.২০১০ ৩১.১.২০১০

www.pathagar.com

একুশে ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবুর রহমান

একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমীর বইমেলা উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা রীতি অনুযায়ী এক ভাষণ দিয়েছেন। সেই ভাষণে তিনি নিজের অভ্যাস অনুযায়ী পিতার গৌরব বর্ণনা করেছেন অনেকক্ষণ ধরে। কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। পিতৃ বন্দনাও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত শেখ মুজিবুর রহমান যখন শুধু পিতা নন, এ দেশের একজন কীর্তিমান মানুষ, একজন ঐতিাসিক ব্যক্তি। তার প্রসঙ্গ নিয়ে সর্বত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নানা কথা বলা হলে এর ফলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না, উপরন্তু যারা এসব শোনেন তাদের অনেকেরই মনে বিরক্তি উৎপাদিত হয়। এই অভ্যাস যে শুধু শেখ হাসিনার তাই নয়, এটা এখন এমনভাবে আওয়ামী সংস্কৃতির অঙ্গে পরিণত হয়েছে যাতে আওয়ামী লীগের নেতানেত্রী, কর্মী থেকে নিয়ে তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত এই অভ্যাসের দাসত্ব করেন।

বাংলা একাডেমীর উপরোক্ত ভাষণের কথা প্রসঙ্গে এসব কথা বলার কারণ, এই ভাষণে এমনসব কথা বলা হয়েছে যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ক্ষমতায় অধিষ্টিত থেকে এবং সুবিধাবাদী চাটুকার পরিবৃত হয়ে এ ধরনের কথাবার্তা অনায়াসে বলা যায়। চাটুকারদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই ভাষণ দানকারী বা বক্তা এক্ষেত্রে নিরাপদ থাকেন। কিন্তু আসল ও স্থায়ী নিরাপত্তা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের অভাব থেকে আসে না। বক্তব্য ব্যক্ত করে নিরাপদ থাকার জন্য প্রয়োজন নিজের বক্তব্যকে সত্যের ওপর দাঁড় করানো। কারণ, ঐতিহাসিক সত্য কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। তার চরিত্র সামাজিক, সমাজের কালপ্রবাহের সঙ্গেই তার সম্পর্ক।

প্রধান মন্ত্রী বাংলা একাডেমীর ভাষণে নানা বিষয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, তার ওপর আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। ভাষা আন্দোলন ও তাতে তার পিতার ভূমিকা সম্পর্কিত যেসব কথা তিনি বলেছেন, তার মধ্যেই আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

বাসস কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ হ্যান্ড আউটে দেখা যায়, তিনি বলেছেন, '১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্র লীগসহ গোটা ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।'

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের এই ভূমিকা সম্পর্কে হাসিনার বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু তার আগে বলা দরকার, 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে' খাজা নাজিমুদ্দীনের এই বক্তব্য তিনি প্রদান করেন ঢাকায় আইন পরিষদে নয় করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে।

নাজিমুদ্দীনের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলন চলতে থাকে। এ সময় তমদ্দুন মজলিস, গণআজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ও বিভিন্ন ছাত্রাবাসের যৌথ উদ্যোগে ২৪ মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুব লীগ, তমদ্দুন মজলিস, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, প্রত্যেকটি থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। (তাজউদ্দীনের ডায়েরি, ২.৩.১৯৪৮)। শেখ মুজিব এই সভার ধারে-কাছেও ছিলেন না। কারণ, তিনি তখন ছিলেন কলকাতায়। সংগ্রাম পরিষদ গঠনের কয়েক দিন পর তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। ঢাকায় থাকলে তিনি ছাত্র লীগের সদস্য হিসেবে এই পরিষদের দু'জন সদস্যের মধ্যে একজন হতে পারতেন, নাও হতে পারতেন। কারণ, ঢাকায় ছাত্র রাজনীতি না করার ফলে এখানে তার সে রকম কোন অবস্থান সে সময়ে সংগঠনের মধ্যে ছিল না। কাজেই তার 'প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে' সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল, এ বক্তব্য সর্বৈব মিথ্যা। মিথ্যা যদি না হয় তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবেই এক অজ্ঞাতপ্রসূত বক্তব্য।

এরপর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৫২ সালের ১৫ জানুয়ারী খাজা নাজিমউদ্দীন প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই আবারও ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' নাজিমুদ্দীন প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব ১৫ জানুয়ারী নেননি। ঐ দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছিল ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী নিহত হওয়ার ঠিক পর। ভাষা বিষয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনের যে বক্তব্যের পর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নবপর্যায়ে শুরু হয়, সেটা তিনি দিয়েছিলেন ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ২৭শে জানুয়ারী। অনেক কিছুর পরোয়া না করে বাঙলাদেশের প্রধান মন্ত্রী তার বক্তব্য দিতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের পরোয়া না করে পার পাওয়ার উপায় কারও নেই। যতদিন ক্ষমতা আছে তার জোরে অনেক রকম ভ্রান্তি অবলীলাক্রমে বিস্তার করা যায়। কিন্তু এ কাজের মাধ্যমে কারও মর্যাদা অথবা ইতিহাসের পণ্ডিত হিসেবে যশ বৃদ্ধি হয় না।

নাজিমুদ্দীনের বক্তব্য উল্লেখ করার পর শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, 'এ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন।' প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবকে নভেম্বর মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। তখন থেকেই ছাত্র লীগের কর্মীরাসহ অনেকেই মাঝে মাঝে সেখানে তার

www.pathagar.com

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এটা যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। ফেব্রুয়ারী মাসেও শেখ মুজিবের সঙ্গে ছাত্রদের অনেকের দেখা হতো। এর মধ্যে কোন 'গোপন' ব্যাপার ছিল না এবং তারা আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেও তার নির্দেশের জন্য সেখানে যেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসিনা তার ভাষণে বলেন, 'তারই (অর্থাৎ সেইসব গোপন বৈঠকের) প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী দাবি দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।'

একুশে ফেব্রুয়ারী সারা পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেটা হয়েছিল অনেক ধরনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এবং তৎকালীন ঢাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের যৌথ উদ্যোগের ফলে। তার সঙ্গে হাসপাতালে কিছু ছাত্রের গোপন বৈঠকের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া শেখ মুজিব তো বটেই, এমনকি আওয়ামী লীগ অথবা ছাত্র লীগের এমন কোন রাজনৈতিক অবস্থান তখন ছিল না, যে কারণে শেখ মুজিবের গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একুশে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচি নির্ধারিত হতে পারত।

এরপর হাসিনা বলেন, 'এ সময় তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারী অনশন শুরু করলে ১৬ ফেব্রুয়ারী তাকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাঙার নির্দেশ দেন।'

ঐতিহাসিক হিসেবে শেখ হাসিনার এ এক নোতুন তথ্য আবিষ্কার! আসলে শেখ মুজিব ও বরিশালের মহিউদ্দিন আহমদকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর তিনি ও মহিউদ্দীন সেখানে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, নিজেদের মুক্তির জন্য অনশন শুরু করেন। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ১৫১-৫২)। কয়েক দিন পর তাদের দুজনকেই ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এ বিষয়ে মহিউদ্দীন আহমদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি জেল থেকে ছাড়া পাই ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং শেখ মুজিব ছাড়া পায় ২৪শে ফেব্রুয়ারী। এটা ঘটে আমরা ফরিদপুর জেলে অনশন আরম্ভ করার পর।' (ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল, বদরুদ্দীন উমর, বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৮৭)।

ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরের কয়েক দিন পর শেখ মুজিবকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল এমন তথ্য এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু শেখ মুজিবই যে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত পরিকল্পনাকারী, পরিচালক ও নির্দেশ প্রদানকারী– এটা প্রমাণ করার জন্যই এই তথ্য হাসিনাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। যাই হোক, শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেল থেকে ঢাকা তো আনা হয়ইনি, উপরন্তু তাকে সেখানেই জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি ঢাকা আসেননি, সোজা গিয়েছিলেন গোপালগঞ্জে নিজের গ্রামের বাড়িতে এবং সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। ঢাকা এসেছিলেন এপ্রিলের শেষ দিকে। ২৭শে এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আহূত কনভেনশনে তিনি

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলেন। আমার মনে আছে, সে সময় বার লাইব্রেরিতে হলের বাইরে বাঁধানো জায়গায় বসে তার এবং অন্য কয়েকজনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। সে সময় ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক, খয়রাত হোসেন, তর্কবাগীশ, অলি আহমদ, আবদুল মতিনসহ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রায় সব সদস্যই জেলে ছিলেন।

হাসিনা বলেছেন, '১৬ ফেব্রুয়ারী তাকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেখানে থেকেই বঙ্গবন্ধু একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাঙার নির্দেশ দেন।' এ ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। শেখ মুজিব ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এভাবে 'নির্দেশ' বা হুকুম দেয়ার কথা বলা শেখ মুজিবেরও অভ্যাস ছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বক্তৃতাতেও তিনি বলেছিলেন নিজেও 'হুকুম' দেয়ার কথা। কোন আন্দোলনই জগতে কারও 'নির্দেশ' বা 'হুকুম' মতো হয় না। কারণ, আন্দোলনে নেতৃত্ব থাকে ঠিক কিন্তু আন্দোলন কোন জমিদার প্রজার ব্যাপার নয়। আন্দোলনের ক্ষেত্রে যৌথ সিদ্ধান্ত হয়, যৌথভাবে কাজ হয়। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কারও নির্দেশ বা হুকুম ছিল না। এ আন্দোলনের কোন একক নেতৃত্বও ছিল না, থাকার প্রশ্ন ছিল না। বাস্তব অর্থে ভাষা আন্দোলন ছিল প্রতিবাদী ও সংগ্রামী ছাত্র থেকে নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত আন্দোলন। এখানেই এর মাহাত্ম্য। তবে এখানে ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই বলা দরকার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কোন সংগঠন ও ব্যক্তির একক নেতৃত্ব না থাকলেও সে সময় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ভূমিকা ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের (এর সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক ছিল না) এবং তার সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদের। বাঙলাদেশে ইতিহাস চর্চার এমনকি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা এমনই করুন অবস্থা যে, এ প্রসঙ্গে যুব লীগ এবং অলি আহাদের কোন উল্লেখই এখন দেখা যায় না!

শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলা থেকে এমন সময় মুক্তি দেয়া হয় যখন ভাষা আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে হুলিয়া জারী করে দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে সবাইকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। শেখ মুজিবের সে রকম কোন ভূমিকা থাকলে তাকে সে সময় জেল থেকে মুক্তি দেয়া কোন সরকারের পক্ষে যে সম্ভব হতো না, এটা বোঝার জন্য বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ভাষা আন্দেলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে যেসব কথা শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমীতে বলেছেন এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও তাদের ঘরাণার বুদ্ধিজীবীরা বলে থাকেন এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস বিকৃতকরণ করা হচ্ছে এটা বলা যায় না। এর দ্বারা ইতিহাসকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। এই ধর্ষিত ইতিহাসকেই এখন স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকায় প্রকৃত ইতিহাস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সর্বনাশ করা হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কীভাবে পূর্ববাংলার জনগণ ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে এক গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিলেন এ বিষয়টি বুঝলে কারও 'নির্দেশ' বা 'হুকুমে' ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এ চিন্তা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মাথায় আসা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য আমি এ

www.pathagar.com

পর্যায়ের ইতিহাসের ঘটনাবলীর সবিস্তার বর্ণনা ও পর্যালোচনা করে আমার তিন খণ্ডের বই 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' রচনা করেছি।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে শেখ মুজিব নিজে, ডক্টর মাযহারুল ইসলামের মতো তার অনুগত লেখক-বুদ্ধিজীবীরা ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে এসেছেন এবং এখনও বলে যাচ্ছেন, সেগুলো খণ্ডন করে প্রকৃত ইতিহাস উপস্থিত করার চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করেছি। কিন্তু বাঙলাদেশে এখন ইতিহাস চর্চা বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু না থাকলেও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা সবাই 'ঐতিহাসিক'। এখন এই 'ঐতিহাসিকদের' মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা। কাজেই তিনি আইনের জোরে ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিচ্ছেন। কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের ওপর লিখিত একটি প্রবন্ধে তার পিতার ভূমিকা খর্ব করা হয়েছে, এই অভিযোগে তিনি তার পূর্ববর্তী সরকারের আমলে দেশ পত্রিকার সেই সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ছাড়াও দেশে ও দেশের বাইরে লোক আছে। কাজেই আমার উপরোক্ত প্রবন্ধটি ঢাকার কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হয়ে তা লাখ লাখ পাঠকের হাতে এসেছিল। 'দেশ' পত্রিকার যে প্রবন্ধ এখানে বিশ-পঁচিশ হাজার পাঠক পড়ত সেটাই পড়েছিল লাখ লাখ লোক। এছাড়া সরকারী এই দমন নীতির বিরুদ্ধে অনেকেই বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছিলেন, মিটিং-মিছিলও হয়েছিল। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল। 'উবুদশ' নামে একটি বামপন্থী মাসিক পত্রিকা এর বিরুদ্ধে বিশেষ সংখ্যা বের করে। তাতে পশ্চিমবঙ্গের বহু লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীর লেখা ও প্রতিবাদ-বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। ক্ষমতায় বসে গায়ের জোরে ইতিহাস বিষয়ে বিভ্রান্তি বিস্তার করলে, মিথ্যা কথা ইতিহাস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে এবং সর্বোপরি আইনের হাতুড়ি মেরে যে সত্য ইতিহাস আড়াল করা যায় না এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। সত্যের 'বদ অভ্যাস'ই হচ্ছে মিথ্যাকে পরাস্ত করা।

আমার দেশ : ০৪.২.২০১০ ৩.২.২০১০

www.pathagar.com

বইমেলার আন্তর্জাতিকীকরণ এখন জরুরী হয়েছে

ফেব্রুয়ারি মাস এলে শুরু হয় বাংলা একাডেমীর বইমেলা। এই মেলাকে ঘিরে ও মেলা উপলক্ষে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ধরনের আলোচনা মেলার বক্তৃতা থেকে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধে হয়ে থাকে। এসব থেকে দেখা যায় যে, বইয়ের মেলা হিসেবে এর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, তেমনি ক্রমান্বয়ে কমছে এর মান। অর্থনীতিতে প্রচলিত Greshams Law (bad money drives good money out of circulation-এর মতো এ ক্ষেত্রে যে নিয়ম কাজ করছে তাতে খারাপ বই বা নিম্নমানের বই ভালো বইকে আড়াল করে বা তাড়িয়ে দিয়ে বাইরের বাজারে আধিপত্য বজায় রাখছে ও বৃদ্ধি করছে। এর দ্বারা লাভ হচ্ছে এক শ্রেণীর লেখক ও প্রকাশকের। এদের দ্বারা বইমেলা পরিণত হয়েছে এক প্রকার বাণিজ্যিক মেলায়, যেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রতিযোগিতায় সরস্বতী শোচনীয়ভাবে পরাজিত।

বয়স্ক থেকে অল্পবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের বই পড়ার দুই প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষা এবং আনন্দ। মেলার সময় হৈচৈয়ের অভাব নেই। শুধু তাই নয়, হৈচৈ এতো বেশি হয় যে, সেটা মেলায় আগতদের বই দেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটায় এবং বইয়ের পরিবর্তে অন্যদিকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে আনে। এই হৈচৈ-এর মধ্যেও কোন আনন্দ থাকে না। এই হালকা হৈচৈ আনন্দের পরিবর্তে সেখানে ফূর্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

যেসব বই মেলায় আসে তার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিপুল অধিকাংশ বইয়ে পাঠকদের শিক্ষা ও আনন্দের খোরাক বলে কিছু থাকে না। বই হলো বিদ্যাবিস্তারের উপায়। চিত্তের বিকাশ সাধন বিদ্যার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিশু-কিশোরদের জন্য যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে একটি এ রকম, যার দ্বারা তাদের চিত্তের বিকাশ ঘটা সম্ভব? এ দিক দিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য বই ও বয়স্কদের জন্য বইয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, এবারের বইমেলায় উপন্যাসের সংখ্যা বেশি এবং বিক্রিও বেশি। উপন্যাস সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং এর মধ্যে শিক্ষা ও আনন্দ দুইয়েরই উপাদান থাকে। কাজেই উপন্যাস পাঠের মধ্যে খারাপ কিছু নেই। তবে দেখা দরকার কী ধরনের উপন্যাস বাংলা একাডেমীর বইমেলায় বাজার গরম করছে। উপন্যাস রচনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অনেক রকম বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক গুণের অধিকারী না হলে মহৎ এর তো কথাই নেই, এমনকি গড়পড়তা উপন্যাসও লেখা যায় না। কাজেই হঠাৎ করে ভুরি ভুরি উপন্যাস রচনা যেখানে হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-

www.pathagar.com

সাহিত্য চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর অধিকাংশই যে আবর্জনা এটা বলাই বাহুল্য। বই পড়া দরকার, বই পড়া ভালো। তবে এমন বই পড়া ক্ষতিকর যার মাধ্যমে চিন্তা-চেতনা ঘোলাটে ও নিম্ন প্রবৃত্তি জাগরিত হয়।

বাংলা একাডেমীর বইমেলা এক মাসব্যাপী চলে। এতো দীর্ঘস্থায়ী বইমেলা দুনিয়ার অন্য কোন দেশে নেই। এটাই অন্যতম প্রধান কারণ, যার ফলে বইমেলা শিক্ষা ও বিদ্যা জগতে ভালোর থেকে মন্দ করছে বেশি। মাননিরপেক্ষভাবে বই উৎপাদনের যে উন্মাদনা এই বইমেলা উপলক্ষে হয় এর দীর্ঘ স্থায়িত্বই তার অন্যতম কারণ। বইমেলা সামনে রেখেই লেখকরা লেখেন এবং প্রকাশকরা বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এর কারণে বই লেখার মূল উদ্দেশ্যকে শিকেয় তুলে সামান্য ব্যতিক্রম বাদে সব লেখকই ফেব্রুয়ারি মাসে বই উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় নামেন। এই পরিস্থিতিতে বইয়ের মান কী ধরনের এ বিবেচনার পরিবর্তে কে কত বই বের করলেন এবং কার বই কত বিক্রি হয়ে লেখক-প্রকাশকের পকেটে কত পয়সা পড়ল, এটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা একাডেমীর বইমেলার অন্যতম বড় অর্জন। এ প্রবণতা হঠাৎ করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে বইমেলার মেয়াদ এক মাসের পরিবর্তে অন্যান্য দেশের বইমেলার মতো এর মেয়াদ দশ-বারো দিনে নামিয়ে আনলে এই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে লেখকরা নিজেদের মেধা, সাহিত্য সাধনা, চিন্তা-চেতনার যথাযথ ব্যবহার দ্বারা বইয়ের মান উন্নত করার কাজে নিয়োজিত থাকতে পারেন। যারা নতুন লেখক তারাও ফেব্রুয়ারির মেলা সামনে রেখে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করে ধীরে-সুস্থে প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে এটা এক অতি অজনপ্রিয় প্রস্তাব। কিন্তু অজনপ্রিয় হলেও এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা এখন শুরু হওয়া দরকার।

বইমেলায় অন্য যে ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটে সেটা হলো, ১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে বইমেলা উদ্বোধন। এভাবে বইমেলাকে সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের অধীন রাখার ফলে যা হওয়ার তাই হয়। ক্ষমতাসীন দলগুলো প্রত্যেক ক্ষেত্র দলীয়করণ ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর বইমেলা উদ্বোধনের বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় ছাত্র ও লোকজন মিছিল ইত্যাদি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বইমেলার মতো একটি আয়োজন উদ্বোধন করতে এসে এমন সব দলীয় কথাবার্তা বলেন যা বইমেলার পরিবেশ দূষিত ও বিষাক্ত করে।

দুনিয়ার কোন দেশেই প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর মতো সরকারি ব্যক্তিরা বইমেলার উদ্বোধন করেন না। এদিক থেকে বাংলাদেশ এক মহা-ব্যতিক্রম। অন্যান্য দেশে বিদেশের কৃতী ও বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের দিয়েই বইমেলার উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও সেই রেওয়াজ চালু করা দরকার। কিন্তু এখানে এটা হওয়া বর্তমান শাসক শ্রেণীর আমলে প্রায় অসম্ভব। কারণ সব ক্ষেত্রের মতো বইমেলাকেও দলীয়করণ করার চেষ্টা বাদ দেয়ার চিন্তা এই শাসক শ্রেণীর কোন দল থেকেই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু সে প্রত্যাশা করা না গেলেও এটা যে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং বাংলা

www.pathagar.com

একাডেমীর মেলার স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য যে এটা প্রয়োজন, এ বিষয়টি সাধারণ লেখক, পাঠক, বিশেষত যারা নতুন প্রজন্মের, তাদের চিন্তার মধ্যে থাকা দরকার।

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারির বইমেলার কোন আন্তর্জাতিক চরিত্র তো নেইই, উপরন্তু এ মেলা উদ্ভট এক 'জাতীয়' চিন্তা থেকে সংকীর্ণতায় গণ্ডিবদ্ধ। এ সংকীর্ণতার কারণ দুই প্রকার। প্রথমত, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশেষত নতুন প্রজন্মের শিক্ষিতদের বিশ্ববিদ্যার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখা। পৃথিবী যেখানে ছোট হয়ে আসার কথা বলা হয়, যেখানে সবকিছু বিশ্বায়নের কথা বলা হয়; সেখানে বাংলাদেশে বিদেশী বই আমদানির ওপর এতো বেশি ট্যাক্স ধার্য করা আছে যা দুনিয়ার অন্য কোন দেশেই নেই। তবে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ এ বাপারে বাংলাদেশের সমকক্ষ হতে পারে। এর দ্বারা বাইরের জগতের চিন্তা–ভাবনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা চিন্তা জগতে কূপমণ্ডূকতা সৃষ্টি করে। এই কূপমণ্ডূকতা এ দেশের শাসক শ্রেণীর নিকৃষ্ট রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

এই একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় বাইরের বই আমদানির ক্ষেত্রে শুধু উচ্চ হারের ট্যাক্স ধার্য দ্বারা নয়, অন্য অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে দেশীয় লেখক– প্রকাশকদের বাজার সংরক্ষণ করে। এই বাজার সংরক্ষণ স্বদেশপ্রেমের নামে যেভাবে করা হয় তাতে স্বদেশপ্রেমিক মুর্খ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু হয় না। এভাবে জাতীয়তাবাদী কূপমণ্ডুক ও স্বদেশপ্রেমিক মুর্খ তৈরি করে শাসক শ্রেণী তার রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং দলগুলোকে নতুন প্রজন্মের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ এখন ছাত্রসমাজের মধ্যে যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ এর মধ্যে কতখানি নিহিত, সেটাও ভেবে দেখার বিষয়।

এদিক থেকে পরিস্থিতির মোড় ঘোরানোর জন্য অন্যতম জরুরি প্রয়োজন হলো, বইমেলার আন্তর্জাতিকীকরণ। ফেব্রুয়ারির বইমেলায় এখন স্টলগুলোতে বিদেশে প্রকাশিত বই রাখতে দেয়া হয় না, কোন বিদেশী প্রকাশক মেলায় যোগদানের কোন ব্যবস্থাও এতে নেই। এর পরিবর্তন ঘটিয়ে বইমেলাকে বিদেশী প্রকাশকদের জন্য উন্মুক্ত করা দরকার, যে রকমটি দুনিয়ার অন্য বিখ্যাত বইমেলাগুলোতে হয়ে থাকে।

এর ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যার দ্বার বাংলাদেশের জনগণের সামনে উদঘাটিত হয়, তেমনি সংরক্ষিত বাজারে 'উলু বনে শেয়াল রাজা'র মতো না থেকে এখানকার লেখকরা বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্ববিদ্যা চর্চার প্রতিযোগিতা করে নিজেদের সৃষ্টিশীলতার ও সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হবেন।

কালের কণ্ঠ : ১০.০২.২০১০ ০৯.১২.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র দুর্নীতি ও সন্ত্রাস

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয় এবং এটা হচ্ছেও না। ১৯৭২ সালে থেকেই বাঙলাদেশের নব্য ধনিক শ্রেণী মূলত দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে গঠন করেছে, তার জেরই এখন ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরী করেছে। এর থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার একটি জাতির জীবনে আর কী হতে পারে? যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার পরিবেশের পরিবর্তে দুর্নীতির পরিবেশ প্রাধান্য থাকে এবং সন্ত্রাস রাজত্ব করে, সেদেশে শুধু ছাত্রসমাজই নয় গোটা সমাজই যে গভীর সংকটে নিমজ্জিত থাকবে– এটিই স্বাভাবিক। অন্যভাবে বলা যায়, সাধারণভাবে সমাজ এ ধরনের সংকটে পতিত ও নিমজ্জিত না থাকলে সে দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি এখন দেখা যাচ্ছে সেটি সম্ভব হতো না।

যে তিনটি ছাত্র সংগঠন বাঙলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং অন্যত্রও এখন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কয়েম করেছে, সেগুলো দেশের শাসক শ্রেণীর তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের অঙ্গসংগঠন। আওয়ামী লীগের ছাত্র লীগ, বিএনপি'র ছাত্র দল ও জামায়াতে ইসলামী ইসলামী ছাত্র শিবির ১৯৮০-এর দশক থেকেই ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হলো জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির। আশির দশকের প্রথম থেকে তারাই ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সন্ত্রাসের আমদানী করে এমন এক পরিস্থিতি তৈরী করেছিল, যার পূর্বদৃষ্টান্ত এ দেশে ছিল না।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের নামে পাঠ্য তালিকায় কিছু পরিবর্তন এনে মাদ্রাসা ছাত্রদের সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মাদ্রাসা ছাত্ররা এসব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে থাকার পর জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির গঠিত হয়ে সংগঠিত হতে থাকে। বলা চলে, ইসলামী ছাত্র শিবির হলো মাদ্রাসা শিক্ষার তথাকথিত আধুনিকীকরণের সঙ্গেই সম্পর্কিত। পাঠ্য তালিকার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনলেই যে মাদ্রাসা ছাত্রদের চিন্তা-চেতনার কাঠামো পরিবর্তন হবে এমন নয়। সেটি হয়ওনি। কারণ বর্তমানে মাদ্রাসায় যে সাধারণ পাঠ্য তালিকা আছে তার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার উপাদান সামান্য এবং ধর্মীয় কূপমণ্ডূক তৈরীর

www.pathagar.com

ব্যবস্থাই প্রাধান্যে। তাছাড়া এ মাদ্রাসাগুলোতে যারা শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত তাদের বিপুল অধিকাংশই চরম মূর্খ, এমনকি দুর্নীতিপরায়ণ। কাজেই মাদ্রাসায় ছাত্রদের সুশিক্ষার জন্য কোন উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এবং ছাত্রউত্তর জীবনে এদের কর্মসংস্থানও দেখা দেয় এক বড় সমস্যা হিসেবে। এ কারণে দেখা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে যারা জোরালোভাবে ওকালতি করেন, তারা কেউই নিজেদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়ান না। তাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণ বাংলা মাধ্যম স্কুল-কলেজে ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। এর কারণ, তারা যতই ধর্মীয় শিক্ষার জিকির তুলে মাদ্রাসার পক্ষে কথা বলুন, তারা জানেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রকৃত শিক্ষা তো দিতেই পারে না, উপরন্তু পরবর্তী জীবনে তাদের অকেজো করে রাখার ব্যবস্থাই তার মধ্যে থাকে। এভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ছাত্রদের সামনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হলেও সংকীর্ণ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার দ্বারাই তাদের চিত্ত শাসিত হয়। তার মধ্যে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশের কোন প্রকৃত সুযোগই থাকে না। এ কাঠামোর থেকে যারা বের হতে পারে তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং সাধারণ পরিস্থিতি আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা ও কুপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী মাদ্রাসা ছাত্ররাই বাঙলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস শুরু করে। তাদের মূল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের খেদমত করতে গিয়ে যে ধর্মীয় সন্ত্রাসের উদ্বোধন করেছিল, তার জের ধরেই শুরু হয়েছিল ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী। পায়ের রগ কাটা, নরহত্যা ইত্যাদি বেশ জোরেশোরে প্রথমে শুরু হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। একথা বলা বাহুল্য ছাত্র শিবিরের এ সন্ত্রাসকে বাংলাভাই ও আবদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসের থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। এসবের সঙ্গেই বরাবর জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক থেকেছে খুব ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, জামায়াতের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাদের থেকে প্রেরণা লাভ করেই ইসলামের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং তার বাইরে এই ক্রিমিনাল ও কলঙ্কজনক তৎপরতার মাধ্যমেই জামায়াতে ইসলামী বাঙলাদেশে নিজেকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জনগণের মধ্যে যে তাদের কোন ব্যাপক সমর্থন নেই এটি নির্বাচনে তাদের ভোটের অবস্থা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু জনসমর্থন না থাকলেও নিজেদের সংগঠিত শক্তি এবং সে শক্তিকে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত করে তারা এখন বাঙলাদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সন্ত্রাস যেভাবে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই এতো কথা বলতে হলো। কিন্তু এখন ইসলামী

www.pathagar.com

ছাত্র শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের পুরনো সন্ত্রাসী তৎপরতা একইভাবে আবার শুরু করলেও এক্ষেত্রে তারাই একমাত্র নয়। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ যেভাবে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সন্ত্রাস শুরু করেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও এই সন্ত্রাস করে চলেছে তার চেহারাও ভয়ঙ্কর।

সন্ত্রাস কোন স্বাধীন ব্যাপার নয়। এই কর্মকাণ্ড কোন না কোন ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং তারই প্রতিফলন। ছাত্র লীগ এখন যে সন্ত্রাস করছে সেটি যে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির সঙ্গে যুক্ত এটি এক বহুল পরিচিত ব্যাপার। এসবের কারণেই সন্ত্রাসের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, ছাত্র লীগের মধ্যেই একাধিক গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষও এ কারণেই হচ্ছে। এটি বলা দরকার, বিগত ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীরা দুর্নীতি ও তার সঙ্গে সন্ত্রাসের জোয়ারে ভেসে চলেছে। এক বছরের ওপর তারা একটানা সন্ত্রাস চালিয়ে আসা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও তাদের সরকার এই দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন তো দূরের কথা, সামান্য কমিয়ে আনতেও সক্ষম হয়নি। উপরন্তু তার ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি যে আওয়ামী লীগ সংগঠন ও সরকারের নেতাদের তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্ন, এটিও মনে করার কারণ নেই। সে চিন্তা অবাস্তব। তাদের মূল সংগঠনে যদি দুর্নীতি না থাকত, বেপরোয়া না হতো তাহলে তাদের ছাত্র সংগঠনে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস যেভাবে জারী আছে সেটি সম্ভব হতো না।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সরকারে 'নোতুন মুখ' আমদানীর নামে এখন কিছু ব্যক্তিকে মন্ত্রী করা হয়েছে যাদের রাজনৈতিক জ্ঞানগম্য বলে তো কিছুই নেই। উপরন্তু তাদের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন, বেপরোয়া ও দায়িত্বহীন ব্যক্তি সবদিক থেকেই বিপজ্জনক। কাজেই দেশের বাস্তব পরিস্থিতির কোন খবর না রেখে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের সরকারের 'ভাবমূর্তি' রক্ষার জন্য বেপরোয়াভাবে তারা বলেই চলেছে যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন যে কোন সময়ের থেকে ভালো, দেশে দুর্নীতি বড় আকারে কমে এসেছে ইত্যাদি। যেখানে ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা উন্মাদের মতো চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি তো বটেই, এমনকি ছাত্র ভর্তির জন্য ঘুষের কারবারে নিযুক্ত থেকে সন্ত্রাস করছে, সেখানে দুর্নীতি-সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়ে লম্বা-চওড়া নির্বোধ কথাবার্তা যে তাদের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি না করে উল্টোটিই ঘটাচ্ছে, এ বোধবুদ্ধিও তাদের নেই।

এই পরিস্থিতিতে ইসলামী ছাত্র শিবির উৎসাহিত হয়ে নোতুন করে তাদের সন্ত্রাস শুরু করেছে। নৃশংসভাবে তারা আবার রগ কাটা, নরহত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে নিযুক্ত হয়েছে। অতিসম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যেভাবে সন্ত্রাস শুরু করেছে, সেটি ছাত্র লীগের সন্ত্রাসের সঙ্গে চলছে সমান্তরালভাবে।

www.pathagar.com

দুর্নীতি এই সন্ত্রাসের সব থেকে বড় কারণ হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যেসব সংকট এখন তৈরী হয়েছে তার ভূমিকাও এক্ষেত্রে খাটো করে দেখা ঠিক নয়। আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি শিক্ষা ঠিকমতো প্রদান করা হয় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে না অথবা থাকলেও সেটি বড় আকারে হতে পারে না। কিন্তু এখন একদিকে ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজস্ব মূল রাজনৈতিক দল এবং শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের মধ্যে যে দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি ও দলবাজি দেখা যায়, সেটি ছাত্র সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নানাভাবে তার শর্ত সৃষ্টি করে। এ কারণে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধপ্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার জন্য শুধু ছাত্রদের দায়ী করে, ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, সমস্যা সমাধান ও সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করলে তার দ্বারা কোন ফল লাভ হবে না। উপরন্তু এর পরিণতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ও সে সঙ্গে গোটা সমাজে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যেরই বৃদ্ধি ঘটে পরিস্থিতিকে আরও ভয়ংকর করবে।

সমকাল : ১৬.২.২০১০ ১৪.২.২০১০

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমীর বইমেলা ও বইয়ের জগৎ

ফেব্রুয়ারীর বইমেলা শুরু হলে লেখক, প্রকাশক, পাঠক, বই ক্রেতা প্রভৃতির অনেক রকম কথা ও মতামত প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এগুলোতে উচ্ছাসের প্রাচুর্য থাকে। প্রকাশকরা অধিকাংশই তাদের ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক সমস্যার বিষয়ে কথা বলেন। তবে লেখক-সাহিত্যিকদের অধিকাংশই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অনেক বেশী। তাদের অনেকের কথাবার্তার মধ্যে আবার ন্যাকামিও দেখা যায়। যা হোক, সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসজুড়ে বই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে এবং লেখক, প্রকাশক, পাঠকদের মধ্যে আলোচনা এতো হয় যা বছরের বাকি ১১ মাসে হয় না। এর থেকে বোঝা যায় বইয়ের ভাবনা ফেব্রুয়ারীর বইমেলা কেন্দ্র করেই হয় সব থেকে বেশী।

ফেব্রুয়ারীর এই বইমেলা এর সবকিছু ত্রুটি সত্ত্বেও এখন পরিণত হয়েছে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে। সে কারণে একে যত বেশী ফলপ্রসূ করা যায় সেই চেষ্টা সবার তরফ থেকেই হওয়া দরকার। উচ্ছ্বাস, ন্যাকামি, ব্যবসাদারী অনড় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে সিরিয়াস চিন্তাভাবনা ছাড়া এটা হওয়ার উপায় নেই। এক্ষেত্রে প্রথম লক্ষ্য হওয়া দরকার, লেখক ও প্রকাশকদের বইমেলার খুঁটির বাঁধন থেকে মুক্ত করা। কোন মেলা, তা জাতির জীবনে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক তাকে কেন্দ্র করে লেখালেখি ও প্রকাশনা এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। কোন দেশেই এটা হয় না এবং এর পরিণতি কখনও ভালো হতে পারে না। বাঙলাদেশেও তা হচ্ছে না। এর কারণ সৃষ্টিশীল অথবা প্রকৃত গবেষণামূলক কোন কাজ দিন-তারিখের দিকে তাকিয়ে কেউ করে না। যেভাবে কেউ চেষ্টা করলে তার ফলে সৃষ্টিশীলতা ও গবেষণা দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু বই নয়, দেশের অনেক রকম শিল্প আছে। বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী যে শিল্প মেলাও আছে। এই প্রদর্শনী ও মেলা সামনে রেখে তো শিল্প উৎপাদন হয় না। কিন্তু অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট বোঝা যায় বইয়ের ক্ষেত্রে সেটা সেভাবে বোঝা যায় না।

এক মাস স্থায়ী এই বইমেলায় এখন হিড়িকের মতো করে বই প্রকাশিত হয়। এর সংখ্যা এ বছর মনে হয় দুই হাজারও ছাড়িয়ে যাবে। এগুলোর মধ্যে আছে শত শত উপন্যাস, শত শত কবিতার বই। ইতিহাস জীবনী ইত্যাদির নামে শত শত বই। এছাড়া আরও অনেক বিষয়ের বই।

উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প ইত্যাদি সৃষ্টিশীল কাজ। প্রতিভাবান তো বটেই এমনকি কোন ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক, কবি, গল্প লেখকই উর্ধ্বশ্বাসে বই উৎপাদন করতে পারেন না। এমনকি একটি দেশে অনেক অনেক লেখকও এ কাজ হিড়িকের মতো করে করতে পারেন না। সেটা করলে যা তৈরী হয় তার মান বলে কিছু থাকে না। অবাক হওয়ার

www.pathagar.com

কিছু নেই। বাঙলাদেশ এদিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়। এর জন্য বাংলা একাডেমীর বইমেলার হাজার হাজার বইয়ের পাতা উল্টানোর প্রয়োজন হয় না।

এই মেলার সব থেকে বেশী শুধু বেশী নয় অন্যদের অনেক পেছনে ফেলে বড় আকারে বিক্রি হয় হুমায়ুন আহমেদের গল্প উপন্যাস। নিঃসন্দেহে তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। এক হিসেবে তাকে প্রতভাবানও বলা চলে। পাঠকদের নেশাগ্রস্ত করে যিনি একটানে শুরু থেকে তাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত শেষের পাতায় ফেলতে পারেন, তিনি কথক হিসেবে সামান্য ক্ষমতার অধিকারী নন। এ কারণে তার বই মেলায় সর্বাধিক বিক্রি হয়। কিশোর-কিশোরীরাই মূলত তার এই বইয়ের পাঠক। হুমায়ুন প্রধানত বইমেলাকে সামনে রেখেই বহু সংখ্যক বই লিখে থাকেন। তার গল্পগুলো হাল্কা ধরনের হলেও তাতে অশ্লীল বা কুৎসিত বলেও কিছু থাকে না। এগুলো এক ধরনের নিরীহই বলা চলে। এই বইগুলো লিখে হুমায়ুন ও তার প্রকাশকরা সেগুলো প্রকাশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এর কাজ করে একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে হুমায়ুন অর্থের পায়ে নিজেকে নিবেদন করে লেখক হিসেবে নিজের যে ক্ষতি করেন তার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে এর দ্বারা অল্পবয়স্ক পাঠক ও সমাজ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা খেয়াল করার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, এর দ্বারা যা হয় সেটা হলো হাজার হাজার ক্রেতা এই বইগুলো কেনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তার ফলে তাদের কিছু উত্তেজিত সময় কাটলেও তার মধ্যে শেখার (instruction) কিছু থাকে না। যে কোন মূল্যবান গল্প, উপন্যাস, কবিতার মধ্যে উত্তেজনার বা ফূর্তির পরিবর্তে থাকে আনন্দ। শুধু আনন্দও নয়, তার মধ্যে থাকে শেখার মতো উপাদান। হুমায়ুন আহমেদের লেখার মধ্যে পাঠকদের শিক্ষার বিষয় বলে কিছু থাকে না। এ ধরনের বইয়ের পরমায়ুও সে কারণে হয় স্বল্প। এই বই দিয়ে পাঠকরা কোন লেখককে বেশী দিন মনে রাখতেও পারেন না।

এ তো গেল এক দিক। অন্যদিক হলো, বই কেনার জন্য অল্প বয়স্কদের হাতে তাদের অভিভাবকরা যে অর্থ বরাদ্দ করেন তার একটা বড় অংশ এভাবে হুমায়ুন ও তার ঘরাণার অন্য লেখকের বই কিনে ব্যয় করার কারণে অন্য ধরনের বই– বিজ্ঞান, সিরিয়াস সাহিত্য, ইতিহাস, ভালো অনুবাদ গ্রন্থ ইত্যাদি কেনার জন্য হাতে আর পয়সা থাকে না। কাজেই মেলায় অথবা মেলার সময়ের বাইরে অন্যকিছু ভালো বই আসে বা পাওয়া যায় সেগুলো কেনার মতো অর্থ-সামর্থ্য তাদের আর থাকে না। তারা সেগুলো তাকিয়েও দেখে না। এর ফলে বই পড়া থেকে একটি জাতির নোতুন প্রজন্মের যেভাবে উপকৃত হওয়ার কথা সেভাবে তারা উপকৃত হয় না। এর একটা বড় ক্ষতিকর দিক হলো, বই পড়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী অল্প বয়স্কদের চিত্তের যে বিকাশ হওয়ার কথা সেটা হতে পারে না।

এসব চিন্তা-ভাবনার কোন স্থান ফেব্রুয়ারীর বইমেলা উপলক্ষে না থাকায় হুমায়ুন আহমেদের ও তার মতো কয়েকজনের বই বিক্রির হিড়িক নিয়ে উচ্ছ্বাসে পূর্ণ রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এসব রিপোর্ট দেখে মনে হয় একজনের লেখার গুণাগুণ বা সাফল্য তার বই বিক্রি অর্থাৎ বাণিজ্যিক সাফল্যের ওপরই নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই তাদের অভিবাবকদের সঙ্গে মেলায় আসে। তারা কে কি বই কিনেছে তার ওপর টেলিভিশনে রিপোর্ট থাকে। তার থেকে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ভূতের গল্পের বই কেনে। ভূতের গল্পের বই তারা কিনলে দোষ নেই। কিন্তু তারা শুধু ভূতের গল্পের বই বেশী কিনছে না, ওই ধরনের অন্য বইয়ের প্রতিও তাদের ঝোঁক। খুব অল্প সংখ্যকই কিনছে ছোটদের জন্য বিজ্ঞান, জীবনীগ্রন্থ, অনূদিত গল্প ইত্যাদি। অথচ ছোটদের জন্য শুধু ভূতের বা ওই ধরনের গল্প পাঠ কোন স্বাস্থ্যকর ব্যাপার নয়। আর একটু বয়স বাড়লে এরাই হাল্কা গল্প উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং হুজুগের মতো করে সেগুলো কিনবে।

অধিকাংশ লেখক ও প্রকাশক নিজেদের কাজ ও তৎপরতা ফেব্রুয়ারীর মেলা সামনে রেখে করার মতো শর্ত থাকার কারণেই এটা ঘটে। অন্যথায় এটা সম্ভব হতো না। অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকও ফেব্রুয়ারীর দিকে তাকিয়ে এ কাজ করায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ কারণে বই লেখা ও প্রকাশনাকে বইমেলার খুঁটির বন্ধন থেকে মুক্ত করা দরকার। কিভাবে এটা করা সম্ভব এ চিন্তা-ভাবনা সবারই দায়িত্ব। এক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপের চিন্তা করা যেতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলো বইমেলা কেন্দ্রিক নয়। এগুলো কতগুলো সাধারণ করণীয় যা করলে বইয়ের জগতের উন্নতি সম্ভব এবং সেসঙ্গে সম্ভব পাঠকদের পাঠাভ্যাসের পরিবর্তন এবং উন্নতি।

১. জ্ঞান-বিজ্ঞান, কথাসাহিত্যের বিশ্ব ভাণ্ডারের সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠকদের পরিচয় করানোর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বই অনুবাদ করা। এজন্য সরকারীভাবে একটি অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা, যার কাজ হবে শুধু অনুবাদ করা। আজকাল বাঙালিরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী লোকের সংখ্যাও এখন কম নয়। কাজেই যারা বিদেশে থেকে তাদেরও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। এই অনুবাদ সংস্থায় উপযুক্ত ও যোগ্য লেখকদের নিযুক্ত করে সুষ্ঠুভাবে এর পরিচালনার ব্যবস্থা করা দরকার। এর ফলে আমাদের দেশের নোতুন প্রজন্মের পাঠকদের রুচি পরিবর্তিত হবে। বইয়ের ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতা বাড়বে এবং তাদের সামনে বইয়ের এক নোতুন জগৎ উন্মুক্ত হবে।

২. এই সঙ্গে দরকার বাংলা, ইংরেজি এবং অন্য ভাষায় অন্য দেশে প্রকাশিত বই আমদানী উৎসাহিত করা। এজন্য বইয়ের ওপর আমদানী কর রহিত করা।

৩. দেশে সরকারী পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেগুলোর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি ও নিয়মিত করা। নোতুন বই কেনার জন্য পৃথকভাবে বরাদ্দ ব্যবস্থা করা। এছাড়া বেসরকারীভাবে সর্বত্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এ ধরনের পাঠাগারের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ করা। দলীয়করণের চেষ্টা না করে ক্রয়যোগ্য বইয়ের তালিকা তৈরী করা এবং পাঠাগারগুলো যাতে তাদের বরাদ্দকৃত অর্থের ২০ ভাগ বা ২৫ ভাগ তালিকাভুক্ত বই ক্রয় করে তার জন্য নির্দেশ দেয়া। এটা করা হচ্ছে কিনা এর সঠিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা।

www.pathagar.com

৪. সরকারের একটি বই ক্রয়নীতি আছে। এই নীতি অনুযায়ী বছরে কয়েক কোটি টাকার বই সরকার প্রকাশকদের থেকে সরাসরি কিনে থাকে। এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে চরম দুর্নীতিই রাজত্ব করে। কিছু দলীয় সাহিত্যিক ও সরকারী আমলা মিলে কমিটি গঠন করে সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণের ভিত্তিতে প্রকাশকদের থেকে বই কেনা হয়। শুধু তাই নয়, অনেক বাজে ও নিকৃষ্ট বই এভাবে কিনে সরকার পুস্তক ব্যবসায়ী ও লেখকদের সাহায্য করার পরিবর্তে কিছু দুর্নীতিবাজ লেখক প্রকাশকের পকেট ভর্তির ব্যবস্থা করে। এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সরকারী বই ক্রয়ের তালিকা তৈরীর জন্য লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রকাশকদের নিয়ে প্রকাশ্য কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে কাজ করা এবং বইয়ের তালিকা, প্রকাশকের তালিকা সর্বসাধারণের অগ্রগতির জন্য প্রকাশ করা।

৫. বই প্রকাশের পর সাধারণভাবে প্রকাশকরা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেন না। বইয়ের বিজ্ঞানের চড়া হার এর অন্যতম কারণ। দ্বিতীয়, এ কারণেই প্রকাশকদের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেয়ার ঐতিহ্য নেই। মুদির দোকানের সামগ্রীর মতো করেই তারা সাধারণত নিজেদের কাউন্টার থেকে বই বিক্রি করেন। এ কারণে কি বই বের হচ্ছে, কে যে এসব বই প্রকাশ করছে তার খবর পাঠকদের পক্ষে রাখা সম্ভব হয় না। এর জন্য সারা বছর ধরে বই সেভাবে বিক্রি হয় না। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারের যা অবশ্যই করা দরকার তা হলো, পত্র-পত্রিকাগুলোতে বইয়ের বিজ্ঞাপনের হার খুব কম রাখার নির্দেশ দেয়া এবং এর নির্দেশ পালন করতে তাদের বাধ্য করা। বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক জিনিসের বিজ্ঞাপনের হার এবং বইয়ের বিজ্ঞাপনের হার অভিন্ন থাকা দেশে শিল্প সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে এক মস্ত বাধা।

এছাড়া আরও অনেক কিছু এ বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। সব থেকে বড় প্রয়োজন এই চিন্তার জন্য সচেতন পাঠক এবং লেখক প্রকাশকদের মধ্যে তাগিদ সৃষ্টি হওয়া। ফেব্রুয়ারী মাস এলে বইমেলাকে কেন্দ্র করে যেসব কাজকাম ও কথাবার্তা চলতে থাকে তার পরিবর্তে দেশে এসব বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনাই আজ জরুরী হয়েছে।

যুগান্তর : ২১.২.২০১২ ১৯.২.২০১০

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ফেরত যাওয়ার চক্রান্তমূলক প্রহসন

বাঙলাদেশে এখন ভাষা, সংস্কৃতি, জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও তার ঐতিহ্য, এক কথায় মহান বলতে যা কিছু বোঝায় তার বাণিজ্যিকীকরণ যেভাবে হয়েছে তার চরিত্র ভয়াবহ। একুশে ফেব্রুয়ারী ও বাংলা একাডেমীর বইমেলাকে নিয়ে যা শুরু হয়েছে তাতে বোঝা যায় জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ব্যবহার করে ঘৃণিত আত্মপ্রচারণা ও বাণিজ্য স্বার্থ সমগ্র পরিবেশকে কি পরিমাণে কলুষিত করেছে। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৭১ এবং তার পরবর্তী কিছু কাল পর্যন্তও যে একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রতীক, এখন তাকে পরিণত করা হয়েছে ভাঁড়ামির ব্যাপারে। আত্মপ্রচারণা এবং সেই সঙ্গে অন্য স্বার্থে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে অল্পবিস্তর জড়িত কিছু ব্যক্তি একুশে ফেব্রুয়ারীকে বাণিজ্যিক স্বার্থে কীভাবে ব্যবহৃত হতে দিয়েছেন তার সব থেকে নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো একুশে ফেব্রুয়ারী দৈনিক প্রথম আলো এবং গ্রামীণফোন এর উদ্যোগে কয়েকজনকে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় নিয়ে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর মতো এক মহান দিবসের ঘটনাবলির মহড়া দেয়া। এই প্রহসনের কাজ যদি কিছু ছাত্র এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন করত, তাহলেও এর একটা অর্থ থাকত, যদিও সে অর্থের মূল্যও হতো সামান্য। কিন্তু বাস্তবত এটা করেছে দুই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষত গ্রামীণফোনের মতো একটি প্রতিষ্ঠান, যারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সব থেকে উচ্চ হারে কল চার্জ নিয়ে আমাদের দেশের জনগণের পকেট মেরে কোটি কোটি ডলার দেশের বাইরে পাচার করছে।

এটা অবশ্য কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। বহুজাতিক বিভিন্ন করপোরেশন এখন হয়েছে বাঙলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সব সাংস্কৃতিক সংগঠন, অনুষ্ঠান ও তৎপরতার পৃষ্ঠপোষক। এক কথায় বলা চলে, এ দেশের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক সংগঠন বহুজাতিক করপোরেশন এবং এনজিওদের অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ও তাদের হাতে জিম্মি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পরিস্থিতিতে একটি দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য চর্চার স্বাধীন বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। বাঙলাদেশে সেটা ঘটছেও না।

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রথম আলো ও গ্রামীণফোনের যৌথ উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ঘটনাবলীতে ফেরত যাওয়ার যে মহড়া দেয়া হয়েছে তাতে সজ্ঞানে অথবা অসচেতনভাবে যোগদান করে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্কিত, এমনকি নামমাত্র সম্পর্কিত কয়েক ব্যক্তি নিজেদের যেটুকু ভাবমূর্তি ছিল তা কীভাবে সচেতন লোকজনের সামনে ভূলুণ্ঠিত করেছেন এ উপলব্ধি তাদের আছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

একথা বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন হয় না যে, বহুজাতিক করপোরেশনগুলো যেভাবে বাঙলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে, যেভাবে এখানকার সাংস্কৃতিক মহলের লোকজনকে নানা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে হাতের মুঠোয় রাখছে, এটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনেরই দৃষ্টান্ত। বিগত একুশে ফেব্রুয়ারী '১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ফেরত যাওয়ার' যে অনুষ্ঠান তারা করেছে তার বিজ্ঞাপন প্রথম আলো এবং গ্রামীণফোনের যৌথ নামে কয়েক দিন ধরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রেই বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এর জন্য ব্যয় হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কয়েক ব্যক্তি আত্মপ্রচারণার জন্য গেলেও কয়েকজনের পকেটে যে ভালো টাকা-পয়সা ফেলা হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ এসব ব্যাপারে টাকা-পয়সার লেনদেনের জন্য ইতিমধ্যেই সচেতন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে ধিকৃত হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমতলার উপরিউক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রথম আলো এবং গ্রামীণফোন যৌথ উদ্যোগে একটি ব্রোশিয়ার বা পুস্তিকা বের করেছে। এই পুস্তিকায় আমার একটি লেখা তারা পুনর্মুদ্রণ করেছে। এ কাজ করা হয়েছে প্রতারণামূলকভাবে। আমাকে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে তাদের এক সাংবাদিক সোহরাব হোসেন (যুগান্তরে থাকার সময় তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হতো) বলেন যে, তারা একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে তাদের পত্রিকার একটি সাপ্লিমেন্টে আমার একটি লেখা পুনঃমুদ্রিত করতে চান। আমি এতে আপত্তির কোন কারণ না দেখে অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে আমাকে এ কথা বলে প্রথম আলোর সাপ্লিমেন্টে নয়, 'প্রথম আলো' এবং সেই সঙ্গে গ্রামীণফোনের মতো একটি বহুজাতিক করপোরেশনের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তিকাটিতে আমার লেখাটি ছাপা হয়েছে। প্রথম আলোর এই প্রতারণামূলক কাজের জন্য যেমন আমি বিস্মিত, তেমনি বিক্ষুব্ধ হয়েছি। আমি যে 'গ্রামীণফোন' এর কোন ব্রোশিয়ারে লেখা দিতে পারি না এটা এ দেশের সচেতন এবং ওয়াকিবহাল লোকদের জানা আছে। কাজেই একুশে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের জায়গায় তাতে আমার লেখা দেখে অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন ও মিথ্যা প্রচারণা হিসেবে একে চিহ্নিত করেছেন। এটাই স্বাভাবিক। প্রথম আলো এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে যে প্রতারণা করেছে এটা বুঝতেও তাদের অসুবিধা হয়নি। বাঙলাদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনি, আগেকার থেকেও বেশী ভয়াবহ নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপারে বহুজাতিক করপোরেশন, এনজিও ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েই এ কাজ করছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ফেরত যাওয়া উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেটিও এই চক্রান্তেরই এক দৃষ্টান্ত।

এই চক্রান্ত প্রতিরোধের প্রয়োজন আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় কর্তব্য। যে একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ সাল থেকে বছরের পর বছর ধরে শোষক-শাসক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দিবস হিসেবে পালিত হয়ে

www.pathagar.com

এসেছে, সেই একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান আজ বিকৃতভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সির দ্বারা। এটা যে একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের এবং যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্য কতখানি অশ্রদ্ধা এবং অবমাননার ব্যাপার, এটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এর সব থেকে ট্র্যাজিক দিক হলো, ভাষা আন্দোলনের কয়েকজন নেতা-কর্মী এই চক্রান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে একে legitimacy প্রদান এবং সঙ্গতকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। দেশে আজ উচ্চমার্গের লোকজনের চরিত্রের অবক্ষয় আজ কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এ হলো তারই এক অভ্রান্ত উদাহরণ।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য সমাজের নোতুন প্রজন্মের এবং গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন এখন বড় আকারে দেখা দিয়েছে। এই চক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যদি এই মুহূর্তে প্রতিরোধের জন্য তারা এগিয়ে না আসেন তাহলে দেশের পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে গড়িয়ে দেশের জনগণ ও নোতুন প্রজন্মের আরও ভয়াবহ সর্বনাশ ডেকে আনবে।

আমার দেশ : ২৫.২.২০১০ ২২.০২.২০১০

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন গুলোর নির্বাচন প্রসঙ্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন গত ২০ বছর ধরে বন্ধ থাকা নিয়ে 'কালের কণ্ঠে' একটি রিপোর্ট খুব গরুত্ব সহকারে প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে (২২.০৩.২০১০)। এই রিপোর্টের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ থেকে যা লক্ষ্য করার বিষয় তা হলো, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলই নাকি নির্বাচন চায়। কিন্তু অনুল্লিখিত কোন গুরুতর কারণে এই নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ থেকে যে সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক, তা হলো যারা নির্বাচন চায় তারা বলছে তাদের মধ্যে এমন কোন কোন শক্তিশালী মহল অবশ্যই আছে যারা নির্বাচন চায় না। যারা নির্বাচনের বিরোধী, যারা মিথ্যা কথা বলছে তা যদি না হতো তাহলে সবাই নির্বাচন চায় অথচ বছরের পর বছর ধরে, ২০ বছর পার হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কোন গ্রাহ্য কারণ থাকা সম্ভব নয়। একটি ধারণা প্রচলিত আছে, ১৯৯০ সালের শেষে এক নাগরিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের সামরিক স্বৈরতন্ত্রী সরকার উচ্ছেদের পর দেশে নাকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'পুনঃপ্রবর্তন' হয়েছে। এটা ঠিক যে, এরশাদকে তাড়িয়ে দেয়ার পর ১৯৯১ সালে সাবালকের ভোটের ভিত্তিতে একটি নির্বাচিত জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং সেই সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে একটি সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। সেই থেকে চারবার জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত চারটি সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। কিন্তু এভাবে সরকার প্রতিষ্ঠার ধরন পরিবর্তন হলেও দেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 'পুনঃপ্রবর্তন' হয়নি এটা বাঙলাদেশের জনগণের চেয়ে ভালোভাবে আর কে জানে?

১৯৭২ সাল থেকে লুটতরাজ, চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে যে শাসক শ্রেণী নোতুনভাবে গঠিত হয়েছে, যারা রঙবেরঙের সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশ শাসন করে আসছে, তার মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোটা ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব নেই। স্বৈরতন্ত্র দিয়ে যে শাসন ব্যবস্থার শুরু, তা এখন ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হয়ে সারাদেশে যে ব্যবস্থা নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে কায়েম করেছে তার সঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের যে অবস্থা আরেক সংবাদপত্রের রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে বোঝার চেষ্টা অথবা সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টার দায় কিছুই হওয়ার নয়। কারণ, এটা একেবারেই অবাস্তব। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন এবং

www.pathagar.com

সেই সঙ্গে হল ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন কেন একের পর এক নির্বাচিত সরকারের আমলে বন্ধ থেকেছে; এবং নোতুন একটি নির্বাচিত সরকার এক বছরেরও বেশী সময় ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও কেন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান শাসক শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা ও শাসন স্বার্থের মধ্যেই করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে, ওপরের রিপোর্টে সবারই নির্বাচন চাওয়ার কথা থাকলেও তাদের মধ্যে খুব শক্তিশালী কোন কোন মহল এহি নির্বাচন না চাওয়ার কারণেই নির্বাচন হতে পারছে না। এ নিয়ে সংশয়ের কোন সুযোগ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের (ডাকসু) নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় ডাকসুর সহ-সভাপতিকে বিএনপি সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছিল এবং নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে প্রতি মন্ত্রী করেছিল। ছাত্র অবস্থায় এমপি ও মন্ত্রী হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত আগে ছিল না। এবং পরেও আর থাকেনি। একজন ডাকসু ভিপি সরকারের মন্ত্রী-এমপি হলে যে অবস্থা হয় ডাকসুর অবস্থাও তাই হয়েছিল। ডাকসু সহসভাপতি মন্ত্রী হিসেবে পাঁচ বছর বহাল থাকা অবস্থায় ডাকসুর আর কোন নির্বাচন হয়নি। শুধূ তাই নয়, ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় অন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের কোন নির্বাচনই আর হয়নি। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি সৃষ্টি। এভাবেই ক্ষমতাসীন সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন কর্তৃক হল দখল হওয়ার ঐতিহ্য সৃষ্টি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর তাদের ছাত্র লীগ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিএনপি'র ছাত্র দলকে বিশ্ববিদ্যায় থেকে বহিষ্কার করে সব হলই দখল করে। মন্ত্রী থাকার সময় বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনের নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে এবং অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন, তারই জের ধরে ছাত্র লীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি সুবিধার বিনিময়ে টাকা আদায় ইত্যাদি। অর্থাৎ এ সময় ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়তে থাকার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়া ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্র দলের দ্বারা জারী থাকে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র দুর্নীতির সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যে অবস্থায় এখন দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে ভয়ংকর কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্পনা করাও কঠিন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতাপ যথেষ্ট থাকলেও সেখানে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এখন ছাত্র লীগেরই দোর্দন্ড প্রতাপ। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অধঃপতনের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে সাধারণ পরিস্থিতি, বিশেষ করে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর অধঃপতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শুধু তাই নয়, সব শাসনব্যবস্থার মধ্যে শাসক শ্রেণীর মূল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছে, তার প্রতিফলনই ঘটছে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাদের ছাত্র সংগঠনের ওপর বড় আকারে নির্ভরশীল। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারাও তা ভালোভাবে জানেন। মূল দলগুলোর নেতৃত্বের দুর্নীতির কথাও তাদের অজানা নয়। কাজেই নিজেদের সুবিধাজনক

www.pathagar.com

অবস্থানের সুযোগ তারা নেয়। ছাত্র থাকা অবস্থায় হল দখল করে তারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি-বাণিজ্য সবকিছুই করে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বাইরে যেখানেই ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা টেন্ডারের জন্য দাঁড়ায়, সেখানেই তারা উপস্থিত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে টেন্ডার বাণিজ্য করে।

এই যেখানে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজগুলোর অবস্থা, তখন সেখানে আগেকার কায়দায় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন বা হল ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতা দখল অবান্তর ব্যাপার। এটা সবারই জানা, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর প্রশাসনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। উপাচার্যরা রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত হন এবং দলীয় স্বার্থরক্ষা করেই তারা নিজেদের গতি রক্ষা করেন। এর জন্য সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর সাহায্য তাদের দরকার হয়। তাদের ওপর তারা প্রশাসনিকভাবেও অনেকটা নির্ভরশীল থাকেন। কাজেই মুখে তারা যাই বলুন, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন ও হল নির্বাচন করে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা যেতে চান না। প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন কর্তৃক হল দখলে থাকাটা তাদের জন্যও সুবিধাজনক।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, দুই দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন না হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারের কোন বক্তব্য নেই। তাদের কোন উৎসাহ নেই। তারা বিদ্যমান অবস্থাকে টিকিয়ে রেখেই চলতে চায়। কাজেই এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুখে যতই বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন গুলোর নির্বাচন হওয়া দরকার, বাস্তবত তারা তা চান না, চাইতে পারেন না। কারণ তারা যে সরকারের কর্মচারী হিসেবে আজকের পদে বহাল আছেন সেই সরকার এটা চায় না।

কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছুটা নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ছাত্র দুর্নীতি কমিয়ে আনা, শিক্ষার পরিবেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনার প্রশ্নই উঠে না– যদি বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারী ছাত্র সংগঠন কর্তৃক হল দখল বন্ধ করা এবং হলগুলোতে নির্বাচিত ইউনিয়নের কর্তৃত্ব আংশিকভাবে হলেও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের কোন উৎসাহ নেই– এটা একটু আগেই বলা হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা যারা সৃষ্টি করছে, তাদের সিদ্ধান্তই সার্বভৌম। তারাই সেই প্রবল শক্তি, যারা কেন্দ্রীয় এবং হল ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের বিরোধী।

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের তাগিদ পরিস্থিতির মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে ও জোরালো হচ্ছে, অন্যদিকে খোদ সরকারই এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করছে। এই টানাপোড়েনই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন অস্থির অবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে, পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঠেকিয়ে রাখছে।

কালের কণ্ঠ : ২০.৩.২০১০ ২২.৩.২০১০

www.pathagar.com

বাঙলাদেশে মিথ্যার রাজত্ব

বাঙলাদেশের সমাজে মিথ্যা এখন মহামারীর আকারে ছড়িয়ে আছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মিথ্যা কথা বলা এখন আর বড় রকম কোন দোষের ব্যাপার বলে বিবেচিত হয় না। যেহেতু অল্পকিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই ছোটবড় মিথ্যা কারণে-অকারণে বলছে, এ কারণে তারা যে মিথ্যাবাদীকে খারাপ চোখে দেখবে না এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা এখন বাঙলাদেশের সমাজে পরিণত হয়েছে এক স্বাভাবিক ব্যাপারে।

কিন্তু মিথ্যা কোন স্বাধীন আচরণ নয়, জ্বর যেমন নিজে কোন অসুখ নয়, অন্য কোন অসুখের লক্ষণ মাত্র। কাজেই শুধু শুধু মিথ্যা বলে কিছু লাভ নেই। মিথ্যা যাদের একেবারে মজ্জাগত তারা অবশ্য অনেক সময় অকারণেই মিথ্যা বলে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে কেউ মিথ্যা বলে কোন কিছু গোপন করা, কোন দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, অন্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিপদে ফেলা, নিজের ভিত্তিহীন কৃতিত্ব জাহির করা ইত্যাদি কারণে। এ থেকে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তাহলো, যে সমাজে নানা ধরনের অপরাধ যতো ব্যাপকতা ও বিস্তৃত লাভ করে, মানুষ যত অপরাধপ্রবণ হয়, সে সমাজের মিথ্যা ততই পরিণত হয় প্রচলিত অভ্যাসে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি'। বাঙালির মধ্যে মনুষ্যোচিত গুণাবলীর অভাব লক্ষ্য করেই যে তিনি এভাবে আক্ষেপ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তার জীবদ্দশায় যে সমাজে বাঙালির মধ্যে মানুষ্যোচিত গুণাবলীর অভাব দেখে একথা বলেছিলেন, সে সমাজের সঙ্গে বাঙলাদেশের বর্তমান সমাজের তুলনা করলে তাকে স্বর্গতুল্য বলেই মনে হবে। মনুষ্যত্বের অভাব চরম ও নিষ্ঠুর অমানুষিকতায় পরিণত হয়ে যে অবস্থা এখন প্রাপ্ত হয়েছে, এর রূপ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

চিরায়ত সামন্ত যুগে মিথ্যার প্রচলন বিশেষ ছিল না। মিথ্যা বলা ছিল ব্যতিক্রমী ব্যাপার। সামন্ত ব্যবস্থা ভাঙতে শুরু হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকার সময়ে মিথ্যার প্রচলন বাড়তে থাকে। এ সময় রূপান্তরিত হতে থাকা সমাজে অসংগঠিতভাবে অনেক নোতুন ধরনের কারবার হতে থাকে। মানুষ বহুরকম ফন্দি-ফিকিরের সন্ধানে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজের এ বিকাশ ইউরোপে শুরু হওয়ার সময় থেকে মিথ্যা প্রতারণা ইত্যাদি অনেক কিছু দেখা যায়। মার্কস তার পুঁজি গ্রন্থে বলেছেন, কোন সমাজে যখনই ব্যবসায়ী পুঁজির মালিকরা ক্ষমতায় আসে তখন সেই সমাজে শঠতা, খুন, জখম, অপহরণ থেকে নিয়ে সব রকম অপরাধের বৃদ্ধি ঘটে। দাস প্রথা,

www.pathagar.com

সামন্ত প্রথা, পুঁজিবাদ প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই ব্যবসায়ীদের শাসনের অর্থই হলো সমাজে অস্থিতিশীলতা এবং এই অস্থিতিশীলতারই প্রতিফলন ঘটে উপরোক্ত সব আচরণের মধ্যে। যে সমাজ যত স্থিতিশীল হয় সে সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও অপরাধ তত কম থাকে।

ইউরোপ, বিশেষত আমেরিকায় অপরাধীর সংখ্যা কম নয়। তবু মানুষ সমাজে বসবাসকালে নিজেদের মধ্যে আচরণগত কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলে। এজন্য এসব দেশের ধনিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য দেশে নিষ্ঠুর শোষণ-নির্যাতন চালালেও এবং নিজেদের জনগণকেও শোষণ-নিপীড়ন করলেও পারস্পরিক আচরণের সময় মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি সেখানে তুলনায় অনেক কম। ১৯৬০ সালে কলকাতায় Indian Statistical Institute-এর প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকার সময় জেবিএস হলডেন ব্রিটেনের তৎকালীন ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত এক বিশেষ সংখ্যায় লিখেছিলেন– ভারতীয় মন্ত্রীরা পর্যন্ত সামান্য চাপরাশির চাকরির জন্যও তদবির করেন। ভারতে মানুষ খুব মিথ্যা বলে। এসব কিছুই হয় ভারতীয় সমাজ তখন পর্যন্ত তুলণামূলকভাবে অসংগঠিত এবং শিল্প বিকাশ নিম্নস্তরে থাকায়। ভারত যখন একটা পুরোপুরি সুগঠিত শিল্প সমাজে পরিণত হবে, সমাজ অনেক যান্ত্রিক হবে, তখন এসব এভাবে আর হবে না। কারণ যন্ত্রের কাছে মিথ্যা বলা বিপজ্জনক, মারা পড়ার সম্ভাবনা।

এমন কোন মানব সমাজ কল্পনা করা যায় না, যেখানে কোন মানুষ মিথ্যা বলে না। এজন্য প্রাচীনকাল থেকেই সত্য বলার হিতোপদেশের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সমাজে মিথ্যার ব্যবহার কী পরিমাণ হয় এবং কোন ধরনের লোকে মিথ্যা বলে। সমাজে যারা সাধারণ পেশায় থাকে ও জীবনযাপন করে, তাদের মধ্যে মিথ্যার ব্যবহার দেখা যায় না। দেখা দিলেও সেটা হয় ব্যতিক্রম।

বাঙলাদেশের অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে, ব্রিটিশ বা পাকিস্তানী আমলে সমাজে মানুষ মিথ্যার ব্যবহার কমই করত। সেটাও তারা করত সংযতভাবে। এজন্য মিথ্যাবাদীর সংখ্যা ছিল কম। সে তুলনায় বাঙলাদেশে এখন মানুষ যেভাবে মিথ্যা বলে, যত অধিক সংখ্যায়, যত বেপরোভাবে বলে, এটা আগে ভাবাই যেত না। এখন মিথ্যা বলে না, এমন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, এতো বেশী লোক এখন এতো মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে বলে যাতে মিথ্যার এক ধরনের গ্রহণ যোগ্যতা সমাজে তৈরী হয়েছে। মিথ্যাবাদীকে অপরাধী মনে করে– এমন লোকের সংখ্যা হাতেগোনা।

অভ্যাসের এই পরিবর্তন বিশেষ করে মিথ্যা বলার প্রবণতা ও বাস্তবত মিথ্যা বলে যাওয়ার সঙ্গে, ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তার সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে অবিচ্ছেদ্য। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া দল ও দলভুক্ত লোকদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমর্থকরা প্রথম থেকেই লুটতরাজ, চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণা ও সেই সঙ্গে সন্ত্রাসের মাধ্যমে এক নতুন শাসক

www.pathagar.com

শ্রেণী গঠন করেছে। যেভাবে এই শাসক শ্রেণী নিজের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই গড়ে উঠেছে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতি, অভ্যাস আচরণ। এ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে মিথ্যাও যে মানুষের অভ্যাস-আচরণের নিত্যসঙ্গী হবে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, সমাজে শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতি, অভ্যাস-আচরণ যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, এ কারণে এটা সাধারণভাবে সমগ্র সমাজকেই আচ্ছন্ন করে। মিথ্যা এভাবেই সমাজের প্রত্যেক স্তরে এখন মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে অভ্যাস-আচরণের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে।

বাঙলাদেশে এখন ভদ্রলোকেরা নিয়মিতভাবেই মিথ্যা বলে থাকেন। এদের নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী মিথ্যা কোন অপরাধ বা নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। চুরি, দুর্নীতির সঙ্গে যারা সরাসরি সম্পর্কিত নয়, তারাও মিথ্যা বলেন। সামান্য অসুবিধা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যও এমন মিথ্যা বলতে লোকজনের ভদ্রলোকদেরও অসুবিধা হয় না। সমাজে মিথ্যার প্রতি যে সহনশীলতা দেখা যায় তার থেকেই জন্মলাভ করে বেপরোয়া মিথ্যা।

এই বেপরোয়া মিথ্যার সাগরেই এখন স্বাধীন বাঙলাদেশের নৌকা পাড়ি দিচ্ছে। স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রংবেরঙের মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জনগণের ভূমিকা এক্ষেত্রে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করা আছে, গড়পরতা লোকদের মহিমান্বিত করে, তাদের ওপর ইচ্ছামতো খেতাব বর্ষণ করে, তাদের দেবাতিদেব বানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প তৈরী হয়েছে। অনেক রকম বেঈমানকে দেশপ্রেমের ও সংগ্রামের পরাকাষ্ঠা হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছে। এক কথায় মিথ্যার অস্ত্র দ্বারা সত্যকে ধরাশায়ী করে যেভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস তৈরী করে অহরহ প্রচার করা হচ্ছে, এমনকি ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারই কাঠামোর মধ্যে মিথ্যা শুধু ইতিহাস বিষয়েই বলা হচ্ছে না, মিথ্যা এখন পরিণত হয়েছে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এক প্রয়োজনীয় ব্যাপারে।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই এখন শাসক শ্রেণী, রাষ্ট্র ও সরকারের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা মিথ্যা বলতে, এমনকি স্বচ্ছ মিথ্যা (transparent lies) বলতেও অসুবিধা বোধ করেন না। তারা অনেক ক্ষেত্রের মতো এ ব্যাপারেও বেপরোয়া। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তাদের কথা মিথ্যা প্রমাণ হওয়ার পরও তারা অদমিতভাবে একই মিথ্যা আবার বলেন। এসব মিথ্যা বারবার প্রচার মাধ্যমে বিশেষত সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। মিথ্যার এই পুনরাবৃত্তি অনেকের কাছে সত্যের মতোই মনে হয়। এসব মিলিয়ে বাঙলাদেশে এখন মিথ্যার জয়জয়কার। তাই অনেক ক্ষেত্রে সত্য ভাষণ এখানে রীতিমতো বিপজ্জনক।

সমাজের শীর্ষস্থানে, উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থানরত লোকেরা মিথ্যা বলে পার পেয়ে গেলে তার সবচেয়ে বড় ক্ষতির দিকে হয় সাধারণ জীবনের ওপর তার প্রভাব পড়া। এ প্রভাবের অর্থ কার্যত দাঁড়ায় সাধারণ লোকের মধ্যেও এ অভ্যাস সংক্রামিত হওয়া, সমাজে মিথ্যার শক্তি বৃদ্ধি হওয়া। গৃহীত আচরণবিধিতে সত্যের শক্তির কথা বলা হয়,

www.pathagar.com

কিন্তু বাঙলাদেশের অবস্থান এদিক দিয়ে সংকটাপন্ন। মিথ্যার শক্তি এখানে এতো প্রবল যে তার মোকাবিলা করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

তবে সাময়িকভাবে এ কাজ যতই দুরূহ হোক শেষ পর্যন্ত মিথ্যার পরাজয় ঘটতে বাধ্য। কারণ মিথ্যা একদিকে যেমন সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে, তার মধ্যেই প্রাধান্য বিস্তার করে তেমনি সমাজ কখনও বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের পরাভবের শর্ত তৈরী হয়। এভাবে তৈরী হতে থাকা শর্তই পরিণামে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে।

আগেই বলা হয়েছে, কিভাবে প্রথম থেকেই বাঙলাদেশে শাসক দল ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজন এবং সেই সঙ্গে কিছু উদ্যোগী লোক লুটতরাজ, চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণার মাধ্যমে নোতুন শাসক শ্রেণীর অর্থনৈতিক চরিত্র গঠন করেছে। পরবর্তীকালে লুটতরাজের একটি ধরন দাঁড়িয়েছে ভূমিদস্যুতা। তারা সরকারী বেসরকারী জমি, এমনকি নদী-লেকসহ সব ধরনের জলাশয় দখল করে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ধনসম্পদ অর্জন করে ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণা ও ভূমিদস্যুতার মাধ্যমেই গঠিত হয়েছে ব্যবসায়ী শ্রেণী, যাদের প্রতিনিধিরা শাসক শ্রেণীর একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে এখন দেশ শাসন করছে। মিথ্যা এদেরই চরিত্রের ভূষণ।

যুগান্তর : ১১.৪.২০১০ ৪.৪.২০১০

www.pathagar.com

পহেলা বৈশাখের নিরানন্দ আনন্দ উৎসব

পহেলা বৈশাখ বাঙালির সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। তবে বছরের প্রথম দিনের এই উৎসব শুধু বাঙালিই করে না, বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দির মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষও বিভিন্ন নামে এই উৎসব করে থাকে।

উৎসবের সঙ্গে আনন্দ এবং আনন্দের সঙ্গে প্রাণশক্তির সম্পর্ক। স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির সম্পর্ক। কাজেই যে কোন উৎসব কারা কিভাবে পালন করবে, কখন পালন করবে আর কখন করবে না, এটা নির্ভর করে মানুষের প্রাণশক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপর। ধর্মীয়, জাতীয়, পারিবারিক, নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসবের সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

১৪১৭ সালের নববর্ষের উৎসব যখন পালিত হচ্ছে, তখন বাঙলাদেশের জনগণ বহুমুখী সংকটে জর্জড়িত ও বিপর্যস্ত। এই সংকট তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি হরণ করে তাঁদের প্রাণশক্তি দুর্বল করছে। স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া জনগণের সমগ্র অংশেরই আজ এই অবস্থা। এ ক্ষেত্রে যারা ব্যতিক্রম, তাদের বেশীর ভাগই দুর্বৃত্ত। চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমেই তারা নিজেদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের জীবনে সংকট সৃষ্টি করে যারা নিজেদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, তাদের জন্য সমাজ কোন শান্তি বরাদ্দ করে না।

সারা বছর দেশে এখন নানা ধরনের উৎসব পালিত হতে দেখা যায়। এসব মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও ঢাকার বাইরেও অন্যান্য শহরে এটা অল্প বিস্তর দেখা যায়। ১৯৭১ সালের পর নব্য ধনিক ও মধ্য শ্রেণীর আকার ও ধনসম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ছড়াছড়ি। এই সুযোগ-সুবিধার কাঠামোর মধ্যে এখন অনেক রকম উৎসব এদের দ্বারা পালিত হচ্ছে, যা এভাবে পালিত হতে আগে দেখা যেত না। এসব উৎসবে আনন্দের থেকে লঘু ফূর্তির উপাদানই থাকে বেশী।

পহেলা বৈশাখও বর্ষ শুরুর দিন হিসেবে যেভাবে এখন জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয় সেটাও আগে ছিল না। বাঙলাদেশের জনগণের জীবনে ওপরে যে সংকটের কথা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও পহেলা বৈশাখের উৎসব জনজীবনে এক ইতিবাচক ব্যাপার। এ উৎসব যেভাবে এখন পালিত হয়, তার স্পষ্ট শ্রেণী চরিত্র সত্ত্বেও ধর্ম ও শ্রেণীর বন্ধনে এ উৎসব আবদ্ধ নয়।

আগের দিনে বাঙলাদেশে বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখের থেকে বছরের শেষ দিন ৩০ চৈত্রই বিশেষভাবে পালিত হতো। সেটা হতো মূলত গ্রামাঞ্চলে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে ব্যবসায়ীরাই অনেকটা ঘটা করে পালন করতেন চৈত্রসংক্রান্তি। এখন

www.pathagar.com

চৈত্রসংক্রান্তির পরিবর্তে পহেলা বৈশাখই প্রধান উৎসবের দিন এবং এই উৎসব মূলত নগরকেন্দ্রিক। ঢাকা শহরেই এই উৎসবের জৌলুস স্বাভাবিকভাবে বেশী। শুধু তাই নয়, এ উৎসবের দিন ঢাকার মানুষ যেভাবে স্রোতের মতো পথে নামে, এটাও এই উৎসবের একটা নোতুন দিক।

এখানে এ কথা বলা দরকার, বর্ষ শুরুর দিন উদযাপনের জন্য পার্থক্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা ও গ্রামের মানুষ যেভাবে বৈশাখী উৎসবে অংশ নেয় বাঙালিদের সে ধরনের কোন অংশগ্রহণ দেখা যায় না। পহেলা বৈশাখের উৎসব প্রধানত নগরকেন্দ্রিক।

পহেলা বৈশাখের উৎসব ঘটা করে ঢাকায় পালন করা হলেও এটা মনে রাখা দরকার, দেশের মানুষ এখন যেভাবে নানা সংকটে বিপর্যস্ত, যেভাবে এখন জীবিকা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সংকট দেখা দিয়েছে, তাতে তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি নেই। স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির অভাব তাদের প্রাণশক্তিকে দুর্বল ও নিঃশেষ করছে। উৎসবের মানসিকতার পরিবর্তে এক গভীর নিরানন্দ তাদের জীবন আচ্ছন্ন রেখেছে। কাজেই উৎসবের হৈহুল্লোর সত্ত্বেও এর মধ্যে প্রকৃত প্রাণশক্তির পরিবর্তে এক ধরনের যান্ত্রিকতার পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে বলা চলে, পহেলা বৈশাখের এই উৎসব এক ধরনের নিরানন্দ বা নিষ্প্রাণ আনন্দ উৎসব।

বাঙলাদেশের সমতলভূমিতে বর্ষ শুরুর উৎসবের এই অবস্থা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম জনগণের অবস্থা এদিক দিয়ে আরো খারাপ। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটির সাজেকে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও খুনখারাবি ঘটনার পর সেখানে তাদের ওপর নানা নির্যাতন নোতুনভাবে চলছে। এই পরিস্থিতিতে বৈশাখী উৎসব পালন থেকে তাদের অনেকেই বিরত থেকেছে এবং অন্যরা তা পালন করেছে নিরানন্দ এক উৎসব হিসেবে। উৎসবের সঙ্গে প্রাণের যে সম্পর্ক থাকে তার অনুপস্থিতি তাদের বৈশাখী পালনের ক্ষেত্রে এবার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

সারাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে এ কথা বলা যায়, এ দেশের বর্তমান শাসক শ্রেণী জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতন এমনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর ওপর এমনভাবে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে, যাতে আনন্দের সঙ্গে উৎসব পালনের শর্ত সমাজে এখন আর নেই। এদিক থেকে বলা চলে, শাসক শ্রেণী দেশের সাধারণ নাগরিকদের উৎসবের অধিকার পর্যন্ত হরণ করেছে। কাজেই বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ থেকে সব ধরনের বর্ষ শুরুর উৎসব এখন নিরানন্দ আনন্দ উৎসব ছাড়া আর কী?

কালের কণ্ঠ : ১৪.৪.২০১০ ১৩.০৪.২০১০

www.pathagar.com

জনগণ এখন শুধু সরকার পরিবর্তন নয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চায়

বাঙলাদেশের জনগণ আজ হাজারও সমস্যায় জর্জরিত ও বিক্ষুব্ধ। জনগণের ওপর, বিশেষত বিপুল অধিকাংশ শ্রমজীবী জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতন কোন নোতুন ব্যাপার নয়। এমন কোন সময় এ অঞ্চলে দেখা যায়নি যখন এ অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ছিল। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশ আমলে এদিক দিয়ে জনগণের জীবনযাত্রা ও জীবন সংগ্রামের একটা ধারাবাহিকতা আছে।

এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে জনগণের মধ্যেও পরিবর্তনের একটা তাগিদ স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে। জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশ সমগ্র সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের একটা তাগিদ অনুভব করলেও বিপুল অধিকাংশ মানুষই এই পরিবর্তন বলতে বুঝেছেন সরকার পরিবর্তন। বিদ্যমান সরকারের শোষণ-নিপীড়ণের দ্বারা জর্জরিত হয়ে তারা মনে করেছেন, সেই সরকারের পরিবর্তন হলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হবে। কাজেই তারা নির্বাচনের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। এ সরকারের পরিবর্তে অন্য সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাদের ওপর শোষণ-নির্যাতনের কিছু কমতি হবে, এটা এমনভাবে তাদের বিশ্বাসের অংশে পরিণত হয়েছিল যে, বারবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কোন সুফল না পাওয়া সত্ত্বেও তারা একই প্রত্যাশায় বুক বেঁধে ভোট দিয়ে এসেছেন।

সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশার সৃষ্টি হলেও তারা চিন্তাগত অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে এর পরও নির্বাচনে ভোট দিয়ে এক দলের পরিবর্তে অন্য দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এ অবস্থা ১৯৯৬ সাল থেকে দেখা গেছে। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচন। বিএনপি ও বেনামি সামরিক সরকারের সাত বছরের শাসনকালে জনগণ যেভাবে বিপর্যস্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার পরিবর্তনের জন্য তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। প্রতিবারের মতো এবারও নির্বাচনী দলগুলোর ভুয়া প্রতিশ্রুতির অভাব ছিল না। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল সব থেকে রঙিন। সাত বছরের অন্য দলীয় শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং আওয়ামী লীগের রঙিন প্রতিশ্রুতির দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে জনগণ তাদের নির্বাচনে জিতিয়ে দেন।

এই বড় আকারের নির্বাচন বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ শাসক শ্রেণীর কয়েকটি ছোটখাটো দলকে লেজে বেঁধে গঠন করে তাদের তথাকথিত মহাজোট সরকার. কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের জোট সরকার এবং মইন-ফখরুদ্দীনের বেনামি সামরিক সরকারের

www.pathagar.com

শাসনের অবসান হলেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন তো হলো না, হওয়ার কথাও নয়। দেখা গেল, পূর্ববর্তী সময়ের মতো এবারও জনগণ বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এবারের মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তাদের এমনভাবে বিভ্রান্তি ও প্রতারিত করেছে, যার পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। এর কারণ আওয়ামী লীগ এবার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বড় আকারে এবং নানা বর্ণে রঞ্জিত করে জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিল। এই বড় ও আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি পালনের কোন লক্ষণই বর্তমান সরকারের মধ্যে না দেখে জনগণ অল্পদিনের ভেতরেই তাদের প্রতি মোহমুক্ত হয়েছেন, যা ইতিপূর্বে এতো তাড়াতাড়ি কখনও দেখা যায়নি। মাত্র পনের-ষোল মাসের মধ্যেই বর্তমান সরকার নিজের লুণ্ঠনজীবী (Predatory) চরিত্র জনগণের সামনে এমনভাবে উন্মোচিত করেছে যা প্রতারিত হতে অভ্যস্ত। বাঙলাদেশের জনগণকে শুধু বিস্মিতই করেনি, তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এই সরকারের চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও তার সঙ্গে সন্ত্রাস যুক্ত হয়ে দেশে যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে ও যেভাবে করেছে, এটা আগে দেখা যায়নি।

এই নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ এক নোতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নিজেদের মূল রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার জোরে প্রথমদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় এবং পরে তার সঙ্গে সমাজের ব্যাপক ক্ষেত্রে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, গুণ্ডামী, খুনখারাবি করে চারদিকে তারা এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এটা ঘটছে এমন অবস্থায়, যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অবাধ ও আকাশচুম্বি মূল্য বৃদ্ধি, কাজ ও মজুরির অভাবে, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্য, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাবে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ রয়েছে।

সরকারের ছত্রছায়ায় ষোল মাস ছাত্র লীগ তাদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাস চালিয়ে এখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যাতে চারদিকে এর বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়েছে। এই প্রবল বিরুদ্ধ জনমত শেষ পর্যন্ত আওয়ামী সরকারকে তাদের ছাত্র সংগঠনটির বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নেয়ার তোড়জোড় দেখাতে বাধ্য করেছে। তারা পুলিশকে এতদিনে হুকুম দিয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছাত্র লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু এই হুকুম কতটুকু কার্যকর হবে সেটা বোঝায় অসুবিধা নেই। কারণ এ ধরনের কাজ শুধু ছাত্র লীগই করছে তাই নয়, যুব লীগ, মহিলা লীগসহ তাদের রঙবেরঙের অনেক লীগই এ কাজ করছে। কাজেই এদিক দিয়ে ছাত্র লীগের অবস্থা হয়েছে 'সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী মৎস্যরাঙা কলঙ্কিনি'র মতো।

আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাকর্মীরা তো আছেই তার ওপর তাদের এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেম্বর ইত্যাদি লোকেরা বিভিন্ন স্তরে 'গডফাদার' নামক অপরাধী চক্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এখন সর্বত্র সক্রিয়। বস্তুতপক্ষে ছাত্র লীগ তাদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের এই চক্রের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এবং তাদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাঠামোর মধ্যে থেকেই নিজেরা দুর্নীতি ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব এখন তাদের ছাত্র সংগঠন নিয়ন্ত্রণের জন্য হম্বিতম্বি করলেও ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা জানে তাদের দলের নেতৃস্থানীয় লোকজন একই কাজ অবাধে ও বেপরোয়াভাবে

www.pathagar.com

চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু চালিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, এ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও সংগঠন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সঙ্গে এতো ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত যে এই দলকে এ দুই থেকে বিযুক্ত করার চেষ্টার অর্থ হলো তাকে ভেঙ্গে ফেলা। কে চায় নিজেদের দলকে নিজেরাই ভেঙে ফেলতে?

মাত্র ক'দিন আগে বিএনপি রাজশাহী সমাবেশে বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে যাওয়ার পথে কিভাবে আওয়ামী লীগের গুণ্ডাপাণ্ডারা তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে খুন-জখম করেছে, তার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিএনপি জনস্বার্থের প্রতিনিধি নয়, তাদের মধ্যেও দুর্নীতি, প্রতারণা, সন্ত্রাস ইত্যাদির অভাব নেই। তারা আওয়ামী লীগের শ্রেণী ভাই। তা সত্ত্বেও দলীয় স্বার্থ আওয়ামী লীগ তাদের ওপর যে হামলা চালাচ্ছে তাতে তার ফ্যাসিস্ট চরিত্র স্পষ্ট। এই সরকার যে শুধু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী দলকেই আক্রমণ করছে তা নয়। তারা আরও কঠোরভাবে নানা কায়দায় তাদের হামলা পরিচালনা করছে প্রগতিশীল সংগঠনের ওপর। তাদের সভা, সমাবেশ মিছিলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং পুলিশী হামলা চালিয়ে তাদেব শ্বাসরুদ্ধ করছে।

কাজেই ছাত্র লীগের বর্তমান সন্ত্রাসী তৎপরতাকে আওয়ামী লীগের এই নীতি ও তৎপরতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার চেষ্টা অবাস্তব। ঠিক একই কারণে ছাত্র লীগ দমনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কঠোর হওয়ার হুমকি যে তাদের প্রতারণার আর একটি দৃষ্টান্ত, এতে সন্দেহ নেই। তাদের এখন বাধ্য হয়ে এ কাজ করতে হলেও এর দ্বারা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই। যে রোগ দ্বারা আওয়ামী লীগ সর্বস্তরে নিজেরাই আক্রান্ত, ছাত্র লীগের সেই একই রোগ তারা সারাবে কিভাবে?

বর্তমান সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার ষোল মাসের মধ্যেই জনগণ এখন পরিবর্তনের বিষয়ে নোতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন। 'যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ'– এই চলতি কথার সারমর্ম এখন তারা উপলব্ধি করছেন, এক্ষেত্রে লংকায় যাওয়ার অর্থ হলো নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের গদিতে বসা।

আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ শাসক শ্রেণীর সব দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শোষণ, নির্যাতন ও প্রতারক চরিত্র জনগণ এখন গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন। এই উপলব্ধি চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যাতে তারা এখন আর শুধু সরকার পরিবর্তনের মধ্যে আশার ক্ষীণতম আলোও দেখেন না। তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের জীবনের কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও শাসন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কিভাবে ঘটবে এবং কারা এই পরিবর্তন ঘটাবে, এ বিষয়ে তাদের স্পষ্ট ধারণা এখনও না থাকলেও এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহে এবং এর তাগিদ তারা অনুভব করছেন। তাদের চেতনার এই পরিবর্তন যে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক বড় ধরনের ইতিবাচক দিক এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

যুগান্তর : ০৯.৫.২০১০ ৮.৫.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থার অশ্লীল বাণিজ্যিকীকরণ

বাঙলাদেশে এমন অনেক হৈচৈ ঘটনা ঘটে যার কোন মাথা মুন্ডু নেই। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় এসব রীতিমতো উদ্ভট ব্যাপার। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যা উদ্ভট, বাঙলাদেশে এখন সেসবই হয়ে দাঁড়িয়েছে নিয়মিত ঘটনা। স্কুল সমাপনী এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতি বছরই এ ব্যাপার ঘটে। স্কুল বোর্ডগুলো থেকে ঘোষণা দেয়া হতে থাকে কোন স্কুল ভালো ছাত্র-ছাত্রী উৎপাদনে শীর্ষস্থানে আছে, কোন স্কুলের সাফল্য অন্যদের তুলনায় বেশী, কত ছাত্র-ছাত্রী জিপিএ-৫ লাভ করেছে ইত্যাদি। বাহ্যত এসব ফিরিস্তি নিয়ে আপত্তির কিছু নেই; কিন্তু এ নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং এ প্রতিক্রিয়া নিয়ে হৈচৈয়ের ব্যবস্থা প্রচার মাধ্যমগুলোতে যেভাবে দেখা যায় তার উদ্ভট চরিত্র খুব স্পষ্ট।

২০০১ সালে পরীক্ষায় নোতুন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকেই এ অবস্থা দেখা যায়। তবে প্রথমদিকে এ নিয়ে হৈচৈ সামান্য হলেও এখন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে এক উদ্ভট ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আগেকার দিনেও পরীক্ষা হতো, পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো করত, কিছু স্কুলের ফল ভালো হতো। কিন্তু এখন যেভাবে পরীক্ষার ফল নিয়ে ভালো স্কুলগুলোতে পরীক্ষায় ভালো করা ছাত্র-ছাত্রীরা উথাল-পাতাল শুরু করে, দলবেঁধে হাতের দুই আঙুল তুলে 'ভি' অর্থাৎ ভিক্টোরি বা জয় চিহ্ন দেখায় এবং প্রচার মাধ্যম, বিশেষত সংবাদপত্রগুলোতে এ নিয়ে সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশের পাশাপাশি নানারকম আদিখ্যেতা করা হয় এর মধ্যে অশ্লীলতা আছে। এই অশ্লীলতা শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফল করবে এবং এই ফল লাভ করে তারা আনন্দিত হবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক বা উদ্ভট কিছু নেই। আগেকার দিনেও ভালো ফল পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী, স্কুলের শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটি এ নিয়ে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করত। তার ধরন অন্য রকম ছিল। এমন ছিল যার মধ্যে উদ্ভট বা অশ্লীল কিছু থাকত না। কিন্তু ২০০১ সালে নোতুন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পর থেকে পরীক্ষার ফল নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমদিকে ছোট আকারে হলেও অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাপক আকারে, এক নোতুন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বাঙলাদেশে এখন সব ক্ষেত্রেই আনন্দ প্রকাশের নামে ফূর্তির যে হৈচৈ দেখা যায় তার সঙ্গে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের এই উল্লাস সঙ্গতিপূর্ণ। এসবই ঘটে বাঙলাদেশের এক নোতুন সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যে।

এ সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজে সবকিছুর বাণিজ্যিকীকরণের ওতপ্রোত সম্পর্ক।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশে প্রথম থেকেই লুণ্ঠনজীবীরা অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায়ী শ্রেণীতে পরিণত হয়ে শুধু যে অর্থনৈতিক ও শাসনক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পুঁজির প্রাধান্য স্থাপন করেছে তাই নয়– শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, মানুষের পারস্পরিক আচরণ ইত্যাদির এমন বাণিজ্যিকীকরণ করেছে, যা ইতিপূর্বে কোন দিন দেখা যায়নি।

পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে এখন শুধু যে ছাত্র-ছাত্রীদেরই গ্রেডিং হচ্ছে তাই নয়, স্কুলগুলোরও গ্রেডিং করা করা হচ্ছে এবং এই গ্রেডিং পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। এ বছরও এই গ্রেডিং পদ্ধতির মধ্যে কিছু নোতুনত্ব চালু হয়েছে। যেভাবে এ কাজ করা হচ্ছে তাতে শিক্ষার উন্নতির থেকে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জোরদার হচ্ছে।

যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকা শহরে এবং তার বাইরে ভালো ফল করেছে, সেগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। একেবারে সরাসরি সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের মতো সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের থেকে বড় রকম তহবিল পায়। অন্যগুলো ছাত্রদের থেকে যে ফি আদায় করে সেটা বড় অংকের। এভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী অর্থ বেশী পায় অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে বড় অংকের ফি আদায় করে, সেগুলোই পরীক্ষায় ভালো ফল করে। পরীক্ষায় শুধু যারা সব থেকে ভালো করেছে সে তালিকাই নয়, কোন কোন স্কুল থেকে সব পরীক্ষার্থী পাস করেছে এবং কোন কোন স্কুল থেকে একজনও পাস করেনি, তারও তালিকা প্রকাশ করা হয়। দেখা যাবে, এই তারতম্য ঘটার মূলে আছে কোন স্কুলগুলোতে ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়ে ও বেশী বেতন দেয় এবং কোন কোন স্কুলে প্রধানত গরিব ছাত্ররা পড়ে এবং অল্প বেতন দেয়, অর্থাৎ কোন স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভালো না খারাপ তার ওপর। দেখা যাবে, যে স্কুলগুলো থেকে একজনও পাস করে না সেগুলোর আর্থিক অবস্থা খারাপ ও শিক্ষকদের মান নিম্ন, তাদের শিক্ষকতার যোগ্যতা সামান্য, ছাত্র-ছাত্রীরা গরিব।

যেসব স্কুল ভালো ফল করে তাদের প্রায় প্রত্যেকটিই বাণিজ্য সফল। বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই সেগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই বাণিজ্য শুধু স্কুল কর্তৃপক্ষই করে না, স্কুলের শিক্ষকরাও করে থাকেন। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষকদের নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন, অভিভাবকদের সচেতনতা, ছাত্রদের মনোযোগ– সর্বোপরি সুশৃঙ্খল পরিবেশই এই প্রতিষ্ঠানকে এ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। (যুগান্তর/১৬.৫ .১০)। অভিভাবকরা হঠাৎ করে সচেতন হওয়া এবং ছাত্ররা মনোযোগী হওয়ার কারণে স্কুলটি ভালো করেছে– এ বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। তবে অধ্যক্ষকে কি জিজ্ঞেস করা যায় যে, তার স্কুলের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে এমন একজনও কি আছে তার কলেজের কোন না কোন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে না বা তার কোচিং সেন্টারে

www.pathagar.com

যায় না? আসলে দেখা যাবে, যেসব স্কুল পরীক্ষায় ভালো করছে তার ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক টাকা খরচ করে প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে যাচ্ছে।

এর অর্থ কী? এর সরল অর্থ হলো, যেসব লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষায় ভালো করছে সেগুলোতে স্কুলের পড়াশোনা সন্তোষজনক নয়। এজন্য ছাত্রদের প্রাইভেট টিউটরদের কাছে পড়তে হচ্ছে, এমনকি একাধিক বিষয়ে কোচিংয়ের জন্য একাধিক শিক্ষকের কাছে যেতে হচ্ছে। এভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশকে মোটেই স্বাস্থ্যকর বলা যায় না। শুধু তাই নয়, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষায় যতো ভালো ফল করছে তার পরিবেশ তুলনায় ততই অস্বাস্থ্যকর।

নোতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রদের সংখ্যা বেড়েছে ১৬ হাজারের ওপর। এর মোট সংখ্যা ৮০ হাজারের ওপর। এ সংখ্যা বৃদ্ধিকে শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষার উন্নতি বলে বর্ণনা করেছেন। প্রধান মন্ত্রীও এই ফল দেখে মহাখুশি। কিন্তু শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলকেই, সে ফল যেভাবেই নির্ধারিত হোক, শিক্ষার মান উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে ধরা এক মারাত্মক ভুল। ভালো ফল অনেক কারণে হতে পারে। অনেক সময় ভাল ফল সরকারী নির্দেশেও হতে পারে। অতীতে দেখা গেছে, সরকার থেকে পাসের হার কম-বেশী করার জন্য অনেক সময় নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যে হিসেবে পাসের ফল দেখানো হয়েছে। গ্রেডিংয়ে কড়াকড়ি অথবা শৈথিল্যের কারণেও পরীক্ষায় ফলের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। কাজেই কত ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে, এটা দিয়ে কোন ছাত্র না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নির্ণয় করা ঠিক নয়, যেমন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন প্রফেসর আছেন, সেটা দিয়ে শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার মান নির্ণয় করাও সঠিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত, এমনকি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক শিক্ষকতা করেছেন। একমাত্র রমেশ চন্দ্র মজুমদার ছাড়া আর কেউ এখানে প্রফেসর হননি। সত্যেন বসু, যদুনাথ সরকার, ডক্টর শহীদুল্লাহ, জিসি দেব পর্যন্ত প্রফেসর ছিলেন না, তারা সবাই ছিলেন রিডার (এখনকার সহযোগী অধ্যাপক)। বর্তমানে ঢাকা এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রফেসরের ছাড়ছড়ি। এখন সরকারী চাকরির মতো সিনিয়ারিটি বা চাকরিতে জ্যেষ্ঠতার হিসেবেই পদোন্নতি হয়। কাজেই প্রফেসরের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম বেশী। এদের এই বেশী সংখ্যা ঢাকা অথবা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত হওয়ার প্রমাণ বলে যদি কেউ দাবি করেন, তাহলে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। কারণ প্রফেসরদের এই সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাণ্ডিত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা এবং ছাত্রদের শিক্ষার মানের সঙ্গে শুধু পরীক্ষার ফল নয়, সিলেবাস বা পাঠ্য তালিকার সম্পর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ। এদিক দিয়ে বিচার করলে বাঙলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার একেবারে বেহাল অবস্থা। কারণ এই পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী একশ'তে একশ' পেলেও ছাত্রদের শিক্ষা বিপজ্জনকভাবে অসম্পূর্ণ থাকে। এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তবে প্রসঙ্গত এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন হলো।

সাধারণভাবে বাঙলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা এখন রীতিমতো সংকটজনক। এ

www.pathagar.com

সংকট প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণী, শাসক দল ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের কোন উদ্বেগ নেই। কারণ তারা সবাই কোন না কোনভাবে দেশের জনগণের এ অবস্থার ফলভোগী। যারা খুব অবস্থাপন্ন তারা নিজেদের সন্তানদের অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ান অথবা তার জন্য বিদেশে পাঠান। শিক্ষাব্যবস্থার এই দুর্দশাকে আড়াল করার জন্য শাসক শ্রেণী অনেক ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকে, অনেকভাবে বিভ্রান্তির চেষ্টা সচেতনভাবে করে থাকে। জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দলবেঁধে 'ভি' চিহ্নিত দেখিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে প্ররোচিত করে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে এটিও এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই এক বিশেষ রূপ। এটা সাধারণ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রে এক অভিনব বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা।

সমকাল : ১৮.৫.২০১০ ১৭.৫.২০১০

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সান্ধ্যকালীন শিফট

কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সান্ধ্যাকালীন ক্লাস নেয়ার অর্থাৎ সান্ধ্য শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন আমি 'বিশ্ববিদ্যালয় না পাঠশালা?' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সান্ধ্য শিফটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও এর বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই প্রতিরোধের মুখে সান্ধ্য শিফট চালুর সিদ্ধান্ত বাতিল করে।

এ ঘটনার বেশকিছু আগে থেকে বাঙলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফটের দাবি জানিয়ে আসছিল। শিক্ষা সম্মেলন করে সেখানেও তারা এই দাবির সপক্ষে অনেক আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সত্যি সত্যি দুই শিফট চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তখন তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া দেখে তারা আর এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। তারা এতদিন উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফটের পক্ষে যে যুক্তি বিস্তার করেছিল, সে যুক্তির ফাঁকা চরিত্র ছাত্ররাই নিজেদের আন্দোলনের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে 'বিশ্ববিদ্যালয় না পাঠশালা' নামে যে প্রবন্ধ আমি লিখেছিলাম তাতে বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস লেকচার আসলে শিক্ষার মুখ্য পদ্ধতি নয়, যেমন সেটা পাঠশালা বা স্কুলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্লাস লেকচারের গুরুত্ব থাকলেও ছাত্রদের আসল কাজ করতে হয় লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরিতে। তাছাড়া যেখানে টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা আছে, সেখানে টিউটোরিয়ালের কাজ করে। এই টিউটোরিয়াল পেপার তৈরীর জন্য লাইব্রেরি কাজের কোন বিকল্প নেই। ঢাকাসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজকাল যত ছাত্র ভর্তি করা হয় তার জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই নেই। এর মধ্যে সব থেকে বেশী হৈচৈ হয় আবাসিক ব্যবস্থা নিয়ে। খাওয়ারও কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে ছাত্র-ছাত্রী বিশেষত ছাত্রীদের নিজেদের হোস্টেলের কামরায় নিজেদেরই রেঁধে খেতে হয়। এটা যে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই এক কেলেংকারি ব্যাপার। কারণ পড়তে এসে হোস্টেলে যদি ছাত্র-ছাত্রীদের রেঁধে খেতে হয় তাহলে অহেতুক পরিশ্রম ও ক্লান্তির বিষয় বাদ দিয়েও পড়াশোনার জন্য সময় কমে আসে। তা ছাড়া কামরাকে রান্নাঘর বানিয়ে রাখা এক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। কিন্তু এসব দিকে খেয়াল করা বা এসব সমস্যা সমাধানের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন আগ্রহ আছে এমন মনে হয় না।

এতো গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রসংখ্যার তুলনায় তাদের থাকা-খাওয়ার

www.pathagar.com

অব্যবস্থার কথা। কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা তাহলো ছাত্রসংখ্যার তুলনায় লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি সুবিধা অনেক কম। বইপত্র এবং যন্ত্রপাতির কমতি তো আছেই তার ওপর আছে স্থান সমস্যা। একসঙ্গে লাইব্রেরিতে বসে ছাত্রদের পড়াশোনা করার মতো জায়গার অভাব আছে। ল্যাবরেটরিতেও আছে প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব। এ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় শিফট করা হয়, তাহলে তার ফল কী দাঁড়াতে পারে, এটা অনুমান করা কঠিন নয়। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের একটি হাটে পরিণত হয়ে শিক্ষার পরিবর্তে হট্টগোলের রাজত্বই সেখানে কায়েম হওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'হাট' চরিত্র ইতিমধ্যেই দেখা যায় এবং হাটের হট্টগোল এখন এক নিয়মিত ব্যাপার।

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফটের চিন্তা করেন, এমনকি তা কার্যকর করতে নিযুক্ত হন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণার অভাব আছে। তারা মনে করেন লেকচারই হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল পদ্ধতি। কাজেই লেকচারে উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের বক্তৃতা শুনলেই ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা এগিয়ে যায়। তার জন্য অন্য বিশেষ কিছুর প্রয়োজন হয় না। এই চিন্তা যদি তাদের মধ্যে না থাকত তাহলে তারা অবশ্যই ভাবতেন লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির অবস্থার কথা, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ও ল্যাবরেটরি কাজের বাস্তব অবস্থার কথা।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। আজকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষক আছেন তাদের একটা বড় সংখ্যা বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। এ কাজ করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যথাযথভাবে মনোযোগ দেন না, সেখানে সময় দেন না এবং ক্লাস লেকচারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে নিয়মিত পড়াশোনাও করেন না। এর ফলে তাদের পক্ষে যতটুকু পাঠ ছাত্রদের দেয়া দরকার, সেটা দেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যদি সুসংগঠিত পাঠ ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকে তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে অতিরিক্ত অর্থের সন্ধানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দেন, তাহলে সেটা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে বাধ্য। সে ক্ষতি অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের এই দায়িত্বহীনতা রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। সন্দেহ হয়, এর কোন গুরুত্ববোধও তাদের মধ্যে নেই এবং তারা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতেও আগ্রহী নন। আজকের পত্রিকায় (ডেইলি স্টার, ২৪.৫.২০১০) দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে'র সান্ধ্যাকালীন মাস্টারসের প্রোগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রোগ্রাম বাতিলের দাবিতে ক্লাস বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'বাণিজ্যিক কোর্স' বন্ধের দাবিতে কার্জন হলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। তাদের কথা হলো, ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকের সংখ্যা কম, তার ওপর এই শিক্ষকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। এর ফলে তাদের পক্ষে in-course ও mid-term পরীক্ষা সময় মতো নেয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া তারা পরীক্ষা

www.pathagar.com

হয়ে যাওয়ার পর সময়মতো পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারেন না, কারণ খাতা দেখার সময় তাদের হয় না। এ অবস্থায় আবার সান্ধ্যাকালীন কোর্স চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার অবস্থা কী দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই পরিস্থিতিতে ছাত্ররা অবিলম্বে দ্বিতীয় শিফট সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, কয়েক দিন আগে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র রিপোর্টে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি ডিপার্টমেন্টে সান্ধ্যাকালীন দ্বিতীয় শিফট চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, কিছুদিন আগে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের অজুহাত দেখিয়ে বাণিজ্যিক কারণে দ্বিতীয় শিফট চালুর যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং যা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিরোধের মুখে বাতিল করা হয়েছিল, সেই বাণিজ্যিক প্রোগ্রাম এখন আবার গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে চালু করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কর্তৃক চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বাঙলাদেশে নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার বেহাল অবস্থা এক বাস্তব ব্যাপার। তার ওপর এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালু করে এগুলোকে পাঠশালা বানানোর যে ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষক, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সচেতন জনগণের প্রতিরোধ দরকার। এই প্রতিরোধের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালুর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিকীকরণকৃত শিক্ষাব্যবস্থার আরও শোচনীয় বাণিজ্যিকীকরণ যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে কার্যকরভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংস রোধ করা হবে এক অসম্ভব ব্যাপার।

সমকাল : ২৫.৫.২০১০ ২৪.৫.২০১০

www.pathagar.com

সমাজের ক্রমবর্ধমান অপরাধিকীকরণ এবং ইভটিজিং

পরিবেশ পরিবর্তন, খাদ্যে ভেজাল, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার জন্য যেমন অনেক নোতুন নোতুন শারীরিক ব্যাধির আবির্ভাব হচ্ছে, তেমনি সমাজদেহে অনেক ধরনের পরিবর্তনের কারণে মানুষের অভ্যাস-আচরণ-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এমন অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে যা নোতুন। একেবারে নোতুন না হলেও আগে যা কদাচিৎ দেখা যেত এখন তা দেখা যাচ্ছে প্রায়ই। শুধু তাই নয়, এ ধরনের অভ্যাস-আচরণ সব সমাজের জন্যই পরিণত হয়েছে এক বিপজ্জনক ব্যাপার। ইভটিজিং বা ছোকরাদের দ্বারা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, পড়ার অল্প বয়সী মেয়ে অথবা চলতি পথে যে কোন মেয়েকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি অশোভন ও আপত্তিকর আচরণের সংবাদ এখন পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচিত মেয়েদেরকে তাদের স্কুলের সহপাঠী অথবা পাড়ার ছেলে-ছোকরারা এমনভাবে প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করতে থাকে, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে। এমনভাবে এসব আত্মহত্যার খবর সংবাদপত্রে পাওয়া যাচ্ছে, যা থেকে মনে হয় আত্মহত্যা অতি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন সমাজে যখন অস্বাভাবিক ব্যাপার স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয় অথবা মনে হয় স্বাভাবিক ব্যাপারের মতোই তখন সেই সমাজ নিজেই যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, ব্যাধিতে আক্রান্ত, অসুস্থ, এতে সন্দেহ নেই। বাঙলাদেশে ইভটিজিং নামে যা ঘটছে সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটা যতো ব্যাপকভাবে এখন ঘটছে তা শুধু একেকটি জনবিচ্ছিন্ন অপরাধীর কাজ নয়। এটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হওয়াতেই এ রকমটি ঘটছে।

ইভটিজিং স্পষ্টতই এক ধরনের অপরাধ। যে কোন অপরাধেরই একটা সামাজিক চরিত্র থাকে। কারণ অপরাধ সব সময়ই সমাজে অন্য কোন না কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এর দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাঙলাদেশে এখন এই অপরাধ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সহকর্মী পুরুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত নারী শিক্ষককে উত্যক্ত করছে। শুধু তাই নয়, এ অবস্থার অবনতি এমন পর্যয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত কোন কোন জায়গায় তাদের শিক্ষয়িত্রীর প্রতি অশোভন আচরণ করছে, তাদের রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করছে। আগেকার দিনে, এমনকি কিছুদিন আগেও যা ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার, এখন তা শুধু চিন্তনীয়ই নয় সম্ভবত ঘটছে এবং সংবাদপত্রে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে শুধু যে সামাজিক অসদাচরণের দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাই নয়, সব শিক্ষাব্যবস্থা আজ কী ধরনের মারাত্মক ও বিপজ্জনক ভাঙনের মুখে পতিত হয়েছে তার পরিচয়ও এর মধ্যে আছে।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশে নব্বইয়ের দশক থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম দেখা যায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্ররা ছাত্রীদেরকে ক্যাম্পাসের মধ্যে চলাচলের সময় উত্যক্ত করছে। এমনকি ছাত্রদের দ্বারা ছাত্রী ধর্ষণের রিপোর্টও সেই সময় প্রকাশিত হয়। এটা ছাত্র দল ও ছাত্র লীগ দুই দলের কর্মীদের দ্বারাই হয়েছে। ১৯৯৬ সালের পর ছাত্র লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। দুই একজন ছাত্র লীগ নেতার বিরুদ্ধে তখন শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেয়া হয়। এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে ছাত্ররা শুধু যে ছাত্রীদের উত্যক্ত করছে তাই নয়, নারী শিক্ষকদের পর্যন্ত উত্যক্ত করছে। পুরুষ শিক্ষক নারী সহকর্মীকে উত্যক্ত করছে। এর বিরুদ্ধে সেখানে মিছিল হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষকদের পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে। এগুলো সত্যিই অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু এটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙলাদেশের সামাজিক পরিবেশের এমন এক দিক যা অগ্রাহ্য করার অথবা সে বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকার উপায় নেই। কারণ, এটা শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারই নয়। বাঙলাদেশের চারদিকে এখন এ ধরনের অপরাধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, গার্মেন্টের মতো শিল্প-কারখানা, এমনকি সাধারণভাবে লোকালয়ে পর্যন্ত যেভাবে ইভটিজিং থেকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে সমাজে মানবিক মূল্যবোধ বলে যা কিছু আছে তার ধ্বংসের শর্তই এর মধ্যে তৈরী হচ্ছে।

একে কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় মনে করলে সেটা হবে এক মস্ত ভুল। কারণ, এ ধরনের সমস্যা যখন কোন সমাজে দেখা দেয় তখন সেটা সমাজের অন্যান্য সমস্যা ও দিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না। মানবদেহ যেমন এক অখণ্ড সত্তা, সমাজও তেমনি এক অখণ্ড সত্তা। তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা বা বিচার করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির দেহে কোন রোগ দেখা দিলে যেমন সারা দেহই তা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তেমনি সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটলে তার প্রভাব গোটা সমাজের উপরই পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজে যে সামগ্রিক অবস্থা বিরাজ করে তার সঙ্গে সমাজের সবকিছুই সম্পর্কিত থাকে। এখানে ইভটিজিং নামে যে সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হচ্ছে একেও সমাজ থেকে, সমাজের সামগ্রিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ও বিচার করা যায় না। এর প্রতিকারের জন্যও কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

বাঙলাদেশে এখন সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা চলে, সমাজের মধ্যে অপরাধিকীকরণের যে বিস্তার ঘটেছে তা থেকে ইভটিজিং এবং বর্ধিত হারে ধর্ষণের ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভের পর থেকে এ অঞ্চলে সমাজের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি যেভাবে ঘটেছে, যেভাবে এটা এক মারাত্মক ও বিপজ্জনক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তার সঙ্গে অল্পবয়সীদের এই চরিত্র বিকৃতি, এই অপরাধপ্রবণতা ঘনিষ্ঠ সূত্রে সম্পর্কিত। সমধারণভাবে সমাজের ভাঙন, শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙন, যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতো শিক্ষিত

www.pathagar.com

এবং সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যেও এই অপরাধপ্রবণতার দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

এ থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে, ইভটিজিং-এর মতো অপরাধ বন্ধের জন্য শুধু তার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পদক্ষেপের চেষ্টা করলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যদিও এই পদক্ষেপের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আসলে বাঙলাদেশের সমাজ এখন এমন ভাঙনের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে এই সমাজের কোন সংস্কার সম্ভব নয়। কোন সংস্কারের মাধ্যমে এখানে কোন ক্ষেত্রেই কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়। আজ তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ সমাজকে আমূলভাবে পরিবর্তন করার, বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন এবং অন্য এক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করার। এই কর্তব্য জনগণকেই সম্পাদন করতে হবে। এর জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক অপরিহার্য প্রয়োজন। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চিন্তা ও কাজ বাদ দিয়ে সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

যায়যায়দিন : ৬.৬.২০১০ ৩১.৫.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে

৩১ মে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বাঙলাদেশে ইতিপূর্বে শিক্ষা কমিশন ইত্যাদি গঠন করা হলেও এই প্রথম কোন সরকার কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটিও ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে।

এই শিক্ষানীতি বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের মন্তব্যও এরপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তারা সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষানীতিকে ইতিবাচক বলে বর্ণনা করে এর বাস্তবায়নের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই বিশাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আর্থিক এবং অবকাঠামোগত নানা সমস্যার কারণে সম্ভব হওয়ার বিষয়ে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জামান আহমদ বলেছেন, এ নীতি বাস্তবায়নে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার যোগান পেতে অসুবিধা হবে না, যদি সরকার তার প্রতিশ্রুতি মতো শিক্ষা খাতে জিডিপি'র সাড়ে ৬ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ দেয়। এমনকি যদি ৪ শতাংশও দেয় তাতেও কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে।

১০ জুন পেশকৃত ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট অবশ্য জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়নি। এই নীতি বাস্তবায়ন কতখানি ও কিভাবে হবে এ আলোচনা ছাড়াও এই নীতির কয়েকটি দিক নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে প্রায় প্রতিটি সরকারই এক একটি শিক্ষা কমিশন ঘোষণা করলেও তার কোনটির সুপারিশই আজ পর্যন্ত কার্যকর বা বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে তা অবৈতনিক করাও সরকারের দিক থেকে বাধ্যতামূলক। মনে রাখা দরকার যে, বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে আগেকার বেতন, ফি ইত্যাদি বকেয়া ধরে পরে আদায় করা হয়েছিল।

কোন একটা নীতি রাতারাতি ঘোষণা করলেও তা কার্যকর কিভাবে হবে তার কোন হিসাব সাধারণত সরকারের থাকে না। কাজেই নীতি ঘোষণার পর তা বাস্তবায়ন নিয়ে যে সমস্যা হয় তার পরিণতিতে নীতিই পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করে তাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা খুবই প্রশংসনীয়

www.pathagar.com

কাজ। কিন্তু এই নীতির ঘোষণা কতখানি বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করে এবং কতখানি দলীয় প্রচারণার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে– সেটাই দেখার বিষয়। কারণ এ ধরনের সরকার কোন কাজ করার চেয়ে সেই কাজের কথা বলে আত্মপ্রচার ও নিজের মহিমা কীর্তনের জন্যই সবকিছু করে থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ে শিক্ষাকে বিশেষায়িত করার কথাও আছে। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী একটি অভিন্ন পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করলেও নবম শ্রেণীতেই তাকে নির্ধারণ করতে হবে কোন ক্ষেত্রে সে বিশেষভাবে পড়াশোনা করতে চায়। কাজেই এ পর্যায়েই তাকে বিজ্ঞান, কমার্স, মানবিক ইত্যাদি গ্রুপের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। শিক্ষাকে এভাবে নিম্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত করার নীতি দীর্ঘদিন ধরে বাঙলাদেশে প্রচলিত আছে এবং শিক্ষা কমিশনও সেই নীতিই বহাল রেখেছে। আগে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল অভিন্ন পাঠ্য তালিকা। ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর কলেজ পর্যায়ে উঠে ছাত্ররা বিজ্ঞান, কলা, কমার্স ইত্যাদি গ্রুপে বিভক্ত হতো। বর্তমানে সেই বিভক্তি নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি করা হচ্ছে। কারণ একজন ছাত্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে পড়াশোনা করবে অর্থাৎ নিজের বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্র নির্বাচন করবে, সেটা বুঝে উঠতে সময় লাগে, এ জন্য তার শিক্ষার প্রাথমিক ভূমি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। এ জন্য অন্তত দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্য অনুযায়ী তার পাঠ নেয়া দরকার। এ বিষয়টির গুরুত্ব মাননীয় শিক্ষা কমিশন সদস্যরা অর্থাৎ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদরা বিশেষ বোধ করেন বলে মনে হয় না। কারণ অষ্টম শ্রেণীর পর বিশেষায়ণের এই নীতির বিরোধিতা করে কারও কোন মতামত আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। বর্তমান শিক্ষা কমিশনও সেই অভিন্ন নীতি বহাল রেখেছে এবং তা নিয়ে কোন শিক্ষাবিদেরই কোন উচ্চবাচ্য নেই। কাজেই কাঁচা বয়সে এবং শিক্ষার ভূমি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত তৈরী না হওয়ার আগেই এভাবে ছাত্রদের গ্রুপে বিভক্ত করার পর দুই ধরনের ক্ষতি হয়। প্রথমত, তাদের সাধারণ শিক্ষা যতদূর ও যত বিষয়ে হওয়া দরকার, সেটা হয় না। দ্বিতীয়, নিজেদের বিশেষ বিষয় নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল করে বসায় পরবর্তী শিক্ষাজীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের তার খেসারত দিতে হয়।

শিক্ষা কমিশন ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষাদানের কথা বলেছে। শিক্ষাবিদরা তাদের নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার পার্থক্য এই যে, তা বক্তৃতা দিয়ে বা পাঠ্যপুস্তকে তার ওপর আলোচনা দিয়ে কোন কাজ হয় না। নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন দৃষ্টান্ত। যারা নৈতিক শিক্ষার কথা বলছেন, তারা যদি নানা ধরনের অনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে নিজেরা জড়িত থাকেন তাহলে অন্যদের নৈতিক শিক্ষার কথা বললে তার দ্বারা ফল লাভ হয় না, হতে পারে না। কাজেই 'সদা সত্য কথা বলিবে'র মতো উপদেশ বাণী পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে নিজেরা মিথ্যার সাগরে নৌকো ভাসিয়ে চললে তার দ্বারা অন্যদের নৈতিক উন্নতি হয় না। উপরন্তু সমাজে এই ধরনের অনৈতিক আচরণের গ্রাহ্যতা ও সার্বজনীনতা দেখে অনৈতিক কাজের প্রতিই

www.pathagar.com

তাদের ঝোক বাড়ে। বাঙলাদেশে এটাই হয়েছে এবং এ কারণেই মনে করা হচ্ছে যে, পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বাণী বিস্তার করে এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু এদিক দিয়ে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক এর পরিবর্তন শিক্ষা কমিশন যেভাবে সম্ভব মনে করেছে, সেভাবে সম্ভব নয়।

শিক্ষা কমিশনের সুপরিশে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি ও বাঙলাদেশ স্টাডিজ শিক্ষার অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হবে। এখানে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন আগে বাঙলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস বিষয়কে পাঠ্যতালিকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণভাবে জনগণের সঙ্গে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের কোন পরিচয় নেই। তারা কিছুই জানে না। একটা জাতির জন্য এর থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এটা প্রত্যেকটি সরকার নিজেদের হীন দলীয় প্রচারণা এবং দলীয় নেতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই করে এসেছে। বর্তমান শিক্ষা কমিশনও সেটাই বহাল রেখেছে। তাদের সুপারিশেও ইতিহাস পাঠের কোন ব্যবস্থা নেই।

বাঙলাদেশ স্টাডিজ নামে যে বিষয়টি রাখা হয়েছে তাতে আমাদের দেশের প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালে ইতিহাস বলে কিছু নেই। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আছে অনেক সাজানো কথা, যেগুলো একেকটি দল ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের প্রয়োজন মতো সাজিয়ে দেয়। এসব মিথ্যা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন শিক্ষা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য।

যুগান্তর : ১৩.৬.২০১০ ১২.৬.২০১০

www.pathagar.com

সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে

বাঙলাদেশে এখন যে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে তাই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, তার চিত্র ও চরিত্র ভয়াবহ। এটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অর্থনীতি ও রাজনীতি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। উপরন্তু সমাজ সম্পর্ক যেভাবে বিন্যস্ত থাকে তার প্রতিফলনই ঘটে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে।

সমাজে যত প্রকার বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এখন দেখা যাচ্ছে, তার সবকিছুর ওপর আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কাজেই শুধু এর একটি দিক পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়েই এখানে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

অনেক দিন থেকেই বাঙলাদেশে পারিবারিক জীবনে ভাঙন ও বিশৃঙ্খলার দেখা এমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে যা আগে কল্পনাও করা যেত না। এটা সামান্য কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গেলে এত বেশী বিপজ্জনক হতো না। কিন্তু ক্রমেই এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া পারিবারিক ক্ষেত্রে ক্রাইম বা অপরাধ এমনভাবে ঘটছে যার একটি দৃষ্টান্তই দেশের পরিস্থিতি কত ভয়াবহ তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সংবাদপত্রে প্রতিদিনই দেখা যায় পরিবারে যেখানে পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার কোমল সম্পর্ক থাকার কথা, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে অন্যের প্রতি নিজের পিতামাতা ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী এমনকি সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের নানা ঘটনার রিপোর্ট। এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনা সমাজে একটা ঘটলেই যেখানে আতঙ্কের ব্যাপার হয়, সেখানে এটা বাঙলাদেশে এখন পরিণত হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে। তাছাড়া এসব ঘটনার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিক দিয়ে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে তফাৎ নেই।

গত কয়েক দিন ধরে অন্যান্য পারিবারিক হত্যাকাণ্ড ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দুটি ঘটনার বিষয় বেশ বড় আকারে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। এটি হলো, মা'সহ দুই নাবালক সন্তানের মৃত্যু। অন্যটি হলো মা ও তার প্রেমিকের হাতে ছয় বছরের একটি ছেলের মৃত্যু। দ্বিতীয় ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তার নিষ্ঠুরতার সীমা নেই।

প্রথম ঘটনাটি আপাত দৃষ্টিতে আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত হিসেবে রিপোর্ট করা হলেও পরবর্তী অন্যান্য রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে এটা হত্যার ব্যাপার হতে পারে। হতে পারে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়ার ব্যাপারে, বাস্তবত হত্যাকাণ্ডের শামিল। এ ব্যাপারের সঙ্গে যে পরিবারটির সবাই অল্পবিস্তর সম্পর্কিত, এটা সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে দেখা যায়। দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত একজন সিনিয়র সাংবাদিকের পরিবারেই এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি তার স্ত্রী, তার ছেলে ও মেয়েজামাইরা পর্যন্ত এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যদিও

www.pathagar.com

তাদের সবার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে এক রকম না হওয়ার কথা। স্ত্রী ও নিজের দুই সন্তানকে পরিত্যাগ করে অন্য এক আত্মীয়কে বিয়ে করা এবং তার থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিই উপরোক্ত তিনজনের মৃত্যুর কারণ। দেখা যাচ্ছে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এক নারী ও তার দুই নাবালক সন্তানের সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে, তার সমর্থন তাদের পুরো পরিবারেই আছে। এটা স্বাভাবিক আচরণ নয় এবং সমাজে কীভাবে বিশৃঙ্খলা-অনৈতিকতা ও অপরাধপ্রবণতার বৃদ্ধি ঘটেছে, এটা তারই উদাহরণ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি রীতিমতো ভয়াবহ। মা তার প্রেমিকের সঙ্গে থাকা অবস্থায় সেটা দেখে ফেলার পর তারা দু'জনে মিলে ছয় বছরের ছেলেটিকে খুন করে লাশ দু'দিন ফ্রিজের মধ্যে ভরে রেখে পরে বস্তায় পুরে বাইরে ফেলে দিয়েছে। অপরাধের দৃষ্টান্ত এর থেকে ভয়াবহ আর কী হতে পারে? কিন্তু শুধু এ দুটিই নয়, এরকম ঘটনা দেশজুড়ে এখন প্রতিদিনই সর্বত্র ঘটছে। শুধু তাই নয়, ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বস্তরেই এটা ঘটছে। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে সমাজে ভাঙন এখন সুদূরবিস্তৃত। এই ভাঙনের ফলে পারিবারিক জীবনের সাধারণ মূল্যবোধ ও পারস্পরিক কোমল সম্পর্ক হীন ব্যক্তিগত স্বার্থের ধাক্কায় চুরমার হচ্ছে। এই ব্যক্তিগত স্বার্থ এমন যা একান্তভাবে একজনের নিজেরই। পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন এই স্বার্থের গণ্ডি বহির্ভূত। এটা না হলে পিতার হাতে পুত্র, পুত্রের হাতে পিতা, ভাইয়ের হাতে ভাই, স্বামীর হাতে স্ত্রী, স্ত্রীর হাতে স্বামী, এমনকি পিতামাতার হাতে কোমলমতি সন্তানের খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্ভব হতো না।

কিন্তু এসবই বাঙলাদেশে এখন সম্ভব হচ্ছে। তবু সম্ভব হচ্ছে তাই নয়, এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ অপরাধের বিস্তার ঘটছে। এদিক দিয়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের দিকে পেছন ফিরে তাকালে তাকে স্বর্ণযুগই মনে হবে।

একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেন ও কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটল এটা গুরুতর চিন্তাভাবনার বিষয়। কিন্তু এ চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন বোধ বলেও কিছু নেই। না থাকার কারণ, এটা তো ধরেই নেয়া হয়েছে যে, এসবই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার কারণে! ধর্মীয় মৌলবাদ বিস্তারের কারণে! পাকিস্তানের চক্রান্তের কারণে! কাজেই এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দরকার সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও পাকিস্তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এ সংগ্রামেই এখন বাঙলাদেশে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক শক্তি, পাকিস্তান বিরোধী জাতীয় শক্তির প্রতিভূ রাজনৈতিক লোকজন এবং তাদের বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিরা চালিয়ে চাচ্ছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই সংগ্রাম তারা যতই করছেন ততই দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং অপরাধপ্রবণতা আতঙ্কজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদও এর দ্বারা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না। উপরন্তু ধর্মের নামে অপরাধের দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব সত্ত্বেও এদিক দৃষ্টিপাতের কোন ব্যাপার এ দেশের শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের নেই। সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, স্বাধীনতা

www.pathagar.com

আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়েছিল, পাকিস্তানী শাসন এ দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে স্বাধীন বাঙলাদেশ রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল। এরপর এ দেশের শাসক শ্রেণীর সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ এ প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করে না যে, কেন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মৌলবাদবিরোধী ও পাকিস্তান বিরোধীরা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও দেশে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার শুধু সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় দলগুলোই করছে না, তারা নিজেরাও অবস্থা বিশেষে করছে। কেন স্বাধীন বাঙলাদেশে বাঙালিদের শাসনে এ দেশে অপরাধ সর্বক্ষেত্রে এভাবে ব্যাপক আকার ধারণ করে সুস্থ এবং সুখী-সমাজ জীবনের পরিবর্তে জনজীবনকে গভীরভাবে বিপর্যস্ত করছে।

এসব কেন হচ্ছে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন যে আছে এবং এ চিন্তা-ভাবনা স্থগিত রেখে যে অপরাধপ্রবণতা কমিয়ে আনা ও সমাজকে সুস্থ রাখা যায় না, এ বিষয়ে শাসক শ্রেণীর লোকজনের উপলব্ধির অভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রয়োজন আছে। কারণ এ চিন্তা ছাড়া কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তনের কোন আন্দোলন সম্ভব নয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন সুযোগ এখানে নেই। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের দিকে তাকালে এ চিন্তার খেই যে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাজে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রতিফলন দেখা যায় লুটতরাজ, চুরি-দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, ভূমিদস্যুতা, রাজনৈতিক ক্ষমতার চরম অপব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে। এ প্রক্রিয়া কীভাবে ও কেন এদেশে ১৯৭২ সাল থেকে জারী হলো তার বাস্তব বিশ্লেষণ করলে অনেক কিছুই পাওয়া যাবে। আপাতত তার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন এ জন্য যে, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এ প্রক্রিয়া এবং এই পরিবর্তনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার হাত ধরেই যে উপরোক্ত সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং মূল্যবোধের ধ্বংস সাধিত হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সমকাল : ২৯.০৬.২০১০ ২৮.৬.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংকটজনক পরিবেশ পরিস্থিতি

খুন-খারাবি, দুর্নীতি, ভূমিদস্যুতা ইত্যাদির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ওপর প্রতিদিনই সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর থেকেই বোঝা যায় সারাদেশের সাধারণ পরিস্থিতি কতখানি দুর্যোগপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এখন এ বহুমুখী বিশৃঙ্খলার দিকে তাকিয়ে যদি এসবকে কেউ বাঙলাদেশীদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন মনে করেন, তাহলে তাকে দোষ দেয়ার উপায় নেই। বাঙলাদেশের জনগণ এখন বিশ্বের অন্য কোন দেশ থেকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী এবং সাংস্কৃতিক মানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর– এটি বলা মুশকিল। সামগ্রিকভাবে দেখলে এসব গুরুতর সামাজিক ব্যাধিমুক্ত মানুষের উপস্থিতি বাঙলাদেশে থাকলেও সাধারণভাবে বাঙলাদেশের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করতে গেলে অন্য কোনভাবে কিছু করা সম্ভব নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এ বিশৃঙ্খলাকে দেশের সাধারণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখা যায় না এ কারণে যে, সমাজের কোন অংশই অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা ঘটছে তার সঙ্গে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে ঘটতে থাকা ঘটনার যে মিল দেখা যায় তার থেকে এ বিষয়টি বোঝা খুব সহজ ব্যাপার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এ পর্যায়েই বিদ্যাচর্চা সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়ে থাকে। অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র ও শিক্ষক মিলিতভাবে গড়ে তোলে শিক্ষার পরিবেশ। কাজেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিবেচনাবোধ এবং সে সঙ্গে শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার মান– সবকিছুই নির্ভর করে উভয়ের ওপর। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর।

এদিক দিয়ে আগেকার অবস্থার সঙ্গে এখানকার অবস্থার তুলনা করতে গেলে প্রথমেই যা লক্ষ্য করা যায় তাহলো ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। আগে ছাত্ররা শিক্ষকদের তাদের বিদ্যার গুণ এবং আচার-আচরণের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। শিক্ষকরা নিজেদের বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছাত্রদের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে শিক্ষা প্রদান করতেন। কাজেই ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা ও স্নেহের। এদিক থেকে বর্তমান পরিস্থিতির আকাশ-পাতাল তফাৎ। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে এমন ছাত্র এখন হাতেগোনা। আবার ছাত্রদের স্নেহের সঙ্গে ও সৎভাবে শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত এমন শিক্ষকের সংখ্যাও একেবারে হাতেগোনা। এ অবস্থা শুধু

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নয়, স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একই রকম। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে প্রাইভেট টিউশনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কনসালট্যান্সি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত আয়ের জন্য নিযুক্ত থাকা ও নিজেদের নির্ধারিত কর্তব্য অবহেলার কারণে বিদ্যাচর্চার পরিবর্তে বিদ্যা ব্যবসার প্রাধান্য এতো বেশী যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পরিবর্তে ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রদান নয়, নিজেদের পকেট ভর্তিই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষকের প্রধান কর্ম। বিদ্যাচর্চার পরিবর্তে শিক্ষকদের পকেটচর্চার এ পরিবেশ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং তাদের চরিত্রেরও অবনতি ঘটাবে– এটিই স্বাভাবিক।

তবে সাধারণভাবে বাঙলাদেশে ছাত্রদের চরিত্রের যে অবনতি হয়েছে, তার জন্য শিক্ষকদের এ কার্যকলাপই শুধু দায়ী নয়, যদিও এর ভূমিকা এক্ষেত্রে বড় রকম। দেশের সর্বক্ষেত্রে নানা ধরনের যে অপরাধপ্রবণতা আজ দেখা যায় তার প্রভাবও ছাত্রদের ওপর যথেষ্ট। পকেটচর্চা যেভাবে এখন মহামারী আকার হচ্ছে ছাত্রসমাজও তার দ্বারা আক্রান্ত। কাজেই আগে যেখানে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অর্থ রোজগারের ধান্ধায় থাকত না, এখন সেখানে এ ধরনের ধান্ধাবাজি ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা এক্ষেত্রে যেসব কীর্তিকলাপ করে তা সবারই জানা। শাসক শ্রেণীর গোটা অংশই এখন দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে, সে দলই তখন দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি করে নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও পকেট ভর্তি করে। এসব দলের ও তাদের নেতানেত্রীদের নীতি-আদর্শ বলে কিছুই নেই। দুর্নীতির অনুশীলনই তাদের মূল কাজ। এর প্রভাব যে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর পড়বে, তারাও যে এ একইভাবে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মাঠে নামবে– এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। উপরন্তু এটিই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিক ব্যাপারটি আজ বাঙলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষত বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে দেখা যাচ্ছে। চরিত্র বিনষ্ট হতে থাকলে যা হয় তার সবকিছুই এখন ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে; যার সব থেকে নিকৃষ্ট রূপ হলো ছাত্র, এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়ন অথবা নিপীড়নের চেষ্টা।

২০০৮ সালের নির্বাচনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র দলকে হলগুলো থেকে তাড়িয়ে সেগুলো দখল করেছিল। এ একইভাবে ইতিপূর্বে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনটি আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনকে হলগুলো থেকে বিতাড়িত করেছিল। এদিক থেকে পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। কাজেই ২০০৮ সালের শেষ থেকে ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তিবাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে যেভাবে লুটতরাজ করে নিজেদের পকেট ভর্তি করে চলেছে, এর কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত এদেশে ছাত্রদের ইতিহাসে নেই। এ প্রক্রিয়ার অবনতি হতে হতে অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যাতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ভর্তিবাণিজ্য ইত্যাদির ভাগ নিয়ে ছাত্র লীগের মধ্যে দলাদলি, এমনকি খুন-খারাবি পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এক

www.pathagar.com

দৈনন্দিন ব্যাপার। প্রত্যেক দিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলেই ছাত্র লীগের এ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের খবর পাওয়া যায়।

এ রকমই এক খবর এখন পাওয়া গেল। ইতিপূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের জের ধরে কয়েক ছাত্রকে একটি আবাসিক হলের তিনতলা থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল তাদের প্রতিপক্ষ গ্রুপের ছাত্ররা। মারাত্মকভাবে আহত সেই ছাত্ররা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটেছে সেই একই ব্যাপার। ১৫ আগস্ট উপলক্ষে হোস্টেলে ইফতারের বিশেষ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ছাত্র লীগের সভাপতি ও সম্পাদকের পৃথক গ্রুপভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের এক পর্যায়ে একটি ছাত্রকে দোতলা থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলা হয়েছে। তাকে এখন মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকার এক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজ যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, একটি দেশের জনগণের জীবন ও ভবিষ্যতের জন্য এর থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার আর কী হতে পারে? পকেটচর্চা বিদ্যাচর্চাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপরাধপ্রবণতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি যে শুধু শিক্ষা পাচ্ছে এটি যে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তাই বিপন্ন করছে তাই নয়, দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ যে গভীর ও ব্যাপক সংকট দেখা যাচ্ছে তার মূলও এ পরিস্থিতির মধ্যেই প্রোথিত।

সমকাল : ১৭.৮.২০১০ ১৬.৮.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষা ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি দিক

বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন দিক থেকেই আলোর ইশারা পর্যন্ত নেই। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একই সমস্যা, যদিও প্রত্যেক স্তরে সমস্যার মধ্যে কিছু ভিন্নতা আছে। স্তর বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ ভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এটা সাধারণভাবে বলা যায়, বাঙলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং আজও হচ্ছে, তাতে কোনভাবে পরীক্ষা পাস করে এক ধরনের নিম্নমানের বিদ্যালয় হলেও শিক্ষা অর্জন বলতে যা বুঝায় তার বিশেষ কিছুই হয় না।

বাঙলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোর বিপুল অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। এ স্কুলগুলোয় ঘরবাড়ি, ক্লাসরুম, দক্ষ শিক্ষক, ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ এমন যাতে স্বল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে তেমন আগ্রহী হয় না। এসব স্কুলে গরিবের সংখ্যাই অনেক বেশী। তাদের পরিবার নিজেদের সন্তানকে স্কুলে পাঠানো থেকে মাঠে বা অন্য কোথাও কাজে লাগাতে চায়। দুপুরে খাবার কিছু ব্যবস্থা থাকলে এ ছাত্রদের অনেককে আটকে রাখা যায়। কিন্তু নামমাত্র এ ব্যবস্থা অনেক জায়গায় থাকলেও তা ঠিকমতো হয় না। প্রাথমিক শিক্ষকদের যে বেতন দেয়া হয় এ বেতনে তাদের পক্ষেও নিজেদের স্কুলের কাজ শান্তির সঙ্গে করা সম্ভব হয় না– সাংসারিক চিন্তায়। তাদের অনেককেই ব্যস্ত থাকতে হয় অন্য কাজে। এর ফলে তারা ছাত্রদের ঠিকমতো পাঠ দিতে পারেন না। ক্লাসে তারা নিয়মিতভাবেই প্রায় অনুপস্থিত থাকেন। এসবের কারণে দেখা যায় প্রাথমিক স্কুলে যে ছাত্ররা ভর্তি হয় তার একটা বড় অংশ স্কুল বাদ দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। এভাবে স্কুল থেকে বের হয়ে তারা দেশে অশিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

যারা মাধ্যমিক স্তরে স্কুলে পড়াশোনা করে, তাদের অবস্থাও ভলো নয়। এ স্কুলগুলোতেও অনেক জায়গায় গৃহ সমস্যা, বইপত্রের সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, পাঠ্য তালিকার সমস্যা একত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যাতে একজন ছাত্র মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যতটুকু শিক্ষা লাভ দরকার, সেটা করে না। শহরাঞ্চলের প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুলগুলোর অবস্থা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো। এ স্কুলগুলোয় ক্লাসরুম মোটামুটি ভালো, বইপত্র পাওয়ার সুযোগ ছাত্রদের বেশী। শিক্ষকদের মান তুলনামূলকভাবে ভালো। কিন্তু সিলেবাস বা পাঠ্য তালিকার নিম্নমান পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন সংকটজনক করে রেখেছে যাতে অন্য দিক দিয়ে এসব স্কুলের অবস্থান কিছুটা ভালো হলেও শিক্ষার গুণগত মানের দিক দিয়ে শহরের সাধারণ স্কুল ও গ্রামের স্কুলগুলোর মধ্যে বড় রকম পার্থক্য দেখা যায় না। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের অবস্থা ভালো। এগুলোয় অবস্থাপন্ন লোকদের সন্তানরা

www.pathagar.com

পড়ে। এগুলোয় শিক্ষকদের মান তুলনায় উন্নত, তাদের পাঠদান নিয়মিত, বইপত্র ইত্যাদির অভাব নেই। এছাড়া আছে শহরে কিছু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। এগুলোয় ছাত্রদের বেতন খুব বেশী। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এগুলোয় পড়ে। এই স্কুলগুলোর শিক্ষকদের মান তুলনায় ভালো। শিক্ষাদানও হয় নিয়মিত। এসব সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার সারাদেশের স্কুলগুলোর মধ্যে ভালো ফল করে এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-ছাত্ররা ও-লেভেল, এ-লেভেল পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা লাভ করে।

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায়, কিছুসংখ্যক স্কুল থেকে একটি ছাত্রও পাস করে না। আবার অন্যকিছু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত খুব ভালো ফল করে। এর মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য খুব স্পষ্ট। যে স্কুলগুলো থেকে কোন ছাত্র পাস করে না, সেগুলো গ্রামাঞ্চলের গরিব স্কুল। যে স্কুলগুলোয় প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীই ভালো ফল করে, সেগুলোর অবস্থা ভালো এবং বড়লোকদের সন্তানরাই সেগুলোয় পড়ে। এ পরিস্থিতির ফাঁক দিয়ে সারাদেশে কোন কোন গরিবের ছেলেমেয়ে ভালো ফল করে। এভাবে ভালো ফল করা গরিব ছাত্র–ছাত্রীদের ছবি সংবাদপত্রগুলো ছাপিয়ে তাদের অনেক প্রশংসা করে। এর কারণ এভাবে গরিব স্কুল থেকে গরিব ছাত্রদের ভালো ফল করা সাধারণ নয়, ব্যতিক্রমী ব্যাপার। ভালো ফল সাধারণত করে সম্পন্ন ও ধনিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা। ভালো ফল করা গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সংবাদপত্রে যে প্রচারণা হয় তার মধ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থার চরম শ্রেণীবৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যদিও অধিকাংশ লোক বিষয়টিকে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, গ্রাম বা শহর এলাকা অথবা গরিব বা ধনী পরিবার যেখানে যত ছাত্র-ছাত্রী আছে তারা যেভাবে শিক্ষা লাভ করে তাতে শিক্ষা বলতে শুধু পাঠ্যবইয়ের চর্চাই বোঝায়। পাঠ্যবইয়ের বাইরে যে পড়াশোনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে, এটা বাঙলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে কোথাও দেখা যায় না। এমন ছাত্র এখন খুব সামান্য সংখ্যকই পাওয়া যাবে যারা নিজেদের পাঠ্য তলিকার বাইরে কোন বই পড়ে। অথচ আগেকার দিনে এরকম ছিল না। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের বাইরে নানা বিষয়ের বই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই পড়ত। সেসব বইয়ের মধ্যে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয়ের বইই থাকত। আজকাল এ পাঠ্যতালিকাভুক্ত বইয়ের বাইরে বই পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এতই নগণ্য যে উল্লেখ করার মতো নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এটা যে একটা ক্ষতিকর ব্যাপার এতে সন্দেহ নেই।

এ পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্যণীয় কারণ হলো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরে পাঠ্য তালিকায় এতো বেশী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা আছে এবং সেগুলোর জন্য এতো সময় ছাত্রদের দিতে হয় এরপর তাদের অন্যকিছু পড়ার মতো সময় ও শক্তি থাকে না। পুরোপুরি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই এ সবকিছু করা হয় এবং পড়াশোনার লক্ষ্য পরীক্ষা পাস, পরীক্ষায় ভালো করা ও তাকে পুঁজি করে পরবর্তী জীবনে চাকরি বা অন্য কাজের সুযোগ লাভের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। ছাত্রদের এ

www.pathagar.com

অভ্যাস স্কুল পর্যায়ে এমনভাবে তৈরী হয় যার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা পরবর্তী পর্যায়েও তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, উচ্চতর শিক্ষা অর্জনকালে অসম শিক্ষা শেষ করেও নিজের বিশেষ পাঠ্য বিষয়ের বাইরে কিছু পাঠ করার আগ্রহ তাদের থাকে না। নিঃসন্দেহে একটা জাতির জীবনে এটা এক বড় সংকট। কিন্তু এ সংকটের উপলব্ধি শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বিশেষ দেখা যায় না। কারণ তারা নিজেরা, বিপুল অধিকাংশ, নিজেদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারাগারে বন্দি থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অবনতি বিষয়ে লেখালেখি কম নয়। কিন্তু এর ফলে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আগের দিনে শিক্ষকরা যেমন ছাত্রদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং ছাত্ররা ছিলেন শিক্ষকদের স্নেহের পাত্র, এখন এটা কদাচিৎ দেখা যায়। শিক্ষকদের ছাত্ররা আর আগের মতো শ্রদ্ধা করে না। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের মনোভাবও আর আগের মতো নেই। শিক্ষার প্রায় পরিপূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণের কারণেই এরকম হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষকরা নিজেদের স্কুলে ছাত্রদের ঠিকমতো পাঠ না দিয়ে প্রাইভেট টিউশনিতেই আগ্রহী ও নিযুক্ত থাকেন বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কনসালটেন্সি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থেকে ছাত্রদের স্বার্থ উপেক্ষা করেন। তাদের মধ্যেও ছাত্ররা বিদ্যাচর্চার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করে না, উপরন্ত লক্ষ্য করে টাকার প্রতি তাদের দৃষ্টি।

টাকার খনির প্রতি দৃষ্টি শুধু শিক্ষকদের নয়, ছাত্রদেরও যথেষ্ট। এ কারণে শিক্ষকরা যেমন অতিরিক্ত আয়ের জন্য কনসালটেন্সি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দলাদলি ইত্যাদি করেন; তেমনি ছাত্ররা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই বড় অংকের টাকা রোজগারের দিকে হাত বাড়ায়। এভাবে টাকা রোজগারের কথা আগের দিনে ছাত্ররা চিন্তাই করতে পারত না। কিন্তু বাঙলাদেশ আমলে শাসক শ্রেণীর চরিত্র যেভাবে লুণ্ঠনজীবী হিসেবে গঠিত হয়েছে, তার প্রতিফলন সর্বত্রই ঘটছে। এ লুণ্ঠনজীবী শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠনগুলো এখন বেপরোয়াভাবে টাকা-পয়সা রোজগারের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে। এদের অবস্থা ক্রমশ এতই খারাপ হচ্ছে এই লুণ্ঠন কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় তারা অন্যদের ওপর, অন্য ছাত্র সংগঠনের ওপরই শুধু চড়াও হচ্ছে না, তারা নিজেদের সংগঠনের মধ্যেই কলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিয়মিতভাবে এখন খুনখারাবি পর্যন্ত করছে।

দেশে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা আজ কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, এ বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনার আছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা দরকার, বাণিজ্যিক স্বার্থ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সারাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে যে লুণ্ঠনজীবী (Predator) শাসক শ্রেণীর দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে, সেই শ্রেণীই তার চরিত্রের ছাপ অন্য সব ক্ষেত্রে যেভাবে রাখছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও রাখছে একইভাবে। এদিক দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র কোন ব্যতিক্রম নয়।

যুগান্তর : ২২.৮.২০১০ ২১.৮.২০১০

www.pathagar.com

শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা ও শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে একীভূত ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্টে (যুগান্তর ৫.৮.২০১০) দেখা যাচ্ছে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ বলে কিছু থাকবে না। একাদশ শ্রেণীতে উঠে ছাত্ররা বিভাগ ভিত্তিক লেখাপড়া করবে।

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বাঙলাদেশে এলোপাতাড়িভাবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো অষ্টম শ্রেণীর পরই শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, মানবিক বা বিজনেস স্টাডিজের মধ্যে একটি বিষয় নির্বাচনে বাধ্য করা। আগে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য যে অভিন্ন ব্যবস্থা ছিল সেটা উঠিয়ে দিয়ে অষ্টম শ্রেণীর পরই শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনে বাধ্য করার অর্থ ছিল কোন্ বিষয় তাদের জন্য উপযুক্ত হবে সেটা নির্ধারনের মতো পরিপক্বতা অর্জনের আগেই, সেটা বুঝে ওঠার মতো চিন্তাগত সামর্থ্য অর্জনের আগেই, তাদের জন্য বিষয় নির্বাচনের ব্যবস্থা। এর ফলে যা দাঁড়ায় তাতে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজের প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচিত না হয়ে অভিভাবকদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন প্রাধান্য পায়। বলাই বাহুল্য, এভাবে শিক্ষার্থীরা বিষয় নির্বাচনে বাধ্য হওয়ার ফলে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে সেটা বিনষ্ট হয়।

আগের দিনে স্কুল পর্যায়ে অর্থাৎ এখনকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সবার জন্য অভিন্ন পাঠ্যতালিকা ছিল। কতকগুলো বিষয় সবাইকেই পড়তে হতো। বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভুগোল ইত্যাদি। এসব বিষয়ে পাঠ নেয়ার পরই একজন ছাত্র কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক, কমার্স ইত্যাদি বিভাগে নিজেদের বিষয় নির্বাচন করত। দীর্ঘদিন এভাবে চলে আসার পর 'শিক্ষা সংস্কারক' কিছু উর্বর মস্তিষ্কের লোক কলেজ পর্যায়ের আগেই স্কুল পর্যায়ে অষ্টম শ্রেণীর পর নবম শ্রেণীতেই বিষয় নির্বাচন বাধ্যতামূলক করেন। তাদের এই তথাকথিত সংস্কারের ফলে শিক্ষার্থীদের উপকার না হয়ে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শিক্ষার মানও নিম্নগামী হয়েছে তার স্বীকৃতিই পাওয়া যাচ্ছে নোতুন শিক্ষা সংস্কার উদ্যোগের মধ্যে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমি অনেক লিখেছি। অষ্টম শ্রেণীর পরই ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনে বাধ্য করার ক্ষতিকর দিক এবং এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জরুরী প্রয়োজনের কথাও ছিল এসব আলোচনার একটি বিষয়। এই

www.pathagar.com

লেখালেখির দ্বারা কিছুই হয়নি, যেমন অন্য ক্ষেত্রেও কিছু হয় না। পরিবর্তিত ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক খুব স্পষ্টভাবে দেখা দেয়ায় এবং শিক্ষার করুণ অবস্থার দিকে তাকিয়ে কিছুদিন থেকে এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে এবং এখন পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আগের ব্যবস্থাতেই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তারা নিতে যাচ্ছেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও নোতুন পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যতালিকা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তের কথা উপরোক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, তার মধ্যে অসুবিধা আছে। বাঙলাদেশ হওয়ার পর থেকে পাঠ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যে একটি মহাক্ষতিকর ব্যাপার ঘটানো হয়েছিল তার কোন সংশোধন প্রস্তাবিত নোতুন ব্যবস্থার মধ্যে নেই। এতে যেসব বিষয় পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে সেগুলো হলো– বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, কৃষি/গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং আইসিটি। এই পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ইতিহাসের কোন স্থান নেই। বাঙলাদেশে প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ইতিহাস নিয়ে, ইতিহাস বিকৃতকরণ ইত্যাদি নিয়ে বাঙলাদেশে অনেক উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তা এবং আদিখ্যেতা সত্ত্বেও ইতিহাস পাঠের কোন ব্যবস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নেই। একটা দেশের জনগণের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে! অষ্টম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনে বাধ্য করার বিরুদ্ধে যেমন আমি লিখেছিলাম, তেমনি আমি অসংখ্য প্রবন্ধে লিখেছি ইতিহাসকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে বাতিল করার বিরুদ্ধে। বাঙলাদেশে এখন সমাজবিজ্ঞানের বইয়ে ইতিহাসের নামে যে সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে এক বড় প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রহসন বজায় রাখার সিদ্ধান্তই নোতুন ব্যবস্থায় রাখা হচ্ছে। দেশের প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের রাখার ব্যবস্থা থাকলেও পাঠ্যবই রাখবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নৈতিকতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর পাঠ্যপুস্তক যে হবে ফরমায়েশি ব্যাপার এতে কোন সন্দেহ নেই। এই পুস্তকে মিথ্যার প্রচার এমন থাকবে যাতে এখানকার মতোই সত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় প্রায় অসম্ভব হবে। শিক্ষার এই রাজনীতিকীকরণ থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় ক্ষতিকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

আলোচ্য রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোচিং সেন্টার, নোট গাইড বন্ধ করার বিপরীতে শিক্ষকদের পাঠদানে বাধ্য করা হবে। এটা খুবই ঠিক যে কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের সব থেকে নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখনকার শিক্ষকরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমতো পাঠদান করেন না। ইচ্ছাকৃতভাবেই তারা এ কাজ করেন যাতে তারা তাদের কাছে অর্থের বিনিময়ে পাঠ নিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে এখানে চলে আসার কারণে এখন কোচিং ছাড়া শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়ার কথা চিন্তা করতেই পারে না। কাজেই তারা কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা করে শুধু যে প্রকৃত পরিমাণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সামর্থের বাইরে অর্থ ব্যয় করে তাই নয়, এর ফলে তাদের সময়ের একটা বড় অংশ কোচিং

www.pathagar.com

সেন্টারে যাতায়াত করতেই চলে যায়। যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং সেন্টারে নিয়ে যেতে হয় অভিভাবকদেরই, এ কারণে এর ফলে তাদেরও সময় নষ্ট থেকে নিয়ে শারীরিক দুর্দশার অন্ত থাকে না। এসবই কোচিং ব্যবস্থার অসহনীয় এবং মারাত্মক ক্ষতির এক একটি দিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে খোদ শিক্ষকদের এমন কায়েমি স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা উচ্ছেদ করা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে যে কায়েমি স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে শাসক শ্রেণী ও সরকারের লোকদের রাজনৈতিক স্বার্থও এমনভাবে জড়িয়ে আছে, ভোটের ব্যাপারে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, যাতে এই ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, শিক্ষকরা নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্তব্য অবহেলা করে, কাজ ফাঁকি দিয়ে যেভাবে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য কোচিং সেন্টার খুলে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন তার থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্ধার করা হলো এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের কোন ক্ষমতা সরকারের নেই। সারা দেশজুড়ে সবকিছুর বাণিজ্যিকীকরণ, এমনকি রাজনীতিরও বাণিজ্যিকীকরণ যেভাবে এখন হয়েছে তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বাণিজ্যিকীকরণ উচ্ছেদ যতই প্রয়োজনীয় হোক তার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ, নেই বললেই চলে।

আমার দেশ : ০২.৯.২০১০ ১.৯.২০১০

www.pathagar.com

ইভটিজিং ও অপরাধের জগৎ

অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিশেষত স্কুল ও কলেজে পড়া মেয়েদের রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করার ঘটনা এখন অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইভটিজিং নামে কথিত এই সামাজিক ব্যাধিজনিত কারণে খুন-খারাবির মতো ক্রাইম পর্যন্ত প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটে চললেও এর বিরুদ্ধে কোন প্রকৃত প্রতিরোধ নেই। এ ধরনের একেকটি ঘটনার পর দেখা যায়, সংবাদপত্রে এর ওপর রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে এবং স্থানীয় লোকজন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে হত্যাকারীর গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করে মিছিল করছে। কিন্তু এর দ্বারা কোন কাজ হচ্ছে না। উপরন্তু ইভটিজিং সারাদেশে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ঘাতক সামাজিক ব্যধির কবলে পড়ে আক্রান্তরা প্রায়ই খুন হচ্ছে অথবা উপায়ান্তর না দেখে আত্মহত্যা করছে।

ইভটিজিংয়ের মতো অপরাধ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এটা বলাই বাহুল্য, কোন সভ্য, সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল সমাজে এ ধরনের অপরাধ সম্ভব নয়। যে কোন শারীরিক ব্যাধির যেমন বাস্তব ভিত্তি থাকে মানুষের খাদ্য, পানীয়, অভ্যাস, পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে, তেমনি সামাজিক ব্যাধির সম্পর্ক থাকে সমগ্র সমাজের পরিবেশের সঙ্গে, সমাজে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে ও কার্যকর থাকে তার সঙ্গে। বাঙলাদেশে এখন ইভটিজিং ও এর মতো অনেক ব্যাধি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যা আগে কোনদিন দেখা যায়নি। এ অবস্থা কল্পনা করাও আগেকার দিনে সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলে ইভটিজিংয়ের ঘটনা কদাচিৎ ঘটত, সে কারণে তাকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো না। সেটা ব্যতিক্রমী ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ প্রবণতা থেকেই ঘটত। সে রকম ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে সমাজ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে কোন না কোনভাবে অপরাধীর এমন শাস্তি হতো যাতে সে অপরাধের পুনরাবৃত্তির কোন সহজ সম্ভাবনা থাকত না। এদিক দিয়ে বাঙলাদেশের সঙ্গে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলে অবস্থার অনেক তফাৎ।

বর্তমানে ইভটিজিং ঘটিত ক্রাইম ঘটার পর যে প্রতিবাদ ও মিটিং-মিছিল দেখা যায়, তাতে সমাজে একটা হৈচৈ সৃষ্টি হলেও তার দ্বারা যে কোন কাজ হয় না এটা দেখাই যাচ্ছে। এর কারণ অবশ্যই অনুসন্ধান করা দরকার।

মাত্র কয়েকদিন আগে ২৩ অক্টোবর নাটোরে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় সেখানে মিজানুর রশিদ নামে একজন শিক্ষক ইভটিজারদের দ্বারা নিহত হন। এরপরই ২৬ অক্টোবর ফরিদপুরের মধুখালীতে একই কারণে এক স্কুলছাত্রীর মা চাঁপা রানী ভৌমিককে

www.pathagar.com

মোটরসাইকেল চাপা দিয়ে খুন করা হয়। ঐদিনই ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ার হরিপুর আলী আকবর উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মাওলানা অলি আহমদকে বিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে দুষ্কৃতকারীরা নির্মমভাবে মারধর করে। লক্ষ্য করার বিষয়, এসব ক্রাইমের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড বা মারধরের ঘটনার আগেই ইভটিজিংয়ের ব্যাপার এলাকার অথবা নির্দিষ্ট স্থানের লোকদের জানা থাকে। তাদের চোখের সামনেই এসব হয়। ঘটনা ঘটার পর তারা বড় আকারে রাস্তায় নেমে অনেক প্রতিবাদ করলেও ঘটনা ঘটার আগে তারা এ ক্রাইম প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বাস্তবত কার্যকরভাবে কিছুই করেন না। মধুখালীতে চাঁপা রানীর মেয়েদের দিনের পর দিন স্কুল যাওয়া-আসার সময় দেবাশীষ সাহা রনি নামে এক বখাটে ছোকরা দলবল নিয়ে উত্যক্ত করার ঘটনা এলাকার লোকের জানা ছিল। চাঁপা রানী নিজে এ বিষয়ে মধুখালী উপজেলা চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, যে চিনিকলে চাঁপা রানী বাণিজ্যিক বিভাগে কাজ করতেন ওই চিনিকল উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের জানালে তারা রনি ও তার বাবাকে সতর্ক করেন। কিন্তু এ হালকা কাজ ছাড়া তারা আর কিছুই করেননি। এ সতর্কীকরণের অথর্বতার কারণে ইভটিজাররা তাদের কথায় কর্ণপাত না করে একইভাবে মেয়েদের উত্যক্ত করে চলে। শুধু তাই নয়, তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত লোকদের কাছে অভিযোগ করায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে চাঁপা রানীকে মোটরসাইকেল চাপা দিয়ে খুন করে। এর থেকে দেখা যায়, ইভটিজিংয়ের ফলে খুনখারাবি হলে তার বিরুদ্ধে সমাবেশ, মিছিল ও মানববন্ধনের যেমন কোন বাস্তব কার্যকারিতা নেই, তেমনি কার্যকারিতা নেই ইভটিজিংয়ের শিকার অল্পবয়স্ক মেয়েদের ও তাদের অভিভাবকদের অভিযোগের। সব রকম রিপোর্ট থেকেই দেখা যাচ্ছে, চাঁপা রানী ভৌমিকের মেয়েদের উত্যক্ত করার বিষয়টি এলাকার লোকদের জানা থাকা এবং এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা সত্ত্বেও সতর্কীকরণ ছাড়া তারা আর কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় শেষ পর্যন্ত উত্যক্ত হতে থাকা মেয়েদের মাকেই জীবন দিতে হলো। তার অভিযোগের পর উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটি যদি পুলিশের খবর দিয়ে অপরাধীকে আটক করার ব্যবস্থা করতেন এবং স্থানীয় লোকজন যদি চাঁপা রানী নিহত হওয়ার পর নয়, তার আগেই এ ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সমাবেশ-মিছিল করতেন, তাহলে এ ঘটনা ঘটা সম্ভব হতো না। প্রয়োজনের মুহূর্তে সঠিক কাজটি না করার ফলে অপরাধ রোধ করা সম্ভব হয়নি এবং এই একই কারণে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর রাস্তায় লাফালাফিরও কোন সুফল কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ইভটিজিং সব সময়ই রাস্তার ওপর হচ্ছে এবং অন্য লোকদের চোখের সামনে। এ সময় তারা ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে কখনও কখনও এ ক্রিমিনাল বা ক্রিমিনালের পাকড়াও করে মার দিলেও সাধারণভাবে এ ধরনের কোন প্রতিরোধ দেখা যায় না। এরপরও চোখের ওপর ঘটনা ঘটতে দেখেও লোকজন উদাসীন থাকার কারণে এ ধরনের

www.pathagar.com

অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে। এ ধরনের ঘটনা দেশজুড়ে বেশী সংখ্যায় ঘটছে।

এতো গেল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের কথা। দায়িত্বশীল লোকরাও এক্ষেত্রে ইভটিজিংয়ের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকছে। কোন সময় তারা এসব অভিযোগে কর্ণপাতই করছে না, আবার কোন সময় অভিযোগের মুখে তারা দায়সারা গোছের কাজ করছে, অর্থাৎ বাস্তবত কিছুই করছে না। চাঁপা রানীর অভিযোগ সত্ত্বেও উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং সেই সঙ্গে যে স্কুলে মেয়েরা পড়াশোনা করে সেই স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ বিপজ্জনক ব্যাপারকে হালকাভাবে নিয়ে অথবা কোন ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে যেভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই নিজেদের দায় সেরেছে ও ক্ষান্ত হয়েছে, সেটা এই অপরাধীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার ছাড়া আর কী?

সারাদেশে ইভটিজিং নামে কথিত অপরাধ বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতদিন ধরে সরকারের কোন কার্যকর পদক্ষেপ এক্ষেত্রে নেই। এই সরকার ও সরকারদলীয় নেতানেত্রীদের মতো লম্বা-চওড়া নীতিবাক্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে উচ্চারণ করার মতো 'যোগ্যতা' ও নির্লজ্জতা আর দেখা যায় না। কাজেই একেকটি ঘটনা ঘটার পর শোনা যায় তাদের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা। তারা বলে, এর বিরুদ্ধে সরকার শিগগিরই পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু কার্যত কিছুই হয় না। কারণ চুরি-ডাকাতি, ঘুষ ও কমিশনখোরি, ভাঁওতাবাজিই এদের প্রধান কাজ। এসব কাজ করণেওয়ালারা দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে কাজ করা তো দুরের কতা চিন্তা পর্যন্ত করবে– এমন অবস্থা ওদের নেই।

এক্ষেত্রে এ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর বদান্যতার উল্লেখ করা যায়। যেখানেই কোন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটুক, সেখানে এসব ঘটনা রোধ করার জন্য কার্যকর কিছু না করলেও সরকারী তহবিল থেকে টাকা দিয়ে তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে যথাউৎসাহী। চাঁপা রানীর মৃত্যুর পরও তিনি তার পরিবারকে এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে নিজের মহানুভবতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ঢাকার নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর তিনটি ক্ষতিগ্রস্ত মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি খাতে বড় আকারের খরচ করে তিনি অনেক আদিখ্যেতা দেখিয়ে মনে করেছিলেন নিজেদের দায়-দায়িত্বের কথা ধামাচাপা দিয়ে বাজিমাৎ করবেন। কিন্তু তা হয়নি। তার এ মহানুভূবতার জন্য জনগণের মধ্যে তার কোন জয়জয়কার হয়নি। চাঁপা রানী ভৌমিকের পরিবারকে এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়াতেও সেটা হবে না। যা দরকার তা হলো ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ নয়, যদিও এ ক্ষতিপূরণেরও প্রয়োজন আছে; আসল দরকার এসব অপরাধ যাতে ঘটতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সাধারণভাবে দেশে অপরাধ রোধ করা বা কমিয়ে আনা আজকের বাঙলাদেশে সম্ভব হচ্ছে না এ কারণে যে, অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা নেই। নেই বিশেষ করে এ কারণে যে, ক্ষমতাসীন লোকরা সরকার ও সরকারী দলের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেরা ব্যাপক আকারে অপরাধ করতে থাকায় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন

www.pathagar.com

শাস্তিমূলক পদক্ষেপ না নেয়ায় সাধারণভাবে অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে। অপরাধ রোধ করা যাদের দায়িত্ব তারা নিজেরাই যদি অপরাধী হয়, তাহলে যা হওয়ার তাই এখন বাঙলাদেশে হচ্ছে। কাজেই যে কোন ধরনের অপরাধ এখন কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। বাঙলাদেশে এখন যে অপরাধের জগৎ তৈরী হয়েছে সেই জগতে ইভটিজিংয়ের মতো অপরাধ দেশজুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে।

সমাজে যেভাবে লুণ্ঠণজীবী লুম্পেন বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন ও আধিপত্য কায়েম হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধই আজ জনগণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কর্তব্য। এ কর্তব্য কাজে জনগণ এগিয়ে না আসা ও শক্তিশালী প্রতিরোধ না গড়ে তোলা পর্যন্ত কোন অপরাধেরই যথোচিত শাস্তি হওয়া এবং অপরাধের জগৎ ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

যুগান্তর : ০২.১১.২০১০ ৩০.১০.২০১০

---

www.pathagar.com